হাজীদের সম্বল

তরজমাঃ অনুবাদ বিভাগ

আল-সুলাই ইসলামী দাওআ সেন্টার পোঃ বক্স নং ১৪১৯ রিয়াদ ১১৪৩১
ফোনঃ ২৪১০৬১৫,২৪১৪৪৮৮ ফ্যাক্সঃ Ext. ২৩২ সাউদী আরব

حساب التبرعات بمصرف الراجحي: SA2280000296608010070509
حساب التبرعات بمصرف الإنماء: SA9605000068200517913002

ⓒ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالسلي، ١٤٢٤هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالسلي
زاد الحاج / المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالسلي –
الرياض، ١٤٢٤هـ
٣٢٨ص ؛ ١٢ × ١٧ سم
ردمك: ٠– ١–٩٤٧٦–٩٩٦٠
(النص باللغة البنغالية)
١– الحج – مناسك ٢– الصلاة أ– العنوان
ديوي ٢٥٢,٥ ١٤٢٤/٧٣٥٤

رقم الإيداع: ١٤٢٤/٧٣٥٤
ردمك: ٠– ١–٩٤٧٦–٩٩٦٠

زاد الحاج

يحتوي على (العقيدة، الصلاة ، الصوم والحج...)

جمع وترتيب

الداعية: أبو الكلام أزاد

হাজীদের সম্বল

(আক্বীদা, নামায, রোযা ও হাজ্জ ...)

অনুবাদ ও সংকলনে:

আবুল কালাম আযাদ
(লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়)

আল-সুলাই ইসলামী দা'ওয়া সেন্টার
পোঃ বক্স নং ১৪১৯, রিয়াদ ১১৪৩১
সাউদী আরব

ক্রমিক	বিষয় সমূহ	الموضوعات	পৃ:
১	ভূমিকা	المقدمة	ক
২	হজ্জের বইয়ের সূচীপত্র	فهرس كتاب الحج	A
৩	হজ্জের বই	كتاب الحج	1-145
৪	নামাযে গুরুত্ব	اهمية الصلاة	146
৫	নামাযের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ	الاستعداد للصلاة	154
৬	উযূর পদ্ধতি	كيفية الوضوء	157
৭	গোসল করার পদ্ধতি	كيفية الغسل	159
৮	তায়াম্মুম করার পদ্ধতি	كيفية التيمم	160
৯	নামাযে অপছন্দনীয় কার্যাবলী	أشياء مكروهة في الصلاة	160
১০	নামায ভঙ্গকারী বস্তুসমূহ	أشياء مبطلة للصلاة	161
১১	নামাযে সাহু সিজদার কতিপয় বিধান	من أحكام سجود السهو في الصلاة	162
১২	নাবী কারীম ﷺ এর নামায পড়ার পদ্ধতি	كيفية صلاة النبي ﷺ	167
১৩	নামায সম্পর্কিত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলাহ	المسائل المهمة التي تتعلق بالصلاة	189
১৪	নামায পরিত্যাগকারীর বিধান	حكم تارك الصلاة	208

১৫	নির্ধারিত সময় হতে দেরী করে নামায পড়ার বিধান	حكم تاخير الصلاة عن وقتها	223
১৬	রোযার বিধানসমূহ	أحكام الصيام	227
১৭	রামাযা ন মাসের বৈশিষ্ট সমূহ	خصائص شهر رمضان	230
১৮	রোযার ফযীলত সমূহ	فضائل الصوم	233
১৯	আমরা রমযান মাসকে কিভাবে অভ্যর্থনা জানাব	كيف نستقبل شهر رمضان	235
২০	রোযা নষ্টকারী বস্তুসমূহ	مفسدات الصوم	237
২১	যে সমস্ত কাজের দ্বারা রোযা নষ্ট হয়না	الأفعال التي لا تفسد الصوم	238
২২	রোযার সাথে সম্পৃক্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলাহ	المسائل المهمة التي تتعلق بالصيام	240
২৩	পীর-মুর্শিদ ও অলী-আউলি-য়াদের অসীলা ধরার বিধান	التوسل بالأولياء والصالحين	245
২৪	শরীয়ত সম্মত সঠিক অসীলার বিবরণ	حكم التوسل الشرعي	247
২৫	ধারণাকৃত কারামত সমূহ	الكرامات المزعومة	257

২৬	অতীত ও বতর্মান যুগের মুশরিকদের মাঝে পার্থক্য	المشركون قديماً وحديثاً	263
২৭	ভালবাসার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শিরক	شرك المحبة	265
২৮	আল্লাহ্ তার বান্দাদের অতি নিকটেই বিদ্যমান	الله قريب من عباده	267
২৯	পীর-মুর্শিদ অলী-আউলি-য়াদের সম্পর্কে কতিপয় ভূল ধারণা	بعض عقيدة الباطلة	271
৩০	মীলাদুন্ নাবী ﷺ পালনের বিধান	حكم الاحتفال بالمولد النبوي	273
৩১	আক্বীদা সংক্রান্ত কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলাহ	المسائل المهمة التي تتعلق بالعقيدة	281
৩২	মৃত ব্যক্তি এবং কবর সংক্রান্ত কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলাহ	المسائل المهمة التي تتعلق بالميت والقبور	306

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و الصلاة والسلام علي أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلي آله و صحبه أجمعين

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য অতঃপর দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হোক আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের প্রতি যিনি সমস্ত নাবী ও রাছূলগণের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। এমনিভাবে দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সমস্ত ছাহাবীদের উপর।

নি:সন্দেহে ইসলামী শরীয়ত তথা ইসলামের বিধি-বিধান সব কিছুই আল্লাহ প্রদত্ত্ব ওহী মাতলূ ও ওহী গায়ের মাতলূ অর্থাৎ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীসের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। বাস্তবতার আলোকে বিশেষ করে পাক-ভারত উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের ধর্মীয় অবস্থার দিকে নযর করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন মাযহাবের অন্ধ অনুকরণ, নামধারী পীর-ফকীর, অলী-আউলীয়া ও গাওস-কুতুবদের নি:পূজীর ব্যবসা, ধর্মের নামে এক শ্রেণীর বিদ'আতী আলেমদের অসাধু লেখনী, বক্তব্য ও ফাতওয়া। সর্বপরি দেশে ধর্মহীন জেনারেল শিক্ষা ব্যবস্থা। অপর দিকে শিয়া, খারেজী, রাফেযী, ও কাদিয়ানীদের ভ্রান্ত আকীদা ও কুসংস্কারের অনুপ্রবেশ। এছাড়া হিন্দু, খৃষ্টান ও ইয়াহুদীদের মুসলিম বিরোধী সার্বিক চক্রান্ত। এসমস্ত কারণে বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলমানদের পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনে

চতুর্দিক থেকে ভেজাল ঢুকে ভরপুর হয়ে গেছে। যার ফলে বহু নেতা-নেত্রীরা ও আলেম-ওলামারা সহ অধিকাংশ মুসলিম ভাইয়েরা পবিত্র কুর'আন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছে। যার ফলে বাংলার অধিকাংশ মানুষ শিরক ও বিদ'আতের ভিতর হাবুডুবু খাচ্ছে। আর এ কারণেই দিন-দিন মতনৈক্য, মারামারি, কাটাকাটি, অশান্তি, অরাজকতা বেড়েই চলেছে। ফলে আল্লাহর তরফ থেকে আযাব ও গযব বেড়েই চলেছে। এমতাবস্থায় দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ প্রদত্ব সকল প্রকার কল্যাণ ও মঙ্গল লাভ কারার জন্য এবং আল্লাহর সকল প্রকার আছমান ও যমীনের আযাব ও গযব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অপর দিকে পরকালিন জীবনে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাত লাভ করার উদগ্র, আশা-আকাঙ্খা ও বাসনা নিয়ে সকল শিরকী ও বিদ'আতী কার্যক্রম ছেড়ে দিয়ে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ হাদীছের ধারক, বাহক ও প্রচারক হওয়ার লক্ষ্যে নিরপেক্ষ ভাবে পবিত্র কুর'আন ও ছহীহ হাদীছ গবেষণা করার জন্য পাঠক ভাইদের নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

"আল সুলাই ইসলামী দাওয়া সেন্টার" এর প্রকাশনা বিভাগের মহা পরিচালক আরবী ১৪২৪ হিজরীর শাওয়াল মাসের ১৫ তারিখের দিকে অফিসের সকল ভাষার দ্বায়ীদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, এবার শুধু হজ্জের বই ছাপানো হবে না বরং "زاد الحاج" "হাজীদের সম্বল" নামে বই ছাপানো হবে। যা হাজ্জ, নামায, রোযা, আক্বীদা ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্বলিত একত্রে একটি বই হবে। যার ফলে শুধু হজ্জের সময় নয় বরং সারা বছরই জনগণ এর দ্বারা উপকৃত হতে পারবে। তখন খুবই তড়ি

ঘড়ি করে মাত্র ২০/২২ দিনের ভিতরে পূর্বে আমার অনুবাদ করা, লেখা ও সংকলন করা কয়েকটা লিফলেট যা বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে ছিল সেগুলি পুনরায় ঠিকঠাক করে এবং আক্বীদা সংক্রান্ত বিষয় ৩৯ টি প্রশ্নের উত্তর লিখে শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রাহেমাহুল্লাহ) প্রণীত, ও শায়খ আল্লামা আলীমুদ্দীন নদীয়াভী অনুদিত হজ্জের প্রসিদ্ধ বইটির সাথে ছাপানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এখানে হজ্জের মাস'আলা মাসয়েল সংক্রান্ত বইটি শুধু বিস্তারিত লেখা, এ ছাড়া বাকী বিষয়গুলি খুবই সংক্ষিপ্তাকারে লেখা।

অতএব, একজন হাজী সাহেব বা একজন মু'মিন মুসলমানের জন্য এ বইটাই সম্বল বা পাথেয় হিসাবে যথেষ্ট নয়। এখানে খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে বেশ কয়েকটি বিষয় পবিত্র কুর'আন এবং ছহীহ হাদীছের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে, এ সমস্ত বিষয়গুলির মধ্য হতে যেমন নামায, রোযা, মীলাদ-মাহফীল, আক্বীদা এগুলি এবং এ ধরণের অন্যান্য বিষয়গুলি পবিত্র কুর'আন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বিস্তারিত জানার জন্য প্রথমত: হাদীছের কিতাবগুলি যেমন বুলুগুল মারাম, বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিজী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ এরপর আহলে হাদীছ বা সালাফী ওলামাদের লিখিত বই-পুস্তকগুলি পড়ার আবেদন জানাচ্ছি। যেমন সাউদী আরবের শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রাহেমাহুল্লাহ), শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছাইমীন (রাহেমাহুল্লাহ) শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রাহেমাহুল্লাহ) বাংলাদেশের আল্লামাহ আব্দুল্লাহীল কাফী আল-কুরাইশী (রাহেমাহুল্লাহ) ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালীব (হাফিযাহুল্লাহ) প্রমূখ।

এ বইতে সৌন্দর্যের যে দিকগুলি রয়েছে তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার রহমত ব্যতীত আর কিছু নয়। আর ভুল ত্রুটি যা আছে তা আমার দুর্বলতার ফল। এ বই সম্পর্কে পাঠক ভাইদের সুপরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে ইনশা'আল্লাহ।

পরিশেষে প্রথমে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদাই করি, যার অশেষ মেহেরবানীতে এত অল্প সময়ে বইটি প্রকাশিত হল। অতঃপর অফিস কর্তৃপক্ষের শুকরিয়া আদায় করি, যারা বাংলাভাষী ভাইদের খদমতের জন্য এ বইটা ছাপানোর ব্যবস্থা করেছেন। এরপর মাওলানা মুকাম্মাল হক, আজমল হোসাইন ও মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াসে যারা অনুবাদের ভুল-ত্রুটি শুধরিয়ে দিয়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন, তাদের শুকরিয়া আদায় করি।

পরিশেষে আমার পিতা-মাতা, সমস্ত শিক্ষাগুরু ও শ্রদ্ধাভাজন সহ সকল মু'মিন মুসলমান নর-নারীদের জন্য আল্লাহর শাহী দরবারে এ দোয়াই করব যে, হে আল্লাহ! তুমি সকলকে ক্ষমা কর এবং পরকালিন জীবনে আমাদের সবাইকে জান্নাতুল ফেরদাউস নছীব কর। আমীন

يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ، اللهم وفقنا لما تحب وترضى .

বিনীত নিবেদক

আবুল কালাম আযাদ

অনুবাদ বিভাগ

আল-সুলাই ইসলামী দাওয়া সেন্টার

রিয়ায, সাউদী আরব।

কোরআন ও হাদীসের আলোকে

হজ্জ, উমরাহ ও যিয়ারত

সংক্রান্ত অনেক বিষয়াদির

প্রতিপাদন ও ব্যাখ্যা

প্রণীত

শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রাহেমাহুল্লাহ)

অনুবাদ

আবু মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন নদীয়াভী

প্রকাশনা ও প্রচার বিভাগ

আল-সুলাই ইসলামী দা'ওয়া সেন্টার

রিয়াদ, সৌদি আরব

ফোনঃ 2414488-2410615, ফ্যাক্সঃ 2411733

সূচীপত্র

মুকাদ্দমা...পৃষ্ঠা সংখ্যা

(ক) আরবী

(খ) বঙ্গানুবাদ

খুৎবাতুল কিতাব

(ক) আরবী ১

(খ) বঙ্গানুবাদ ২

পরিচ্ছেদ

হজ্জ্ব ফরয হওয়ার দলীল এবং উহার গুরুত্ব.............................৪

হজ্জের সহিত উমরা ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে জ্ঞাতব্য ৭

হজ্জ্ব এবং উমরা জীবনে একবার মাত্র ফরয................................৮

হজ্জ্ব যাত্রার পূর্বে ওসীয়ত এবং তাওবাহ্ করা ৮

তাওবাহ্‌র তাৎপর্য..৯

হজ্জ্ব ও উমরার জন্য হালাল মাল ১০

কোন ব্যক্তির নিকট হাজীদের সওয়াল-যাঞ্চা করা অবৈধ ১১

হজ্জ্ব ও উমরার উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ১২

হজ্জ্ব ও উমরা সফরের নিয়মাবলী..১৪

পরিচ্ছেদ

ইহরাম বাঁধার সময়ে যাহা করণীয়......................................১৭

ইহরাম অবস্থায় করণীয় কাজ সমূহ.....................................১৮

ইহরাম অবস্থায় পরিধেয় বস্ত্র ২১

ইহরাম কালীন নিয়ত...২১

ইহরাম ব্যতীত অন্য ইবাদতে সশব্দে নিয়ত উচ্চারণ বিদ্‌আত........২২

পরিচ্ছেদ

মীকাতের বর্ণনা ২৫
ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করা হারাম ২৬
মীকাতের চতুঃসীমায় অবস্থানকারীদের জ্ঞাতব্য ২৮
হজ্জের পর বেশী সংখ্যক উমরা করা শরীয়ত সম্মত নহে ৩০
হজ্জের সময় ছাড়া অন্য সময়ে মীকাত অতিক্রমকারীদের করণীয় ৩২
পথে অসুস্থ হইলে অথবা দুশমন কর্তৃক বাঁধা প্রাপ্তির আশংকা
দেখা দিলে ইহরাম বাঁধিবার নিয়ম...৩৬

পরিচ্ছেদ

অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে- মেয়েদের হজ্জ ৩৭

পরিচ্ছেদ

ইহরাম অবস্থায় যাহা নিষিদ্ধ এবং যাহা সিদ্ধ ৪১
হারাম এলাকার মর্যাদা রক্ষা ৪৮

পরিচ্ছেদ

মক্কায় পৌছিয়া হাজীগণ কি করিবে? ৫০
ইয্‌তিবার নিয়ম ৫২
তওয়াফের ব্যাপারে যদি সন্দেহের উদ্রেক হয় ৫৩
মেয়েদের যথারীতি পর্দা করা এবং নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ হইতে
বিরত থাকা ৫৩
তরয়াফ ও সাঈ-এর সময়ে নির্দিষ্ট কোন দোআ বা যিকরের কোন
কালেমা নাই ৫৫

পরিচ্ছেদ

মীনা ও আরাফায় করণীয়...৬৩
আরাফায় যাহা যাহা করণীয়...৮২
মুয্‌দালিফায় রাত্রি প্রবাস ৮৪

দূর্বল নারী ও শিশুদের অর্ধরাত্রির পর মিনায় প্রেরণ ৮৫
ভোর হইতে মিনায় গমন, কংকর নিক্ষেপ করণ প্রভৃতি ৮৫
কুরবানীর দিবস সমূহ ৮৭
তামাত্তো হজ্জের জন্য এক সাঈ যথেষ্ট নয়................................ ৮৮

পরিচ্ছেদ

কুরবানীর দিবসে করণীয় কাজ সমূহের শ্রেণীবিন্যাস ৯৩
যমযমের পানি পান করা ৯৪

পরিচ্ছেদ

কুরবানী প্রসঙ্গে ১০০
কুরবানীর জানোয়ার হালাল রোযগারের হইতে হইবে................১০০
যে হাজী কুরবানী করিতে অক্ষম তাহাকে কি করিতে হইবে..........১০০

পরিচ্ছেদ

আম্‌র বিল মা'রূফ ওয়ান্‌নাহী আনিল মুন্‌কার
এবং বা'জামাত নামাযের পাবন্দী ১০৩
হাজীদের জন্য পাপ হইতে দূরে অবস্থান একান্ত প্রয়োজন...........১০৬

পরিচ্ছেদ

মক্কা হইতে বিদায়ের পূর্বে যাহা করণীয় ১১৫

পরিচ্ছেদ

মসজিদে নববী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যিয়ারত প্রসঙ্গে....১১৭
দ্বীন ইসলামের দুইটি মূলভিত্তি ১২৫
নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর মুবারক যিয়ারতঃ বিশেষ
সতর্ক বাণী...১৩৭

পরিচ্ছেদ

মসজিদে কুবা, জান্নাতুল বাকী প্রভৃতির যিয়ারত ১৪২

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

اما بعد فهذا منسك مختصر يشتمل على إيضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جمعته لنفسي ولمن شاء الله من المسلمين. واجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل وقد طبع للمرة الأولى في عام ١٣٦٣ هـ على نفقة جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل قدس الله روحه وأكرم مثواه.

ثم إني بسطت مسائله بعض البسط وزدت فيه من التحقيقات ما تدعو له الحاجة ورأيت إعادة طبعه لينتفع به من شاء الله من العباد، وسميته "التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة" ثم أدخلت فيه زيادات أخري هامة وتنبيهات مفيدة تكميلا للفائدة، وقد طبع غير مرة وأسأل الله أن يعمم النفع به وأن يجعل السعي فيه خالصاً لوجهه الكريم، وسبباً للفوز لديه في جنات النعيم. فإنه حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

المؤلف

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصَّلاةُ والسَّلامُ على من لا نبي بعده.

সমস্ত প্রশংসা একক আল্লাহ্‌র জন্য এবং দরূদ ও সালাম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যাঁর পর আর কোন নবী নাই।

আম্মাবা'দঃ ইহা আল্লাহ্‌র কিতাব এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের আলোকে হজ্জ উমরাহ্ এবং যিয়ারত সম্পর্কীয় অধিকাংশ মাসআলা সম্বলিত একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন। আমি নিজের জন্য এবং ঐ সমস্ত মুসলমানদের জন্য ইহা সংকলন করিয়াছি যাহাদিগকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন। আমি এই মাসআলাগুলিকে দলীল প্রমাণ দ্বারা সমৃদ্ধ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।

এই পুস্তিকাটি সর্ব প্রথম ১৩৬৩ হিজরী সালে মহামান্য বাদশাহ আবদুল আযীয ইবনে আবদুর রহমান আল ফয়সল (কাদ্দাসাল্লাহু রূহাহু ওয়া আকরামা মাসওয়াহু)-এর অর্থানুকূলে প্রকাশিত হয়। অতঃপর আমি উহার আলোচ্য বিষয়গুলিকে কিছুটা বিস্তৃত করিয়াছি। আর যে সব বিশ্লেষণ প্রয়োজন বোধ করিয়াছি তাহাও সংযোজিত করিয়াছি। অতঃপর আল্লাহ্‌র বান্দাদের কল্যাণার্থে উহা পুনঃপ্রকাশের মনস্থ করি এবং উহার নামকরণ করিঃ

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة.

আত-তাহ্‌কীকু ওয়াল ইযাহ লি কাসীরিম মিন মাসায়িলিল হজ্জে ওয়াল উমরাহ্ ওয়ায্‌যিয়ারাহ্ আলা যাউয়িল কিতাবে ওয়াস্‌সুন্নাহ্।

ইহার পর আমি আরও কিছু প্রয়োজনীয় এবং কল্যাণকর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উহার অন্তর্ভূক্ত করিয়াছি যেন এই পুস্তিকা দ্বারা সকলে পুরাপরি উপকৃত হইতে পারে।

আল্লাহ্‌র নিকট আমার দো'আ এই যে, ইহার কল্যাণ এবং উপকার ব্যাপক করিয়া দিন এবং এজন্য আমার প্রচেষ্টা ও উদ্যোগকে একমাত্র তাঁহার জন্যই নির্ভেজাল ও বিশুদ্ধ করিয়া দিন! তাঁহার সান্নিধ্যে জান্নাতে নাঈমে প্রবেশের তাওফীক আমাকে প্রদান করুন এই ক্ষুদ্র খেদমতের মাধ্যমে। আমীন!

নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই হইতেছেন আমার জন্য যথেষ্ট, তিনিই শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাপক, নাই কোন উপায় নাই কোন শক্তি মহান ও মহীয়ান আল্লাহ্‌ ছাড়া।

আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায
ডাইরেক্টর জেনারেল, জ্ঞান গবেষণা, ফাতওয়া,
দাওয়াত ও ইরশাদ বিভাগ, সাউদী আরব সরকার।

মাসায়েলে হজ্জ, উমরাহ, যিয়ারত

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه، وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل الإختصار والإيضاح قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقوله تعالى: ﴿ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين﴾ وقوله تعالى: ﴿ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه﴾ الاية، وقوله تعالى: ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى﴾ وبما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الدين النصيحة" ثلاثا، قيل لمن يا رسول الله؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم."

وروى الطبراني عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ومن لم يمس ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله وإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم" والله المسئول أن ينفعني بها والمسلمين وأن يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم إنه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل.

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র ঐ মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য নির্দিষ্ট-যিনি সমস্ত সৃষ্ট জগতের মালিক ও প্রতিপালক, আর সকল পরিণতি মুত্তাকীনদের জন্য। অতঃপর যাবতীয় আশীষ ও শান্তিধারা বর্ষিত হউক আল্লাহ্‌র বান্দাহ্ ও তদীয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, তাঁহার পরিবার-পরিজন এবং সাহাবাবর্গের প্রতি।

এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাখানি হজ্জ এবং উহার ফযীলত ও নিয়মাবলী সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে। হজ্জ পালনের জন্য যাহারা সফরের ইচ্ছাপোষণ করেন, তাহাদের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। হজ্জ সম্বন্ধীয় মাসআলাগুলি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হইয়াছে। হজ্জ, উমরাহ ও যিয়ারতের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম ও রীতিগুলি আমি পবিত্র কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের ভিত্তিতে সঠিকভাবে প্রমাণ সহকারে উপস্থাপন করিতে সচেষ্ট হইয়াছি। উম্মাতে মুসলিমার প্রতি ঐকান্তিক মঙ্গলাকাঙ্খায় এবং মহান আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ পালনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আমি এই কার্যে উদ্যোগী হইয়াছি। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ

"তুমি (আমার পক্ষ হইতে প্রেরিত বাণী দ্বারা) নসীহত কর। কারণ (আমার প্রদত্ত) নসীহত মুমিনদের জন্য উপকারী।"

(সূরা আয্‌যারিয়াতঃ ৫৫)

আল কুরআনের অপর আয়াতে বলা হইয়াছেঃ

"যাহাদিগকে কিতাব (-এর ইলম) দান করা হইয়াছে তাহাদের নিকট হইতে আল্লাহ্ তাআলা এই সুদৃঢ় শপথ গ্রহণ করিয়াছেন যে, তোমরা লোকদিগকে উহা বিশদভাবে বর্ণনা করিবা এবং উহা বিন্দুমাত্র গোপন করিয়া রাখিবা না।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৩)

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলিয়াছেনঃ

"তোমরা নেক কাজে ও খোদা-ভীতির পথে একে অপরকে সহায়তা কর, পরস্পর সহযোগিতা করিয়া চল।" (সূরা মায়েদা ঃ ২)

সহীহ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

"দ্বীন হইতেছে উপদেশ-পরামর্শের নাম।" রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা তিনবার বলিলেন। তাঁহার খেদমতে আরয করা হইলঃ কাহার জন্য উপদেশ-পরামর্শ? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্, তাঁহার কিতাব এবং তাঁহার রাসূলের (পক্ষে) এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দ এবং মুসলিম জনসাধারণের জন্য।

তাবরানী (রহঃ) হযরত হুযায়ফা রাযিআল্লাহু আনহু-এর উদ্ধৃতি বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি (হুযায়ফা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ

"যে ব্যক্তি মুসলমানদের কল্যাণমূলক যাবতীয় কার্যে স্বীয় ভূমিকা পালন না করে সে মুসলিম সমাজের অন্তর্ভূক্ত নহে। আর যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় (অর্থাৎ সর্বক্ষণ) আল্লাহ্, তদীয় কিতাব, তাঁহার রাসূল, তাঁহার (অনুগত মুসলমানদের) অধিনায়ক এবং সর্বসাধারণ মুসলমানদের হিতাকাংখী না হইবে, সে ব্যক্তি উম্মাতে মুসলিমার অন্তর্ভূক্ত নহে।"

অতঃপর একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার নিকট প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন এই পুস্তিকার দ্বারা আমাকে এবং সমগ্র মুসলিম জনসাধারণকে উপকৃত করেন এবং ইহার পশ্চাতে গৃহীত যাবতীয় উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দেন। তাঁহার দরবারে আমার ঐকান্তিক দোআ এই যে, তিনি যেন এই পুস্তিকাখানির বদৌলতে আমাকে তাঁর দরবারে জান্নাতে নাঈম লাভের তাওফীক প্রদান করেন। নিশ্চয় তিনিই হইতেছেন সর্বশ্রোতা ও একমাত্র প্রার্থনা মঞ্জুরকারী। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট, এবং তিনিই উত্তম ব্যবস্থাপক।

পরিচ্ছেদ-فصل

হজ্জ ফরয হওয়ার দলীল এবং উহার গুরুত্ব

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! অতঃপর আপনারা জ্ঞাত হউন। আল্লাহ্ আমাকে এবং আপনাদিগকে 'হক' সম্পর্কে অবহিত হওয়ার তাওফীক প্রদান করুন।

নিশ্চয় মহান ও মহীয়ান আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের উপর তাঁহার ঘর কা'বা শরীফের হজ্জ ফরয করিয়াছেন এবং এই হজ্জকে ইসলামের একটি স্তম্ভ হিসাবে নির্ধারণ করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেনঃ

﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ.﴾

"মানুষের উপর আল্লাহ্র এই অধিকার রহিয়াছে যে, যাহারা এই ঘর পর্যন্ত পৌঁছিবার সামর্থ আছে, সে যেন উহার হজ্জ সম্পন্ন করে। আর যে এই নির্দেশ পালন করিতে অস্বীকার করিবে তাহার জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ্ দুনিয়াবাসীদের প্রতি কিছুমাত্র মুখাপেক্ষী নন।" (সূরা আলে ইমরানঃ ৯৭)

বুখারী ও মুসলিম শরীফে সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

"بني الإسلام على خمسٍ : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام."

ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিতঃ

১। এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন যোগ্য উপাস্য নাই আর এই সাক্ষ্যদান করা যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার রাসূল,

২। নামায প্রতিষ্ঠা করা,

৩। যাকাত প্রদান করা,

৪। রমযানে সিয়াম (রোযা) পালন করা।

৫। এবং আল্লাহ্র ঘরের (কাবা গৃহে) হজ্জ্ব করা।

মুহাদ্দিস সাঈদ ইবনে মানসূর (রহঃ) তদীয় সুনানে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেনঃ

ولقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين.

"আমার ইচ্ছা হয় যে, কিছু সংখ্যক লোককে রাজ্যের শহরগুলিতে প্রেরণ করি এবং তাহারা (খুঁজিয়া খুঁজিয়া) দেখুক ঐ সমস্ত লোককে যাহারা হজ্জ্ব করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ্ব করে না-তাহাদের উপর তাহারা জিযিয়া কর চাপাইয়া দিক। কেননা, সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যাহারা হজ্জ্ব পালন করে না, তাহারা মুসলমান নয়, তাহারা মুসলমান নয়।"

হযরত আলী (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেনঃ

من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً.

"যে ব্যক্তি হজ্জ্বের সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ্ব পরিত্যাগ করিল, সে ইহুদী হইয়া মরুক অথবা নাসারা হইয়া মরুক-তাহাতে কিছুই যায়-আসে না।"

যে ব্যক্তির উপর হজ্জ্ব ফরয হইয়াছে তাহার পক্ষে হজ্জ্ব পালনে ত্বরান্বিত করা একান্ত প্রয়োজন। কেননা, সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর উদ্ধৃতি বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لايدري ما يعرض له.

"তোমরা ফরয হজ্জ্বের জন্য তাড়াতাড়ি কর। কেননা, তোমাদের কেহই একথা জানে না যে, তাহার ভাগ্যে কি রহিয়াছে।"

(এই হাদীস ইমাম আহমদ ইবেন হাম্বল (রহঃ) রেওয়ায়েত করিয়াছেন।)

সুতরাং সফরের সামর্থ লাভের ফলে যাহার উপর হজ্জ্ব ফরয হইয়াছে, তাহার বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না করিয়া আল্লাহ্‌র নির্দেশ মুতাবিক হজ্জ্ব পালন করা অবশ্য কর্তব্য। আল-কুরআনে বিঘোষিত হইয়াছেঃ

﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ.﴾

"মানুষের উপর আল্লাহ্‌র এই অধিকার রহিয়াছে যে, যাহার এই ঘর পর্যন্ত পৌছিবার সামর্থ আছে, সে যেন উহার হজ্জ্ব সম্পন্ন করে। আর যে এই নির্দেশ পালন করিতে অস্বীকার করিবে তাহার জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ্ দুনিয়াবাসীদের প্রতি কিছুমাত্র মুখাপেক্ষী নন।" (সূরা আলে ইমরানঃ ৯৭)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ

أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا (أخرجه مسلم).

"হে মানব সমাজ! আল্লাহ্ তোমাদের উপর হজ্জ্ব ফরয করিয়াছেন, সুতরাং তোমরা হজ্জ্ব পালন কর।" (মুসলিম)

হজ্জের সহিত উমরাহ ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

উমরাহ ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। উহার একটি হাদীসে হযরত জিব্রীল (আলাইহিস্ সালাম) কর্তৃক ইসলাম সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

"الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتصوم رمضان". (أخرجه ابن خزيمة والدار قطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال الدار قطني هذا إسناد ثابت صحيح).

"ইসলাম হইল এইঃ তুমি সাক্ষ্য প্রদান করিবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সত্য মা'বূদ নাই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র রাসূল, তুমি নামায কায়েম করিবে, যাকাত প্রদান করিবে, আল্লাহ্র ঘরের হজ্জ্ব করিবে এবং উমরাহ্ পালন করিবে, জানাবাতের গোসল করিবে, সঠিক ও পূর্ণাঙ্গরূপে ওযূ সম্পন্ন করিবে এবং রমযানের সিয়াম (রোযা) পালন করিবে।"

এই হাদীস ইমাম ইবনে খুযায়মাহ্ এবং দারাকুত্নী হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর উদ্ধৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম দারাকুত্নী বলিয়াছেন, এই হাদীস সঠিক এবং বিশুদ্ধ।

উমরাহ সম্বন্ধে আর একটি হাদীস উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) হইতে মুসনাদ আহমাদ এবং সুনান ইবনে মাজায় সহীহ্ সনদে বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মেয়েদের উপর কি জিহাদ ফরয? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ

(عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة).

মেয়েদের উপর এমন জিহাদ ফরয, যাহাতে লড়াই নাই-উহা হইতেছে হজ্জ ও উমরাহ্। (আহমাদ এবং ইবনে মাজাহ)

হজ্জ এবং উমরাহ্ জীবনে একবার মাত্র ফরয

জীবনে মাত্র একবার হজ্জ ও উমরাহ্ পালন করা ফরয। এসম্পর্কে সহীহ্ সনদে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

(الحج مرة فمن زاد فهو تطوع).

"হজ্জ মাত্র একবার ফরয। অতএব যদি কেহ একাধিকবার হজ্জ করে, তবে উহা (অতিরিক্ত হজ্জগুলি) নফল হইবে।"

তবে নফল হজ্জ ও উমরাহ্ একাধিকবার করাও সুন্নাত। সহীহ্ বুখারী এবং সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ

"العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة".

"এক উমরাহ হইতে আর এক উমরাহ-এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সময়ে কৃত (সগীরা) গুনাহসমূহের কাফ্ফারা স্বরূপ অর্থাৎ এক উমরার পর আরেক উমরাহ করিলে দুই উমরার মধ্যবর্তী সময়ে যত (সগীরা) গুনাহ করা হইয়াছে সমস্তই মাফ করিয়া দেওয়া হয়।"

হজ্জযাত্রার পূর্বে ওসীয়ত এবং তাওবাহ্ করা

কোন মুসলমান যখন হজ্জ বা উমরার জন্য সফরের সংকল্প গ্রহণ করে, তখন তাহার উচিত স্বীয় পরিবার-পরিজন এবং সঙ্গী-সাথীগণকে

তাক্ওয়ার জন্য নসীহত করা। এই নসীহতে আল্লাহ্র নির্দেশ পালন এবং তাঁহার নিষিদ্ধ কার্যাদি হইতে বিরত থাকার তাকীদ প্রদান করিবে। এমন কি তাহার কোন দেনা-পাওনা থাকিলে ওয়ারিসগণকে ডাকাইয়া- লিখিতভাবে উহা জানাইয়া দিবে এবং ইহার উপর সাক্ষী রাখিবে। ইহা ছাড়া, নিজের সকল প্রকার গুনাহ্ হইতে তাওবাতুন নাসূহার জন্য জলদী করা তাহার জন্য ওয়াজিব মনে করিতে হইবে। অর্থাৎ তাহার দ্বারা সংঘটিত যাবতীয় অন্যায় ও গুনাহগুলি স্মরণ করতঃ এমন খাঁটি ভাবে একাগ্রতার সাথে তাওবাহ্ করিবে যাহাতে ঐ অন্যায়গুলি পুনরায় সংঘটিত না করার জন্য দৃঢ়চিত্ত হওয়া যায়।

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করিয়াছেনঃ

﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.

"হে মুমিনগণ! তোমরা সকলেই আল্লাহ্র নিকট তাওবাহ্ কর, সম্ভবতঃ তোমরা কামিয়াব হইবে। (সূরা নূরঃ ৩১)

তাওবাহ্র তাৎপর্য

((حقيقة التوبة-))

তাওবাহ্র তাৎপর্য হইলঃ

অর্থঃ গুনাহ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে সরাইয়া রাখা এবং উহা চিরতরে পরিহার করা। পূর্বে যাহা তাহার দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে তাহার জন্য অনুশোচনা করা এবং ঐ রূপ কর্ম জীবনে পুনরায় না করার জন্য দৃঢ়সংকল্প হওয়া। যদি তাহার নিকট কাহারও জান, মাল ও সম্মান সম্পর্কে দাবী-দাওয়া থাকে, হজ্জের সফরে বাহির হওয়ার পূর্বেই তাহা হইতে মুক্ত হওয়া। অর্থাৎ অর্থের দাবী থাকিলে উহা পূরণ করা অথবা দাবীদারের নিকট হইতে ক্ষমা চাহিয়া লওয়া। কাহারও জানের ক্ষতি করিয়া থাকিলে যেভাবে সম্ভব হয় তাহার দাবী মুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ

"من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لايكون دينار ولا درهم".

যদি কাহারও নিকট তাহার ভাইয়ের জান-মাল বা মান-ইয্‌যতের উপর কোন রকম জোর-যুলুম বা অন্যায় করা হইয়া থাকে তবে উহা তাহার নিকট ফিরাইয়া দিবে অথবা উহা হইতে পাক-সাফ হইয়া যাইবে সেইদিন সমাগত হওয়ার পূর্বেই যেদিন কোন মাল-দীনার ও দিরহাম থাকিবে না। যদি তাহার নেক আমল থাকে তাহা হইলে কিয়ামত দিনে ঐ নেক আমল হইতে অন্যায়ের পরিমাণ অনুসারে নেকী কর্তন করতঃ তাহার দাবীদারের দাবী পূরণ করা হইবে। অর্থাৎ যতটুকু অন্যায় সে করিয়াছে ততটুকু নেকী অন্যায়কারীর নিকট হইতে কর্তন করিয়া দাবীদারের দাবী পূরণ করা হইবে। আর যদি অন্যায়কারীর কোন নেকী না থাকে তবে দাবীদারের পাপের অংশ অন্যায়কারীর উপর চাপাইয়া দেওয়া হইবে।

হজ্জ ও উমরার জন্য হালাল মাল

হজ্জ ও উমরার জন্য পবিত্র ও হালাল মাল বাছিয়া লইতে হইবে। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হইতে সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছেঃ

"إن الله طيب لايقبل إلا طيباً".

"আল্লাহ্ পূত পবিত্র। তিনি পবিত্র মাল ব্যতীত অন্য কিছুই গ্রহণ করেন না।" এ সম্পর্কে ইমাম তাবারানী আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিআল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে রেওয়ায়েত করিয়াছেন, যাহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ

"إذا خرج الرجل حاجاً بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور مأزور...".

"যখন মানুষ বিশুদ্ধ মাল লইয়া হজ্জের উদ্দেশ্যে বাহির হয়, অতঃপর যখন সে সওয়ারীর রেকাবে পা রাখিয়া- এহ্রামের এই দোআগুলি উচ্চারণ করেঃ "লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক", তখন আসমান হইতে জওয়াব আসে- "তোমার হজ্জের জন্য হাযির হওয়া ও হজ্জের উদ্দেশ্যে আগমন মঞ্জুর, তোমার সৌভাগ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত, তোমার পাথেয় হালাল, তোমার বাহন হালাল, তোমার হজ্জ কবুল ও ত্রুটিমুক্ত করিলাম।" আর যখন বান্দাহ্ অপবিত্র হারাম মাল লইয়া হজ্জের জন্য বাহির হয় এবং সওয়ারীর রেকাবে পা রাখিয়া "লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক" দোআগুলি উচ্চস্বরে বলিতে থাকে, তখন আসমান হইতে একজন আহ্বানকারী জওয়াবে ডাক দিয়া বলে, "লা লাব্বায়েক ওয়া লা সা'দায়েক"- তোমার হাযিরা মঞ্জুর নহে এবং তোমার সৌভাগ্য বলিয়াও কিছুই নাই। তোমার পাথেয়, তোমার পথের খরচ, সবই হারাম, সুতরাং তোমার হজ্জও গ্রহণীয় নয়।

কোন ব্যক্তির নিকট হাজীদের সওয়াল-যাঞ্চা করা অবৈধ

হাজীদের পক্ষে অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া এবং অন্য লোকের নিকট কিছু সওয়াল করা হইতে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

"ومن يستعف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله".

"যে ব্যক্তি সওয়াল-যাঞ্চা করা হইতে বাঁচিতে চায় আল্লাহ তাহাকে উহা হইতে বাঁচাইয়া দেন, আর যে আল্লাহ্র নিকট অভাব পূরণের কামনা করে, আল্লাহ্ তাহাকে অভাবমুক্ত করিয়া দেন।"

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলিয়াছেনঃ

"لايزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم".

"যে ব্যক্তি মানুষের নিকট পুনঃ পুনঃ সওয়াল -যাঞ্জা করিয়া বেড়ায়, কিয়ামতের দিনে এমন অবস্থায় সে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হইবে যে, তাহার মুখমণ্ডলে কোন গোশ্‌ত থাকিবে না।"

হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি

হাজীদের হজ্জ ও উমরার একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ এবং পরকালের সৌভাগ্য অর্জন। এরূপ লক্ষ্য স্থির করিয়া লওয়া হাজীদের জন্য ওয়াজিব। অতএব নির্দিষ্ট মর্যাদাপূর্ণ স্থানসমূহে এমন সব কথা ও আমল দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে আল্লাহ্‌ সন্তুষ্ট হন। আর দুনিয়া ও উহার মিথ্যা মায়াজাল চাকচিক্য হইতে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। লোক দেখানো বা হাজী নাম ভাঁড়াইয়া জনগণকে হজ্জের গল্প শুনাইয়া গর্ব প্রকাশ করা হইতে নিজেকে পূর্ণমাত্রায় বাঁচাইয়া চলিতে হইবে। কারণ এই সমস্ত উদ্দেশ্য বড়ই জঘন্য, উহা তাহার আমল বাতিল হওয়ার এবং আল্লাহ্‌র নিকট তাহার আমল গ্রাহ্য না হওয়ার কারণ রূপে বিবেচিত হয়। এই সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেনঃ

﴿مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لاَ يُبْخَسُوْنَ * أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾.

যাহারা পার্থিব জীবন ও উহার জাঁকজমকের আকাংখা করবে, তাহাদের আমলের প্রতিদান আমি এই জগতেই দিয়া থাকি এবং তাহাদিগকে এই জগতে প্রতিদান দেওয়ার ব্যাপারে কিছুমাত্র কম করা হয় না। কিন্তু তাহারা ঐ শ্রেণীভুক্ত যাহাদের পরকালে জাহান্নাম ব্যতীত আর কিছুই প্রাপ্য নাই। এই জগতে যাহারা যাহা কিছু করিয়াছে সমস্তই ধ্বংস ও বরবাদ হইয়া গেল আর যাহা কিছু আমল করিয়াছে সবই বাতিল হইয়া গেল। (সূরা হূদ : ১৫-১৬)

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলিয়াছেনঃ

﴿مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاَهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا * وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوْرًا﴾.

"যে ব্যক্তি পার্থিব জগতের সুখ সুবিধার আকাংখা পোষণ করিয়া থাকে, আমি তাহার জন্য এই জগতেই তাহার প্রার্থিত বস্তু দিয়া থাকি যেরূপ আমি ইচ্ছা করি এবং যাহাকে ইচ্ছা করি। তারপর তাহার জন্য নির্ধারিত করিয়া দেই সেই জাহান্নাম, সে উহাতে প্রবেশ করিবে হেয় প্রতিপন্ন হইয়া ভর্ৎসিত অবস্থায়; আর যে ব্যক্তি আখিরাতের কল্যাণ লাভের আকাংখা পোষণ করিয়া মুমিন থাকা অবস্থায় যথাযথ ভাবে সাধনা করিয়া চলে, এই ধরনের লোকদের সাধনা কবূল করা হয়।" (সূরা বনি ইসরাইলঃ ১৮-১৯)

এ সম্পর্কে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হইতে একটি হাদীসে কুদসী সহীহ্ সনদে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ বলেনঃ

"أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركه وشركه". أخرجه مسلم عن أبي هريرة

"সমস্ত শরীকদের মধ্যে আমি শিরক হইতে সর্বাধিক বে-নেয়ায-বেপরওয়া।" অর্থাৎ শরীকানা কাজের সহিত আমার কোনই সম্পর্ক নাই। সুতরাং যদি কেহ কোন কাজে আমার সহিত আমি ভিন্ন অন্যকে শরীক করে তখন আমি আল্লাহ্ তাহাকে এবং তাহার শিরককে পরিত্যাগ করিয়া থাকি। (ইমাম মুসলিম, হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

হজ্জের সফরে হজ্জযাত্রীকে নেক্‌কার, পরহেযগার এবং শরীয়তের জ্ঞান সম্পন্ন আলেমের সাহচর্য বরণ করা বাঞ্ছনীয়। অপর পক্ষে জাহেল এবং ফাসেক ধরনের লোকদের সংস্রব হইতে নিজেকে দূরে রাখা কর্তব্য। হজ্জ ও উমরার প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকর্মাদি সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং ঐ সমস্ত মাসআলা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত-যাহা সাধারণের জন্য কঠিন বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে হজ্জ বিষয়ক লব্ধ জ্ঞানে উহার তাৎপর্য তাহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

হজ্জ ও উমরাহ্ সফরের নিয়মাবলী

হজ্জের উদ্দেশ্যে যখন বাড়ী হইতে বাহির হইয়া নিজের সওয়ারী পশু, অথবা মোটর গাড়ী কিংবা উড়োজাহাজ অথবা ইহা ভিন্ন অন্য কিছুতে আরোহণ করিবে তখন একবার বিসমিল্লাহ্ ও আলহামদু লিল্লাহ পাঠ করিয়া তিনবার আল্লাহু আকবার বলিবে, তারপর এই দোআগুলি পড়িবেঃ

﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ * وَإِنَّا إِلَي رَبِّنَـــا لَمُنْقَلِبُوْنَ﴾.

বাংলা উচ্চারণঃ "সুবহা-নাল্লাযী সাখ্‌খারা লানা হা-যা ওয়ামাকুন্না লাহূ মু'করিনীন, ওয়া ইন্না-ইলা রাব্বিনা লামুন্‌কালিবূন।

"পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি ঐ মহান প্রভুর, যিনি আমাদের জন্য ইহাকে- সওয়ারী বা যাত্রার অন্য বাহনকে আমাদের অধীনস্থ করিয়া দিয়াছেন- আমরা কখনও উহাকে আয়ত্তে আনিতে পারিতাম না। নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাইব।"(সূরাঃ আয-যুখরুফ) তারপর বলিবেঃ

" اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِيْ هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَـــا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِعَنَّا بُعْـــدَهُ، اللَّـــهُمَّ أَنْـــتَ

الصَّاحِبُ فِيْ السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِيْ الاَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالاَهْلِ". (مسلم عــن ابن عمر)

বাংলা উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা ফী সাফারী হা-যাল বির্‌রা ওয়াত্‌তাক্‌ওয়া ওয়া মিনাল্ আমালি মা-তারযা; আল্লাহুম্মা হ'ওভিন আলায়না সাফারানা হা-যা ওয়াথ্‌বি 'আন্না বু'দাহূ। আল্লাহুম্মা আনতাস্ সা-হিবু ফিস্ সাফারি ওয়াল্ খালিফাতু ফিল আহলে-আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন ওয়া'সায়িস্ সাফারি ওয়া কা'আ-বাতিল মান্যারি ওয়া সুয়িল মুনকালাবি ফিল মালি ওয়াল আহলি।

“হে আল্লাহ্! আমি তোমার দরবারে এই সফরে নেকী ও তাক্ওয়া যাচঞা করিতেছি- আর এমন কাজের কামনা করিতেছি যাহা তোমার সন্তোষ অর্জনে সক্ষম হইবে। হে আল্লাহ্! আমাদের এই সফরের কষ্ট তুমি লাঘব করিয়া দাও। আমাদের জন্য উহার দূরত্ব কমাইয়া দাও। হে আল্লাহ্ ! তুমিই এই সফরে আমার একমাত্র সাথী এবং পরিবার-পরিজনের জন্য তুমিই আমার উত্তম প্রতিনিধি। হে আমার পরওয়ারদেগার আমি তোমার নিকট সফরের ক্লান্তি, বেদনাদায়ক দৃশ্য এবং প্রত্যাবর্তনের পর আমার সব নিরাপত্তার জন্য তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।"

এই হাদীসটি সহীহ্ মুসলিম শরীফে সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে।

হজ্জযাত্রী তাহার পুরা সফরে আল্লাহ্‌র যিক্‌র এবং স্বীয় গুনাহের কথা মনে করিয়া বারবার ইস্‌তেগফার পড়িতে থাকিবে এবং আল্লাহ্‌র নিকট বিনয় সহকারে তাঁহার করুণা প্রার্থনা করিবে। সে পবিত্র কুরআন পাঠ করিবে এবং উহার অর্থ অনুধাবনে সচেষ্ট হইবেঃ জামাতে নামায আদায় করিবার ব্যাপারে খুব যত্নবান হইবে। স্বীয় জিহ্বাকে বাজে

কথার উচ্চারণ কথাবার্তা হইতে নিজেকে সংযত রাখিবে। অপ্রয়োজনীয় কাজকর্ম ও অতিরিক্ত তামাসামূলক কথাবার্তা হইতে নিজেকে বিরত রাখিবে। স্বীয় রসনাকে মিথ্যা কথন, গীবত ও চুগলখুরী হইতে এবং স্বীয় সহচর ও অন্যান্য মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দকে হাস্যাস্পদ করার মত অবস্থা হইতে নিজেকে সংযত রাখিবে। এতদ্ব্যতীত হজ্জযাত্রীদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে, তাহাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করিবে, সাধ্যমত সুকৌশলে এবং মিষ্টি ভাষায় তাহাদিগকে ভাল কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং অপ্রিয় কাজ হইতে বিরত থাকার জন্য নসীহত করিবে।

পরিচ্ছেদ-فصل

ইহ্‌রাম বাঁধার সময়ে যাহা করণীয়

অতঃপর হজ্জযাত্রী যখন মীকাতে-ইহ্‌রাম বাঁধিবার নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিবে তখন তাহার জন্য গোসল করা এবং সুগন্ধি মাখা মুস্তাহাব-উত্তম কাজ। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি ইহরামের সময় সিলাইযুক্ত কাপড় ছাড়িয়া দিয়া গোসল করিতেন এবং সুগন্ধি মাখিতেন। বুখারী ও মুসলিম-এর হাদীসে হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেনঃ

"كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت."

"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহরাম বাঁধার পূর্বে সুগন্ধি মাখাইয়া দিয়াছি এবং হালাল হইবার সময়-১০ই যিলহাজ্জ তারিখে আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ করিবার পূর্বেও সুগন্ধি মাখাইয়াছি।" হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) উমরার জন্য ইহরাম বাঁধার পর হায়েয হইয়া গেলে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাকে গোসল করার নির্দেশ দেন এবং উমরার ইহরাম ছাড়িয়া দিয়া হজ্জের ইহরাম বাঁধিবার আদেশ প্রদান করেন।

আর আস্‌মা বিনতে উমায়স- হযরত আবূ বকর (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর স্ত্রী মদীনা হইতে হজ্জের জন্য বাহির হওয়ার পর যূল-হুলাইফা নামক স্থানে পৌঁছিয়া সন্তান প্রসব করিলে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহাকে গোসল করার নির্দেশ দেন এবং লজ্জাস্থানে আলাদা কাপড় ব্যবহার করিয়া ইহরাম বাঁধার হুকুম দেন।

ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, মেয়েরা ঋতুবর্তী হওয়া অথবা সন্তান প্রসব করার পর রক্তক্ষরণ বন্ধ হওয়ার পূর্বে যখন মীকাতে পৌঁছাইবে, তখন গোসল করিবে এবং অন্যান্য হজ্জযাত্রীদের সহিত ঐ অবস্থায় ইহরাম বাঁধিবে। হাজীগণ হজ্জের যেসব নিয়মাবলী পালন করে তাহারাও ঐগুলি পালন করিবে- কেবলমাত্র আল্লাহ্র ঘর তওয়াফ করা ছাড়া, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) ও হযরত আস্মাকে পূর্ণ করার নির্দেশ দেন।

ইহরাম অবস্থায় করণীয় কাজসমূহ

যে ব্যক্তি ইহরাম বাঁধিতে যাইতেছে তাহাকে নিজের গোঁফ, নখ, নাভির নীচের লোম এবং বগলের লোমগুলি পরিস্কার করার প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখিতে হইবে। সুতরাং ঐগুলি পরিস্কার করার প্রয়োজন হইলে অতি অবশ্য উহা পরিস্কার করিবে, যাহাতে ইহরাম বাঁধার পর ঐগুলি কাটার প্রয়োজন না হয়। কেননা ঐগুলি ইহরাম অবস্থায় কাটা হারাম। ইহার আরও কারণ হইল- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐগুলি পরিস্কার করার ব্যাপারে বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

"الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظافر ونتف الآباط".

ইসলামের স্বভাবসুলভ কাজ হইতেছে পাঁচটিঃ খাতনা করা, নাভির নীচের লোম ক্ষুর প্রভৃতি দ্বারা পরিস্কার করা, গোঁফ কাটিয়া ছোট করা, নখ কাটা ও বগল পরিস্কার করা।

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ

"وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة أن لانترك ذلك أكثر من أربعين ليلة".

"গোঁফ ছোট রাখা, নখ কাটা, বগল পরিস্কার করা এবং নাভির নীচের লোম পরিস্কার করিবার ব্যাপারে আমাদিগকে সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে যেন চল্লিশ দিনের অধিক আমরা উহা ছাড়িয়া না দেই। অর্থাৎ উহার কর্তন বা পরিস্কার করার কার্যে চল্লিশ দিনের অধিক সময় যেন অতিক্রম না করে। আর নাসায়ীতে এই কথা বলা হইয়াছে যে, এই সব কাজের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের জন্য সময় নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন।" ঐ হাদীস আহমাদ, আবূ দাউদ ও তিরমিযীতেও নাসায়ীর শব্দে বর্ণিত হইয়াছে।

وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام لا في حق الرجال ولا في حق النساء.

"আর মাথার চুল সম্পর্কে কথা এই যে, পুরুষদের জন্য হউক অথবা মেয়েদের জন্য হউক কাহারও পক্ষেই ইহ্রাম বাঁধিবার সময় মাথার চুল কাটা শরীয়তসম্মত নহে।" আর দাড়ি সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, উহা মুন্ডন করা বা উহার কিছু অংশ কর্তন করা সব সময়েই হারাম, বরং উহা ছাড়িয়া দেওয়া এবং বর্ধিত করা ওয়াজিব। কারণ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইবনে উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

"خالفوا المشركين، وفروا اللحى واحفوا الشوارب".

দাড়ি সম্পর্কে "তোমরা মুশরিকদের বিপরীত আচরণ অবলম্বন কর। দাড়ি বর্ধিত কর আর গোঁফ-মোচ ছোট কর। সহীহ্ মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

"جزوا الشوارب، وأرخو اللحى، خالفوا المجوس".

"তোমরা মোচ ছাটিয়া ফেল, দাড়ি ছাড়িয়া দাও, অগ্নি উপাসক সম্প্রদায়ের বিপরীত-ইসলামের নীতি অবলম্বন কর।"

এই যুগে অধিকাংশ মানুষ এই সুন্নাতের বিপরীত আচরণ করার ধর্মীয় মুসীবত এমন ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে যে, তাহারা দাড়ির সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং কাফিরদের অনুকরণে এমন সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, ঐ সঙ্গে নারী জাতির সহিত সাদৃশ্য স্থাপনের দিকে ঝুঁকিয়াছে।

لاسيما من ينتسب إلى العلم والتعليم.

বিশেষ করে আফসোস ঐ সমস্ত লোকের জন্য যাহারা বিদ্যাচর্চা ও শিক্ষার সহিত সম্পর্কিত! তাদের জন্য-

إنا لله وإنا إليه راجعون.

ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন পড়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।

نسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها... وحسبنا الله ونعم الوكيل ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

আমরা আল্লাহ্‌র নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, তিনি যেন আমাদের এবং মুসলমানদেরকে যাবতীয় সুন্নাত মেনে চলার এবং সুন্নতকে মযবূত সহকারে আঁকড়াইয়া ধরার এবং উহার প্রতি লোকদের আহ্বান জানানোর দিকে আমাদেরকে পরিচালিত করেন, যদিও অধিকাংশ লোক সুন্নত হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে। তবে আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম ব্যবস্থাপক। আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত মানুষের জন্য অন্যায় কর্ম ও কষ্টদায়ক বস্তু হইতে মুখ ফিরাইয়া থাকা এবং লাভজনক কর্মে আত্মনিয়োগ করার কোন শক্তি নাই।

ইহরাম অবস্থায় পরিধেয় বস্ত্র

অতঃপর পুরুষগণ-সিলাইবিহীন লুঙ্গী ও চাদর পরিধান করিবে, লুঙ্গী ও চাদর উভয়ই সাদা এবং পরিস্কার হওয়া মুসতাহাব। এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী নিম্নরূপঃ

"وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين" أخرجه الامام أحمد رحمه الله.

তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই হজ্জ অথবা উমরার জন্য ইহরাম বাঁধার সময় যেন একটি লুঙ্গী ও চাদর এবং এক জোড়া জুতা পরিধান করে। ইমাম আহমাদ (রাহেমাহুল্লাহ) উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আর মেয়েদের বেলায় যে কোন রংয়ের কাপড় পরিধান পূর্বক ইহ্‌রাম বাঁধা বৈধ। উহা কালো, সবুজ অথবা যে কোন রংয়ের হওয়া জায়িয আছে। তবে এই বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে যে, তাহাদের পোশাক যেন পুরুষদের পোশাকের মত না হয়। আর যাহারা মেয়েদের ইহরামের জন্য অন্য সব রং বাদে কেবলমাত্র সবুজ বা কালো রংয়ের কাপড় পরিধান করিবার কথা নির্দিষ্ট করিয়া দেন-শরীয়তে তাহাদের এই কথার কোন ভিত্তি নাই।

ইহরাম কালীন নিয়ত

তাহার পর হাত-পায়ের নখ, গোঁফ, বগলের লোম প্রভৃতি পরিস্কার করা এবং গোসল ও ইহরামের কাপড় পরিধানের পর হজ্জ বা উমরা-এই দুই ইবাদতের যেটিই সে করিতে চায় তাহার সংকল্প হৃদয়ে পোষণ করিবে, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى" ويشرع له التلفظ.

"আমলসমূহ নিয়তের উপরই নির্ভরশীল-প্রত্যেক মানুষ যে উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া নিয়ত করিবে তাহাই সে পাইবে।"

হজ্জ বা উমরা এই দুই ইবাদতের যে কোনটির জন্য সে নিয়ত করিবে, উহা মৌখিক উচ্চারণ করা শরীয়ত সিদ্ধ। অতএব যদি তাহার নিয়ত উমরার জন্য হয় তবে বলিবে-

لَبَّيْكَ عُمْرَةً أَوِ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً.

"লাব্বাইকা উমরাতান" কিম্বা "আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান"। আর যদি তাহার নিয়ত হজ্জের জন্য হয়, তবে বলিবেঃ

لَبَّيْكَ حَجًّا أَوْ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ حَجًّا.

লাব্বাইকা হাজ্জান অথবা লাব্বাইকা হাজ্জান।

কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইরূপই করিয়াছেন। পরিবহণ পশু হউক অথবা মোটর বা বিমান হউক অথবা অন্য যাই হোক, নির্দিষ্ট পরিবহণের উপর আরোহণের পর উক্ত নিয়তের শব্দ মুখে উচ্চারণ করা উত্তম। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন স্বীয় সওয়ারী-উটের উপর উপবেশন করিলেন এবং উট মীকাত হইতে সফরের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে লইয়া চলিবার জন্য খাড়া হইল, তখনই তালবিয়া-লাব্বাইক উচ্চারণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের বহুমতের মধ্যে এইটিই বিশুদ্ধতম।

ইহরাম ব্যতীত অন্য ইবাদতে সশব্দে নিয়ত উচ্চারণ বিদ্‌আত

ইহরাম ছাড়া অন্য কোন ইবাদাতে মৌখিক নিয়তে শব্দ উচ্চারণ করা শরীয়তে বৈধ নয়, কেননা কেবল ইহরামের সময়ই "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম" হইতে ঐরূপে বলিবার কথা বর্ণিত হইয়াছে।

وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له أن لايتلفظ في شيء منها بالنية.

কিন্তু নামায, তওয়াফ বা অন্য যে কোন ইবাদতে নিয়তের কোন শব্দ মুখে উচ্চারণ না করাই উচিত।

فلا يقول: نويت أن أصلي كذا وكذا...

অতএব বলিবে না যে, অমুক অমুক নামায পড়ার নিয়ত করিতেছি,

نويت أن أطوف كذا...

নাওয়াইতু আন্ আতুফা কাযা-আমি অমুক তওয়াফের নিয়ত করিতেছি।

بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة والجهر بذلك أقبح وأشد إثمًا.

বরং মুখে নিয়তের কথা উচ্চারণ করা অভিনব বিদ'আত, আবার জোরেশোরে বলা আরও জঘন্য বিদ'আত এবং শক্ত গোনাহ্।

ولو كان التلفظ بالنية مشروعًا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأو ضحه للأمة بفعله أو قوله ولسبق إليه السلف الصالح.

"যদি নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা শরীয়তে বৈধ হইত, তাহা হইলে এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য উহা স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করিতেন এবং আমলে বা বর্ণনায় স্বীয় উম্মতকে উহা পরিস্কার ভাবে বুঝাইয়া দিতেন। উপরন্তু সাল্ফে সালেহীন-সাহাবায়ে কেরাম (রাযিআল্লাহু আনহুম) ও তাবেয়ীগণ আমাদের পূর্বে উহা অবশ্যই করিতেনঃ

فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه المرضيين علم أنه بدعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة" أخرجه مسلم في صحيحه.

"অতঃপর যখন উহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত হয় নাই এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রিয়

সাহাবাগণ হইতেও উহার কোন বর্ণনা পাওয়া যায় নাই, অতএব একথা নিশ্চিতরূপে জানা গেল যে, উহা বিদ'আত।

রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমাইয়াছেন, সবচেয়ে খারাপ কাজ হইতেছে-শরীয়তে নব উদ্ভাবিত কাজসমূহ আর শরীয়তে প্রমাণ নাই এমন প্রত্যেক নূতন কাজ গোমরাহী। (সহীহ মুসলিম)

পরিচ্ছেদ-فصل

মীকাতের বর্ণনা

المواقيت خمسة

মীকাত পাঁচটিঃ

প্রথম মীকাতঃ মদীনাবাসীদের জন্য। উহার নাম হইলঃ ذو الحليفة "যুলহুলাইফা"। আজকাল সর্বসাধারণের মাঝে উহা ابيار علـــى আবইয়ারে আলী বলিয়া কথিত।

দ্বিতীয় মীকাত হইতেছেঃ الجحفة "আলজুহ্ফাহ" সিরিয়াবাসীদের এবং ঐ রাস্তা দিয়া যাহারা আসিবে তাহাদের জন্য।

জুহ্ফা-রাবাগ নামক স্থানের নিকটবর্তী একটি বিরান গ্রাম। যদি রাবাগে পৌছিয়াই কেহ ইহ্রাম বাঁধে, তাহাও যথেষ্ট হইবে। কারণ রাবাগ জুহ্ফার অনতিদূরেই অবস্থিত।

তৃতীয় মীকাত হইল ঃ قـــرن المنـــازل "করনুল মানাযিল"। উহা নজদ্‌বাসীদের ইহরাম বাঁধিবার স্থান। আজকাল উহার নাম হইয়াছে "আস্‌সায়েল"।

চতুর্থ মীকাত হইলঃ يــلملـــــم "ইয়ালাম্‌লাম"। উহা ইয়ামানবাসীদের মীকাত।[১]

পঞ্চম মীকাত হইলঃ ذات عــــــرق "যাতে-ইর্‌ক"। উহা ইরাকবাসীদের মীকাত।

---

[১]। ইহাই বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান হইতে জলযানে হজ্জযাত্রীদেরও মীকাত। ইয়ালামলাম একটি পর্বতের নাম-সমুদ্র হইতে দেখা যায় না। জাহাজ উহার বরাবর আসার প্রাক্কালে জাহাজের কাপ্তান বা হজ্জযাত্রীদের আমীরগণ উহা জানাইয়া দেন।

উপরোল্লিখিত মীকাতসমূহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখিত এলাকাবাসীদের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন এবং ঐ এলাকাবাসী ছাড়া অন্যান্য স্থানের লোক যাহারা হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে ঐ মীকাত দিয়া অতিক্রম করিবেন তাঁহাদের জন্যও উহা নির্ধারণ করিয়াছেন।

ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করা হারাম

والواجب على من مر عليها أن يحرم منها ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون احرام...

"যে ব্যক্তি ঐ মীকাত অতিক্রম করিবে, তাহার জন্য ঐখানেই ইহরাম বাঁধিয়া লওয়া ওয়াজিব হইবে এবং ইহরাম ব্যতীত ঐস্থান দিয়া অতিক্রম করা হারাম হইবে যখন হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় পৌঁছিবার এরাদা রাখিবে। স্থলপথে ঐ স্থান অতিক্রম করা হউক অথবা আকাশ পথে উহক। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঐরূপ ব্যাপক অর্থে বর্ণিত হইয়াছেঃ

"هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة".

"ঐ মীকাতগুলি ঐ এলাকাবাসীদের জন্য। আর যাহারা হজ্জ ও উমরাহ্ করার উদ্দেশ্যে ঐ স্থানে পৌঁছিবে, তাহাদের জন্যও মীকাত নির্ধারিত।" স্থল পথে ঐ স্থান অতিক্রম করা হউক অথবা আকাশ পথে হউক। আর যাহারা হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্য লইয়া মক্কার আকাশপথে আসিবার এরাদা করিবে তাহাদের জন্য বিমানে আরোহণের পূর্বেই গোসল প্রভৃতির মাধ্যমে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ সারিয়া লইবে। অতঃপর যখন মীকাতের কাছে পৌঁছিবে তখন লুঙ্গী ও চাদর পরিধান করিবে, তারপর যদি দীর্ঘ সময় থাকে তবে "লাব্বায়কা" বলিয়া উমরার ইহরাম বাঁধিবে। আর যদি সময় সংকীর্ণ হয় তবে লাব্বাইকা বলিয়া হজ্জের ইহরাম বাঁধিবে। আর যদি বিমানে আরোহণের পূর্বে কিংবা

মীকাতের নিকট পৌছিবার পূর্বে কোন হজ্জযাত্রী লুঙ্গী ও চাদর পরিধান করিয়া নেয় তাতেও কোন দোষ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সে হজ্জের ইবাদতে শামিল হইয়াছে, একথা মনে করা চলিবে না। অর্থাৎ "লাব্বাইকা" মুখে উচ্চারণ করা চলিবে না। কিন্তু যখনই জানিতে পারিবে যে, জলযান বা বিমান-মীকাতের কাছাকাছি কিংবা উহার বরাবর স্থান পর্যন্ত পৌছিয়াছে, তখন "লাব্বাইকা" বলিয়া ইহরামের নিয়ত করিতে হইবেঃ

لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات.

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মীকাত ছাড়া ইহরাম বাঁধেন নাই।

الواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم.

উম্মতে মোহাম্মদীর উপর অবশ্যই কর্তব্য এই যে, তাহারা যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থাপিত দ্বীনের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় হজ্জের বিষয়েও তাঁহার পূর্ণ অনুসরণ করিয়া চলে। কারণ আল্লাহ্ তাআলা বলিয়াছেনঃ

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

তোমাদের জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যাবতীয় কাজে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে বলিয়াছেনঃ

"خذوا عني مناسككم".

"তোমরা আমার নিকট হইতে হজ্জের আহকামসমূহ গ্রহণ কর।"

হজ্জ অথবা উমরাহ ব্যতীত অন্য কোনও উদ্দেশ্য লইয়া যাহারা মক্কায় আসে তাহাদের জন্য ইহরাম বাঁধা জরুরী নহে। যেমন ব্যবসায়ী, লাকড়ী সংগ্রহকারী, ডাক পিয়ন ইত্যাদি। তবে ইহারা যদি নিজেরা ইহা

করিতে চায়, করিতে পারে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস বর্ণিত।

"هن لهن ولمن أتي عليهن"–

এই সব "মীকাত" ইহরাম বাঁধার স্থান তাহাদের জন্য যাহারা হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে আগমনকারী এবং ঐ সমস্ত লোকদের জন্যও যাহারা ঐ মীকাত অতিক্রম করে।

যে ব্যক্তি হজ্জ ও উমরার ইরাদা ব্যতীত মীকাতের নিকট দিয়া অতিক্রম করিবে তাহার জন্য ইহরাম জরুরী নহে। স্বীয় বান্দাদের উপর দ্বীনকে সহজ করিবার জন্য ইহা আল্লাহ্ তাআলার অন্যতম রহমত। সুতরাং ইহার জন্য আল্লাহ্ তাআলার হামদ এবং শোকর। উহার আর একটি প্রমাণ এই যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মক্কা বিজয়ের বৎসরে সাহাবাগণ সমভিব্যহারে মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তিনি ছিলেন সৈনিকের বেশে লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায়। সেই সময় তিনি ইহরাম বাঁধেন নাই বা সাহাবাগণকেও উহা বাঁধিবার নির্দেশ দেন নাই। কেননা তখন তিনি হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে নয়, বরং মক্কা বিজয় এবং কাবার অভ্যন্তরে যে শিরক প্রচলিত ছিল তাহা দূর করার উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করিয়াছিলেন।

মীকাতের চতুঃসীমায় অবস্থানকারীদের জ্ঞাতব্য

وأما من كان مسكنه دون المواقيت كســـكان جــدة وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة...

মীকাতের চতুঃসীমার ভিতরে যাহাদের বাসস্থান যেমনঃ জেদ্দা, উম্মুসসালাম, বাহরাহ-তায়েফ ও মক্কার মধ্যবর্তী একটি স্থান-আশ্‌শারায়েঅ, বদর, মাসতুরাহ প্রভৃতি স্থানসমূহে অবস্থানকারীগণকে হজ্জ বা উমরার ইহরাম বাঁধার জন্য উল্লেখিত পাঁচটি মীকাতের মধ্যে কোন একটির নিকটও পৌছাইতে বা যাইতে হইবে না।

بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه.

"বরং তাহাদের অবস্থান স্থলই তাহাদের মীকাত স্বরূপ।" অতঃপর হজ্জ বা উমরার ইরাদা করিলে ঐ স্থান হইতেই ইহরাম বাঁধিবে। আর যদি কাহারও মীকাতের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে দুই স্থানেই বাসস্থান থাকে তবে তাহার জন্য এখ্তিয়ার আছে যেখান হইতে ইচ্ছা সেখান হইতেই ইহরাম বাঁধিতে পারে। অথবা যদি সে ইচ্ছা করে তাহার বাসস্থান হইতেই ইহরাম বাঁধিতে পারে, যাহা মীকাত হইতে মক্কার অধিক নিকটবর্তী।

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মীকাতের উল্লেখ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাসের (রাযিআল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে সাধারণভাবে নির্দেশ দিয়াছেনঃ

"ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة". أخرجه البخاري ومسلم.

"যাহারা মীকাতের ভিতরে অবস্থান করে তাহাদের ইহরাম বাঁধিবার স্থান হইবে তাহাদের নিজস্ব অবস্থানস্থল, এমন কি মক্কার লোক মক্কাতেই ইহরাম বাঁধিবে।" (বুখারী-মুসলিম)

لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة.

"কিন্তু যে ব্যক্তি উমরার ইরাদা করিবে 'হারাম' সীমায় থাকা অবস্থায় তাহাকে হারামের সীমানা হইতে বাহির হইয়া আসিতে হইবে এবং হারামের চতুঃসীমার বাহিরে গিয়া উমরার ইহরাম করিতে হইবেঃ

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه.

কেননা নবী সহধর্মিনী হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উমরাহ পালন সম্পর্কে তাঁহার আকাঙ্খার কথা জানাইলেন, তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আয়িশার (রাযিআল্লাহু আনহা) সহোদর ভ্রাতা আবদুর রহমানকে তাঁহার ভগ্নি আয়িশাকে (রাযিআল্লাহু আনহা) সঙ্গে লইয়া হারাম সীমার বাহিরে যাওয়ার এবং সেখান হইতে ইহরাম বাঁধিয়া লইয়া আসার হুকুম প্রদান করিলেন।

ইহাতে বুঝা গেল যে, হারামের সীমানার ভিতরে অবস্থানকারীগণ উমরাহ করা কালে হারাম সীমার ভিতরে ইহরাম বাঁধিবে না। বরং হারাম হইতে বাহিরে আসিতে হইবে। এখন রহিল পূর্বোল্লিখিত ইবনে আব্বাসের হাদীস যাহার সারমর্ম "মক্কাবাসীগণ মক্কা হইতেই ইহরাম বাঁধিবে" উহা কেবল মাত্র হজ্জের জন্য প্রযোজ্য উমরার জন্য প্রযোজ্য নহে। কেননা উমরার ইহরাম হারাম সীমার অভ্যন্তরে বৈধ হইলে হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা)- কে উহার অনুমতি দিতেন এবং হারাম সীমার বাহিরে পৌছাইয়া উমরার ইহরাম বাঁধার জন্য কষ্ট স্বীকারের নির্দেশ দিতেন না। ইহা একটি দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট ব্যাপার। ইহাই অধিকাংশ আলেমগণের উক্তি এবং মুমিনের জন্য সন্দেহাতীত পন্থা। কেননা উহাতে উভয় হাদীসের প্রতি আমল করা হইল। আল্লাহ্ তাআলাই হইতেছেন তাওফীকদাতা

হজ্জের পর বেশী সংখ্যায় উমরাহ করা শরীয়তসম্মত নহে

পূর্বে উমরাহ করা সত্ত্বেও উহার পর কিছু সংখ্যক লোক হজ্জের পর অধিক সংখ্যক উমরাহ করার আগ্রহ প্রবণতায় 'তানয়ীম' বা জে'এরানা নামক স্থানে গিয়া উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধিয়া আসে। ইহার কোন দলীল নাই। বরং সমুদয় দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উহা না করাই উত্তম।

لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج.

"কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার সাহাবা (রাযিআল্লাহু আনহুম)গণ হজ্জ হইতে ফারেগ হওয়ার পর কখনই এরূপ উমরাহ করেন নাই।"

অবশ্য তানয়ীম হইতে হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর উমরাহ শুরু করার বিষয়টি সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, উহা শুধু এই কারণে হইয়াছিল যে, স্বীয় মাসিক-ঋতু শুরু হওয়ার কারণে তিনি লোকদের সহিত মক্কায় প্রবেশকালে উমরাহ সমাপন করিতে পারেন নাই। ফলে হজ্জের পর পাকসাফ অবস্থায় তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সেই উমরাহ যাহা মীকাত হইতে শুরু করিয়াছিলেন তাহা ঋতুর কারণে বাতিল হইয়া যাওয়ায় উহার পরিবর্তে নতুনভাবে উমরাহ করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। ফলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহাকে সেই অনুমতি প্রদান করেন।

এইভাবে তাঁহার দুইটি উমরাহ পালন হইয়া গেল-একটি হজ্জের সহিত সম্পাদিত উমরাহ, অপরটি এই পৃথক উমরাহ। অতএব যদি কেহ হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর মত অবস্থার সম্মুখীন হন, তাহা হইলে তিনি হজ্জের পরও উমরাহ করিতে পারেন। এইভাবে শরীয়তের সমস্ত দলীল মুতাবিক কার্য সম্পাদিত হইবে এবং হজ্জে সকল মুসলমানের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা হইবে। হজ্জের পর হাজীদের মক্কায় প্রবেশকালীন উমরাহ ছাড়া আর একটি উমরাহ করিতে উদ্যোগী হওয়া সকলের জন্যই কষ্টের কারণ হইয়া থাকে। কেননা, উহাতে একদিকে লোকদের ভয়ঙ্কর ভিড় হয়, দুর্ঘটনা আশঙ্কা দেখা দেয়, অপরদিকে উহা দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিদায়াত এবং সুন্নতের পরিপন্থী কাজ করা হয়। সঠিকভাবে সুন্নতের অনুসরণ করিয়া চলার তাওফীক দানকারী হইলেন একমাত্র মহান আল্লাহ্ তাআলা।

হজ্জের সময় ছাড়া অন্য সময় মীকাত অতিক্রমকারীদের করণীয়

জানিয়া রাখা কর্তব্য মীকাত অতিক্রমকারীদের করণীয় কাজসমূহে দুইটি নিয়ম রহিয়াছেঃ

প্রথমঃ হজ্জের মওসুম ছাড়া যেমন রমযান অথবা শা'বান মাসে যদি কেহ মীকাতে পৌছে তবে তাহার জন্য সুন্নত তরীকা হইতেছে এই যে, সে অন্তরে উমরার নিয়তে ইহরাম বাঁধিবে এবং এইভাবে মুখে সশব্দে লাব্বাইকা উচ্চারণ করিবেঃ

لَبَّيْكَ عُمْرَةً أَوْ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً.

লাব্বাইকা উমরাতান অথবা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান।

উহার পর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ন্যায় এইভাবে তালবিয়া পাঠ করিতে থাকিবেঃ

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ.

"লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়কা, লাব্বায়কা লা শরীকা লাকা লাব্বায়কা, ইন্নাল্ হাম্‌দা ওয়ান্ নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলকা লা-শারীকা লাকা।

আমি হাযির তোমার দরবারে, আয় আল্লাহ্! তোমার দ্বারে আমি হাযির, তোমার কোনই অংশীদার নাই। তোমার দরবারে উপস্থিত হইয়াছি। সর্বপ্রকার প্রশংসা এবং নি'য়ামত সামগ্রী সবকিছুই তোমার, সর্বযুগে ও সর্বত্র তোমারই রাজত্ব, তোমার কোন অংশীদার নাই।

এই তালবিয়া খুব বেশী মাত্রায় পড়িতে থাকিবে এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু এর অধিক মাত্রায় যিক্‌র করিতে থাকিবে। অতঃপর এইভাবে তালবিয়া এবং যিক্‌র করিতে করিতে যখন আল্লাহ্‌র ঘর কাবায়

পৌঁছিবে, তখন তালবিয়া পড়া বন্ধ করিয়া দিবে এবং সাতবার আল্লাহ্র ঘরের তওয়াফ করিবে। তওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাকাত নামায পড়িবে। তারপর সাফার দিকে যাইবে এবং সাফায় পৌঁছিয়া সাফা-মারওয়ার মধ্যভাগ সাতবার সাঈ করিবে। ইহার পর মাথার চুল মুন্ডন করিবে অথবা ছোট করিবে।

এই নিয়মে তাহার উমরাহ পূর্ণ হইয়া গেল এবং ইহরামের কারণে যাহা যাহা হারাম ছিল তাহা এখন হালাল হইয়া গেল।

আর দ্বিতীয় হইল হজ্জঃ হজ্জের মাসগুলিতে মীকাতে পৌঁছা আর ঐগুলি হইতেছে শওয়াল, যিলক্বদ, এবং যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশক- এই সময়ের মধ্যে আগমনকারীদের জন্য নিম্নলিখিত তিন নিয়মের যে কোন একটি নিয়ম তাহাদের অবলম্বন করার ইখ্তিয়ার আছে।

একঃ কেবলমাত্র হজ্জ। দুইঃ কেবলমাত্র উমরাহ। তিনঃ হজ্জ ও উমরাহ উভয়ই একসাথে।

কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যিলক্বদ মাসে বিদায় হজ্জে মীকাতে পৌঁছিয়া সাহাবাদেরকে (রাযিআল্লাহু আনহুম) এই তিন নিয়মের যে কোন একটি অবলম্বনের ইখ্তিয়ার দিয়েছিলেন।

কিন্তু সুন্নত নিয়ম এই যে, ইহ্রাম বাঁধার সময়ে যাহার সহিত কোরবানীর জানোয়ার না থাকে সে কেবলমাত্র উমরার ইহরাম বাঁধিবে এবং হজ্জের নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত অন্য সময়ে উমরাহ করার নিয়মে- যাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে ঐ নিয়মে উহা পালন করিবে। কারণ সাহাবাগণ (রাযিআল্লাহু আনহুম) যখন মক্কার নিকটবর্তী হইলেন তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাদের হজ্জের ইহরামকে উমরার হিসাবে গণ্য করিবার নির্দেশ দেন এবং ঐ বিষয়ে তাঁহাদেরকে মক্কায় গিয়া জোর তাকীদও দেন। সে মতে সাহাবাগণ (রাযিআল্লাহু আনহুম) আল্লাহ্র ঘর তওয়াফ করিলেন, সাফা মারওয়াহ সাঈ করিলেন

এবং মাথার চুল ছোট করিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মুতাবিক ইহরাম ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু ঐ সমস্ত ইহরামকারীগণ যাহাদের সহিত কোরবানীর জানোয়ার ছিল তাঁহারা উমরাহ সমাপন করার পর ইহরাম অবস্থায় রহিয়া গেলেন। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাদিগকে ১০ই যিলহজ্জে কোরবানী করার পর হালাল না হওয়া পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকার নির্দেশ দিয়াছিলেন।

والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعًا.

ইহরামের সময়ে অথবা মক্কায় প্রবেশের পূর্বে কোরবানীর জানোয়ার যাহার সহিত থাকিবে তাহার জন্য সুন্নত নিয়ম এই যে, সে ব্যক্তি হজ্জ ও উমরার ইহরাম একই সাথে বাঁধিবে।

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وكان قد ساق الهدي وأمر من ساق الهدي من أصحابه وأهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته.

"কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বয়ং ঐরূপ করিয়াছিলেন এবং তিনি কোরবানীর জানোয়ার সঙ্গে আনিয়াছিলেন। আর যে সমস্ত সাহাবা (রাযিআল্লাহু আনহুম) কোরবানীর জানোয়ার সঙ্গে আনিয়াছিলেন অথচ কেবল উমরার ইহরাম বাঁধিয়াছিলেন, তাহাদেরকেও তিনি নির্দেশ দিলেন যে, তাহারা উমরার ইহরামের সাথে হজ্জের ইহরামও বাঁধিবে এবং আল্লাহুম্মা লাব্বায়কা হাজ্জাতান ও উমরাতান বলিবে। আর মক্কায় পৌঁছাইয়া উমরাহ সমাপনের পরই হালাল হইবে না; বরং হজ্জ সমাপন করিয়া কোরবানীর দিবসে কোরবানীর পর হালাল হইবে। আর যাহারা কেবলমাত্র হজ্জের ইহরাম বাঁধে, উমরার নিয়ত করে না, অথচ কোরবানীর জন্য জানোয়ার সঙ্গে আনে তাহারাও ইহরাম অবস্থায় থাকিয়া যাইবে এবং (উমরাহ ও হজ্জ দুইটি সমাপন করার পর ১০ই যিলহজ্জ ইহরাম ছাড়িবে।)[১] হজ্জে-কেরানকারীদের ন্যায় তাহারা কোরবানীর দিবসে হালাল হইয়া যাইবে।

---

[১] । অনুবাদকের ব্যাখ্যা।

অতএব ইহা দ্বারা জানা গেল, যে ব্যক্তি শুধু হজ্জের অথবা হজ্জ ও উমরাহ উভয়েরই নিয়ত করিয়াছে অথচ তাহার সহিত কোরবানীর জানোয়ার নাই, তাহার জন্য মক্কায় পৌঁছাইয়া আল্লাহ্‌র ঘর তওয়াফ, সাফা মারওয়াহ সাঈ এবং মাথার চুল ছোট করার পর অর্থাৎ উমরাহ সমাপনের পর ইহরাম অবস্থায় থাকা আদৌ উচিত হইবে না।

بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك إلا أن يخشى فوات الحج.

বরং তাহার জন্য সুন্নত পদ্ধতি এই যে, হজ্জে কেরানের নিয়ত এর ইহরামকে উমরার ইহরাম গণ্য করিয়া তওয়াফ ও সাঈ-এর পর মাথার চুল ছোট করিয়া ইহরাম ছাড়িয়া দিবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ সমস্ত সাহাবাগণ (রাযিআল্লাহু আনহুম) যাহাদের সহিত কোরবানীর জানোয়ার ছিল না অথচ শুধু হজ্জের বা হজ্জ-উমরাহ উভয়েরই একত্রে নিয়ত করিয়া ইহরাম বাঁধিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে ঐরূপ হালাল হওয়ার হুকুম দিয়াছিলেন।

হ্যাঁ, তবে যদি অবস্থা এইরূপ হয় যে, ঐ ধরনের নিয়ত করার পর মক্কায় পৌঁছাইতে দেরী হইয়া গেল, যান-বাহন প্রভৃতির গোলযোগের জন্য রাস্তায় এত দেরী হইয়া গেল যে, উমরাহ পূর্ণ করার পর হজ্জ ছুটিয়া যাওয়ার আশংকা দেখা দিল, তাহার জন্য ঐ অবস্থায় একই ইহরামে হজ্জ ও উমরাহ করা জায়েয হইবে। এই অবস্থায় ইহরাম না ছাড়িয়া "আল্লাহুম্মা লাব্বায়েকা হাজ্জাতান" বলিয়া তালবিয়া পড়িতে পড়িতে মীনা চলিয়া যাইবে। ঐ অবস্থায় সাবেক ইহরাম না ছাড়িলে কোন দোষ হইবে না।

পথে অসুস্থ হইলে অথবা দুশমন কর্তৃক বাধাপ্রাপ্তির আশংকা দেখা দিলে ইহরাম বাঁধিবার নিয়ম

কোন ইহরামকারী তাহার অসুস্থতা, শত্রুর ভয়, অথবা অনুরূপ অন্য কোন কারণে হজ্জের অনুষ্ঠানগুলি পালন করিতে সমর্থ হইবে না বলিয়া আশংকা হইলে তাহার নিম্নলিখিত দো'আ পাঠ করা উত্তম হইবেঃ

فَإِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ فَمَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ.

"যদি কোন বাধাদায়ক বস্তু আমায় হজ্জের অনুষ্ঠান পুরাপুরি আদায়ে বাঁধা দেয়, তবে হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যেখানেই আটকাইয়া দিবে সেখানে আমার ইহরাম ভঙ্গ হইবে, ফলে আমি হালাল হইয়া যাইব।

ইহার স্বপক্ষে যুবাআ'হ বিনতে যুবাইর ইবনে আবদুল মুত্তালিব-এর হাদীসটি উল্লেখযোগ্য।

যুবাআ'হ বিনতে যুবাইর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একদা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি হজ্জ করার ইরাদা রাখি, কিন্তু আমি পীড়িত! এখন আমার কি করা উচিত?

তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

"حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني". (متفق عليه)

"তুমি হজ্জে বাহির হও এবং ইহরামের সময় শর্ত আরোপ কর - হে আল্লাহ্! অসুখ প্রভৃতি কারণে আমাকে তুমি যেখানেই আটকাইয়া দিবে সেখানেই আমার ইহরাম শেষ হইবে, আমি তখনই হালাল হইয়া যাইব।"

এই শর্তারোপের উপকারিতা এই যে, মুহরিম ব্যক্তির উপর যখন অসুস্থতা দুশমন প্রভৃতির বিপদাশংকা তাহার হজ্জের আরকান পুরা করিতে বাঁধা সৃষ্টি করে, যাহার ফলে ইহরাম পরিত্যাগ করিতে হয় এইরূপ অবস্থায় তাহাকে কোন ক্ষতিপূরণ বা কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না।

পরিচ্ছেদ-فصل

حج الصغار

অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের হজ্জ

ছোট বালক-বালিকার হজ্জ সিদ্ধ হইবে। সহীহ মুসলিম শরীফে ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একজন মহিলা তাঁহার এক শিশু পুত্রকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই শিশুর কি হজ্জ হইবে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তরে বলিলেন,

"نعم ولك أجر".

হ্যাঁ, তাহার হজ্জ হইয়া যাইবে, আর উহার সওয়াব তুমি পাইবে।

সহীহ বুখারী শরীফে সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ

"حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين".

"আমার বয়স যখন সাত বৎসর, তখন আমাকে সঙ্গে লইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হজ্জ করান হয়।"

তবে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের হজ্জ ইসলামের ফরয হজ্জ হিসাবে গণ্য হইবে না। অনুরূপভাবে গোলাম ও বান্দী-কৃতদাস ও কৃতদাসীরও তাহাদের মনিবদের সহিত হজ্জ করিলে উহা ফরয হজ্জরূপে আদায় হইবে না। ইহার দলীল হইতেছে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর হাদীস যাহাতে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ

"أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخري، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخري"، (أخرجه ابن أبي شيبـــــة والبيـــهقي بإسناد حسن).

"যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক অথবা বালিকা-তাহার অভিভাবকের সহিত হজ্জ করিল, বয়প্রাপ্ত এবং সামর্থের অধিকারী হওয়ার পর তাহার উপর পুনঃ হজ্জ ফরয হইবে। আর যে গোলাম তাহার মনিবের সঙ্গে হজ্জ করিল, তারপর সে আযাদ হইল এবং হজ্জের সামর্থ অর্জন করিল তখন তাহার উপর দ্বিতীয় বার হজ্জ ফরয হইবে।

এই হাদীস ইবনে শায়ব মুহাদ্দিস এবং ইমাম বায়হাকী প্রামাণ্য সনদে রেওয়ায়েত করিয়াছেন।

অতঃপর জ্ঞাতব্য এই যে, বালক যদি ভাল-মন্দ ও পবিত্র-অপবিত্র বোধশুন্য হয় তবে তাহার অভিভাবক তাহার পক্ষে নিয়ত করিয়া লইবে। সেলাই করা কাপড় ছাড়াইয়া তাহাকে সেলাইবিহীন কাপড় পরাইবে এবং তাহার পক্ষ হইতে তালবিয়া পড়িবে। এইভাবে বাচ্চা মুহরিম বলিয়া গণ্য হইবে। সুতরাং প্রাপ্তবয়স্ক মুহরিমের জন্য যাহা নিষিদ্ধ তাহার জন্যও তাহা নিষিদ্ধ হইবে। ঐ একইভাবে যে বালিকা অনুরূপ ভালমন্দ ও পবিত্র-অপবিত্র বোধশুন্য, তাহার অভিভাবক তাহার পক্ষে ইহরামের নিয়ত করিয়া তাহার পক্ষ হইতে তালবিয়া পাঠ করিবে এবং এইভাবে সে মুহরিমা হইয়া যাইবে। আর বয়স্কা মুহরিমার জন্য যাহা নিষিদ্ধ তাহা উঁহার জন্যও নিষিদ্ধ হইবে। তওয়াফের সময় তাহার কাপড় এবং দেহ পাক-সাফ রাখিতে হইবে। কেননা তওয়াফ নামাযেরই অনুরূপ। নামাযের জন্য শরীর ও কাপড় পাক-সাফ হওয়া যেমন শর্ত, তাওয়াফের জন্যও তাই।

আর বালক ও বালিকা যদি বোধ-শক্তি সম্পন্ন হয় অর্থাৎ পাক-নাপাকির জ্ঞান রাখে, তবে তারা অভিভাবকের অনুমতি লইয়া ইহরাম

বাঁধিবে এবং তাহারা ইহরামের সময় ঐ নিয়মগুলি পালন করিবে যাহা বয়স্করা করিয়া থাকে-অর্থাৎ গোসল করা, সুগন্ধি মাখা প্রভৃতি কাজসমূহ। হজ্জ সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় কাজগুলির তত্ত্বাবধান করিবে তাহাদের অভিভাবকগণ-তাহারা পিতা হউন অথবা অন্য কেহ। কঙ্কর মারা প্রভৃতি যেসব কাজ করিতে তাহারা অসমর্থ তাহাদের অভিভাবকগণ তাহা তাহাদের পক্ষ হইতে করিয়া দিবে। এই গুলি ছাড়া অন্যান্য কাজগুলি নিজেই করিবে যেমন আরাফায় অবস্থান, মুযদালিফা ও মীনায় রাত্রি যাপন, তওয়াফ এবং সাঈ করা। আর যদি নাবালক ও নাবালিকাগণ তওয়াফ, সাঈ প্রভৃতি করিতে অপারগ হয় সেই অবস্থায় তাহাদিগকে উঠাইয়া লইয়া তওয়াফ এবং সাঈ করাইতে হইবে।

এক্ষেত্রে উত্তম পন্থা এই যে, তাওয়াফ ও সাঈ উভয়ের একত্রে সম্পাদন করা চলিবে না। বরং বালক-বালিকার জন্য তওয়াফ ও সাঈ-এর নিয়ত করিবে এবং নিজের জন্য পৃথক তওয়াফ ও পৃথক সাঈ করিবে। ইবাদতের ক্ষেত্রে ইহাই সাবধানতামূলক নীতি আর ইহাতে ঐ হাদীস শরীফ মুতাবিক আমল হইবে যে হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

"دع ما يريبك إلى ما لايريبك".

"সন্দিগ্ধ কথা পরিত্যাগ করিয়া সন্দেহমুক্ত কথার প্রতি আমল কর।"

কিন্তু যদি বাহক তার নিজের এবং তার পরিবাহিত বাচ্চার তওয়াফ এবং সাঈ-এর নিয়ত একসঙ্গে করে তবে আলেমগণের দুই প্রকার উক্তির মধ্যে বিশুদ্ধতর উক্তি মুতাবিক ইহাও যথেষ্ট হইবে।

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই মেয়েটিকে পৃথকভাবে তওয়াফ করার হুকুম প্রদান করেন নাই, যে মেয়েটি স্বীয় বাচ্চার হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যদি উহা ওয়াজিব হইত, তাহা হইলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উহা স্পষ্টভাবেই বলিয়া দিতেন। একমাত্র আল্লাহ্ই তওফীকদাতা।

আর যে বালক ও বালিকা পাক-নাপাকির জ্ঞান রাখে তাহাকে তওয়াফ আরম্ভ করার পূর্বে নাপাক হইতে পাক হওয়ার এবং ওযূ অবস্থায় থাকার নির্দেশ দিতে হইবে- বয়স্ক মুহরিম ঠিক যেরূপ পবিত্র অবস্থায় থাকে। ছোট বালক-বালিকাদের পক্ষ হইতে তাহাদের অভিভাবকের প্রতি ইহরাম বাঁধা ওয়াজিব নহে, যদি সে উহা করে, তাহা হইলে সেজন্য নেকী পাইবে আর যদি উহা পরিহার করে তবে সেজন্য তাহার উপর কোন দোষ বর্তিবে না। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

পরিচ্ছেদ-فصل

في محظورات الإحرام

ইহরাম অবস্থায় যাহা নিষিদ্ধ এবং যাহা সিদ্ধ

ইহরামের নিয়ত করার পর মুহরিমের জন্য- সে পুরুষ হউক অথবা স্ত্রীলোক নিজের চুলের কিছু অংশ কর্তন করা বা নখ কাটা কিংবা সুগন্ধি মাখা সিদ্ধ নয়। বিশেষ করে পুরুষদের জন্য ঐ পোশাক পরিধান জায়েয নহে যাহা মুলতঃ সেলাই করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে, যেমন গেঞ্জী, পায়জামা, চামড়ার মোজা, পশমী ও কাপাশ সুতার মোজা। হ্যাঁ যদি লুঙ্গী না পায় তবে তাহার জন্য পায়জামা পরা চলিবে। অনুরূপভাবে জুতা না পাইলে চামড়ার মোজা পরিবে, তাই বলিয়া ঐ মোজার কিয়দাংশ অর্থাৎ পায়ের গিরার উপরাংশ কাটিয়া ফেলার প্রয়োজন হইবে না। ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে সহীহ হাদীসে প্রমাণিত হইয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

"من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل".

"যে ব্যক্তি জুতা না পাইবে, সে চামড়ার তৈয়ারী মোজা পরিধান করিবে, আর যে লুঙ্গী না পাইবে, সে পায়জামা ব্যবহার করিবে।"

আর ইবনে উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস যাহাতে উল্লেখিত হইয়াছে যে, ইহরাম অবস্থায় জুতা না পাইলে খুফফাইন অর্থাৎ চামড়ার মোজার পায়ের গিরার উপরাংশ কাটিয়া পরিধান করিবে। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, উক্ত হাদীসটি মানসুখ অর্থাৎ উহার হুকুম রহিত হইয়াছে। যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইবনে উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) কর্তৃক হাদীসটি বলিয়াছিলেন বিদায় হজ্জে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে। মদীনায় থাকা অবস্থায় যখন তাঁহাকে মুহরিমের জন্য পরিধেয় বস্ত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তখন তিনি এরূপ বলিয়াছিলেন। তারপর যখন বিদায় হজ্জে আরাফায় খুৎবা প্রদান করেন

ঐ সময় জুতা না পাওয়া অবস্থায় চামড়ার মোজা পরিধান করার অনুমতি দেন, উহাতে ঐ মোজার পায়ের গিরার উপরাংশ কাটিয়া ফেলার নির্দেশ প্রদান করেন নাই। আরাফার এই খুৎবায় ঐ সব লোক উপস্থিত ছিলেন যাহারা মদীনায় প্রদত্ত হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পূর্বের নির্দেশ শুনেন নাই। এহেন প্রয়োজন মুহূর্তে ঐরূপ গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা স্থগিত রাখা বিধিসম্মত নহে, ইহা উসূলে হাদীস ও উসূলে ফিক্‌হের সুবিদিত কথা। অতএব শেষোক্ত হাদীস দ্বারা চামড়ার মোজার পায়ের গিরার উপরাংশ কাটার নির্দেশ মানসুখ হওয়া সাব্যস্ত হইতেছে। যদি উহা কাটিয়া ফেলা ওয়াজিব হইত, তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার শেষ উক্তিতে উহা অবশ্যই প্রকাশ করিতেন। ওয়াল্লাহু আলামু- আল্লাহই অধিক জানেন।

আর মুহরিমের জন্য ঐ ধরনের চামড়ার মোজা পরিধান করা সিদ্ধ যাহা পায়ের গিরার নীচে পর্যন্ত প্রস্তুতকৃত, কেননা উহা জুতার পর্যায়ভুক্ত আর মুহরিমের জন্য লুঙ্গীতে গিরা দিয়া বাঁধা কিংবা সুতা ফিতা বা রশি জাতীয় কিছু দিয়া বাঁধিয়া লওয়া জায়েয। কেননা ঐ ধরনের কাজ নিষিদ্ধ হওয়ার কোন দলীল নাই। মুহরিমের জন্য গোসল করা এবং মাথা ধৌত করা জায়েয এবং যখন মাথা চুলকাইবার দরকার হইবে, তখন ধীরে ধীরে সহজভাবে চুলকাইবে। এই চুলকানোর কারণে মাথা হইতে চুল, খুসকী প্রভৃতি কিছু পড়িলে কোন দোষ হইবে না- অর্থাৎ উহার কারণে কোন কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না। ইহরামকালে মহিলাদের জন্য সিলাইকৃত বোরকা অর্থাৎ মুখাবরণ, মুখাচ্ছাদন বস্ত্র পরিধান করা হারাম এবং হাত- মোজা পরিধান করাও হারাম। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরামকারী মেয়েদের সম্পর্কে এই বলিয়া নির্দেশ প্রদান করিয়াছেনঃ

"لاتنتقب المرأة ولا تلبس القفازين" رواه البخاري.

মেয়েরা মুখাচ্ছাদন পরিবে না এবং দস্তানা- হাত মোজাও পরিবেনা। (বুখারী)

দস্তানা হইতেছে সেই হাত মোজা যাহা পশমী কিংবা তুলার সুতায় অথবা অন্য কিছুর দ্বারা দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত বানানো হয়। ইহা ছাড়া মেয়েদের জন্য অন্যান্য সিলাই করা কাপড় পরা বৈধ হইবে, যেমন কামীজ, জামা, পায়জামা, পায়ের জন্য চামড়ার মোজা, সূতী মোজা ইত্যাদি। অনুরূপভাবে মেয়েদের যখন প্রয়োজন দেখা দিবে তখন তাহাদের মুখমন্ডলের উপর উড়না লটকানো জায়েয হইবে, তবে ঐ অবগুণ্ঠন বন্ধনী ছাড়া হইতে হইবে।

যদি উড়না মেয়েদের মুখ স্পর্শ করে তাহাতে তাহার কোন ক্ষতি নাই ; যেমন আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেনঃ

"كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه" أخرجه أبو داود وابن ماجه، وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله.

"যখন আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বিদায় হজ্জযাত্রী ছিলাম তখন আমাদের পার্শ্ব দিয়া কাফেলা অতিক্রম করিত। যখন কাফেলার লোকজন আমাদের নিকট দিয়া অতিক্রম করিত, তখন আমরা মাথা হইতে চাদর চেহারার উপর ঝুলাইয়া দিতাম আর যখন তাহারা আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইত তখন আমরা মুখের উপর হইতে কাপড় তুলিয়া দিতাম।" এই হাদীস আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজা রেওয়ায়েত করিয়াছেন। ইমাম দারাকুতনী উম্মে সালমা (রাযিআল্লাহু আনহা) হইতে অনুরূপ হাদীস রেওয়ায়েত করিয়াছেন। অনুরূপভাবে মেয়েরা যদি তাহাদের হস্তদ্বয় বস্ত্র বা অন্য

কিছু দ্বারা ঢাকিয়া রাখে তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। বরং পর পুরুষের উপস্থিতিতে নারীদের চেহারা এবং হাত ঢাকিয়া রাখা ওয়াজিব ; কারণ উহা ঢাকিয়া রাখারই বস্তু-আওরাত। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলিয়াছেনঃ

﴿وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ﴾.

নারীরা তাহাদের সৌন্দর্য তাহাদের স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারও সম্মুখে প্রকাশ করিবে না। (সূরা নূরঃ ৩১)

তিনি আরও বলিয়াছেনঃ

ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة والوجه في ذلك أشد وأعظم.

"এবং নিঃসন্দেহে নারীদের মুখমন্ডল ও হস্তের অগ্রভাগ সৌন্দর্যের স্থল, বিশেষ করিয়া মুখমন্ডল এই ব্যাপারে অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং মারাত্মক উপাদান। আল্লাহ্ তাআলা এসম্পর্কে সাবধান করিয়া বলিয়াছেনঃ

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْئَلُوْهُنَّ مِن وَّرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ﴾. الآية.

"আর যখন তোমরা পর নারীর নিকট কোন বস্তু চাহিবা, তখন পর্দার আড়াল হইতে চাহিবা, যেন একে অপরকে দেখিতে না পাও। ইহা তোমাদের ও তাহাদের হৃদয়ের জন্য পবিত্র পন্থা।"

(আল-আহ্যাবঃ ৫৩-৫৪)

وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم-

ولو كان مشروعًا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته و لم يجز له السكوت عنه.

"আর বস্তুত পক্ষে অধিকাংশ নারী (পাংখাজালী নামক) যে এক প্রকার মুখাবরণী ইহরাম অবস্থায় ব্যবহার করিবার অভ্যাস করিয়াছে, যাহাতে উড়নাটা মুখ হইতে উপরে উঠাইয়া রাখা হয়, আমাদের জানা মতে শরীয়তে উহার ভিত্তি নাই। যদি শরীয়তে উহা সিদ্ধ হইত, তবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় উম্মতের জন্য উহা অবশ্যই বর্ণনা করিয়া যাইতেন। এই ব্যাপারে তিনি কিছুতেই নীরব থাকিতেন না।"

ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه ... وإبدالها بغيرها.

"মুহরিম পুরুষ অথবা নারী যে কাপড় পরিধান করিয়া ইহরাম গ্রহণ করিয়াছে ঐ কাপড় ময়লা হইলে অথবা ঘর্মে সিক্ত কিংবা অন্য কোন অনুরূপ কারণে উহা ব্যবহারের অযোগ্য হইলে উহা ধুইতে পারে এবং ঐ কাপড় বদলাইয়া অন্য কাপড় পরিতে পারে। জাফরান বা কুসুম রঞ্জিত কাপড় মুহরিমের জন্য পরা জায়েয নহে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইবনে উমরের (রাযিআল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে ঐরূপ কাপড় পরিতে নিষেধ করিয়াছেনঃ

ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال.

"বেহায়াপনা, শরীয়ত পরিপন্থী কথা ও কাজ এবং বিবাদ-বিসংবাদমূলক কথা পরিত্যাগ করা মুহরিমের জন্য ওয়াজিব, যেমন আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾.

"হজ্জ অনুষ্ঠিত হয় সুবিদিত মাসগুলিতে, অতঃপর যে ব্যক্তি এই মাসগুলিতে হজ্জ করা তাহার কর্তব্য মনে করে তাহার জন্য হজ্জের

সময়ে স্ত্রী সম্ভোগ, বেহুদা ও ফাসেকী কাজ ও কথা এবং ঝগড়া-বিবাদ করা উচিত নয়।" (সূরা বাকারাঃ ১৯৭)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেনঃ

"من حج فلم يرفث و لم يفسق رجع كيوم ولدته أمه".

"যে ব্যক্তি হজ্জ করিল এবং নির্লজ্জ ও শরীয়ত বিরোধী কাজ হইতে নিজেকে বিরত রাখিল, সে ব্যক্তি হজ্জ হইতে এরূপ অবস্থায় বাড়ী প্রত্যাবর্তন করিল, যেন সেই দিনই তাহার মা তাহাকে নবজাত শিশুরূপে প্রসব করিল।" অর্থাৎ সে শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হইল। কুরআন ও হাদীসে 'রাফাস' বলিতে বুঝায় স্ত্রী-সম্ভোগ এবং নির্লজ্জ কথা ও কাজকে, ফুসূক হইল সাধারণ গুনাহের কাজ এবং 'জেদাল' বলিতে বুঝায় এমন বাজে কথা যাহাতে কোনই কল্যাণ নাই এবং এমন বিষয় যাহা লইয়া না-হক ঝগড়া-বিবাদ করা হয়। কিন্তু

فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس بل هو مأمور به.

সত্যের প্রতিষ্ঠা এবং বাতিল ও শরীয়ত পরিপন্থী কাজ দমন করার জন্য কথা কাটাকাটি ও তর্কযুদ্ধ করাতে কোনই দোষ নাই। বরং কুরআন করীমে উহার নির্দেশই দেওয়া হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলিয়াছেনঃ

﴿ أُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ ﴾

"হে রাসূল! আপনি মানব সমাজকে আপনার প্রভু-প্রতিপালকের পথে আহ্বান করুন হিকমতের সাথে এবং হৃদয়গ্রাহী উপদেশ দ্বারা এবং উহাদেরকে যুক্তিতর্ক দ্বারা বুঝান সদ্ভাবে উত্তম পন্থায়।" (সূরা নহলঃ ১২৫)

পুরুষ মুহরিমের জন্য মাথায় লাগিয়া থাকে এমন কিছু দ্বারা মাথা ঢাকা হারাম, যেমন টুপী, রুমাল, পাগড়ী কিংবা ঐ ধরনের কাপড় দ্বারা। অনুরূপভাবে তাহার মুখমন্ডলও ঢাকা চলিবে না। যেমন হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি আরাফার দিবসে সওয়ারী উট হইতে পড়িয়া মারা গেলে তাহার সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাহাকে পানি ও কুলপাতা দ্বারা গোসল দাও, (কুলপাতা কুটাইয়া সাবানের পরিবর্তে) এবং তাহার ইহরামের ঐ দুই কাপড়েই তাহাকে দাফন দাও। আর কাফন দেওয়ার সময় মাথা ও মুখ ঢাকিও না, কেননা ঐ ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে তালবিয়া লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়ক পড়িতে পড়িতে উঠিবে-বুখারী ও মুসলিম। হাদীসের শব্দগুলি মুসলিমের। তবে সে গাড়ীর ছাদ, ছাতা কিংবা তাঁবু অথবা কোন গাছের তলে আশ্রয় গ্রহণ করিলে কোন দোষ হইবে না। কারণ সহীহ হাদীসে প্রমাণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ১০ই যিলহজ্জ তারিখে জামরাতুল উকবায় যখন কাঁকর মারিতেছিলেন, তখন তাঁহার মাথার উপর কাপড় দ্বারা ছায়া করা হইয়াছিল এবং ৯ই যিলহজ্জ তারিখে নামেরা নামক স্থানে তাঁহার জন্য তাঁবু নির্মাণ করা হইয়াছিল। তিনি আরাফার দিবসে উহার নীচে অবতরণ করেন এবং সূর্য ঢলিয়া পড়া পর্যন্ত তথায় অবস্থান করেন।

ইহরাম অবস্থায় পুরুষ অথবা মহিলা সকলের জন্য স্থলচর জানোয়ার শিকার করা হারাম, এই ব্যাপারে অপরকে সহায়তা করাও হারাম। কোন শিকারকে উহার অবস্থান জায়গা হইতে বিতাড়িত করাও হারাম। ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করা বা বিবাহের পয়গাম দেওয়া হারাম। নারীদের সহিত যৌন আকর্ষণে শরীরের সঙ্গে শরীর লাগানও হারাম।

হযরত উসমান (রাযিআল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

"لاينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب". (رواه مسلم)

"মুহরিম নিজে বিবাহ করিবে না, অপরকে বিবাহ করাইবে না এবং বিবাহের কোন পয়গামও দিবে না। (মুসলিম)

মুহরিম যদি ভুলবশতঃ অথবা অজ্ঞানতার কারণে সিলাই করা কাপড় পরিধান করে অথবা মাথা ঢাকিয়া ফেলে কিংবা সুগন্ধি লাগায়, তবে তজ্জন্য তাহাকে কাফ্ফারা দিতে হইবে না। তবে যখনই উহা স্মরণ হইবে কিংবা জানিতে পারিবে তখনই উহা হইতে বিরত থাকিবে। অনুরূপভাবে যদি মাথা কামাইয়া ন্যাড়া করিয়া ফেলে অথবা চুলের অংশবিশেষও কাটিয়া ফেলে, কিংবা ঐরূপ ভুল অথবা না জানার কারণে নখ কাটিয়া ফেলে তবে এই সব ক্রুটির জন্য সহীহ্ হাদীস মুতাবিক তাহার উপর কোন দোষ বর্তিবে না এবং এজন্য তাহাকে কোনরূপ কাফ্ফারা দিতে হইবে না।

'হারাম' এলাকার মর্যাদা রক্ষা

যে কোন মুসলমানের জন্য পুরুষ অথবা নারী সে মুহরিম হউক অথবা গায়র-মুহরিম- ইহরাম অবস্থায় না থাকুক সর্ব অবস্থাতেই হারাম সীমানার মধ্যে শিকারযোগ্য যে কোন জানোয়ার হত্যা করা হারাম। উহা হত্যার জন্য অস্ত্র কিংবা কোনরূপ ইঙ্গিত দ্বারা সাহায্য করাও হারাম। 'হারাম' সীমানায় বৃক্ষ কর্তন এমন কি তাজা ঘাস কাটাও হারাম। 'হারাম' সীমানার ভিতরে পতিত কোন বস্তু উঠানও চলিবে না, তবে শুধু ঐ ব্যক্তিই উহা উঠাইতে পারে যে উহার মূল মালিকের সন্ধান নিতে ইচ্ছুক।

এসম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী এইঃ

"إن هذا البلد- يعني مكة- حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولايختلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد " (متفق عليه)

"এই শহর অর্থাৎ মক্কা নগরী আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ায় কিয়ামত দিবস পর্যন্ত 'হারাম'। উহার গাছ কাটা, শিকারযোগ্য জানোয়ারকে বিতাড়ণ করা এবং তাজা ঘাস কাটা যাইবে না, পড়িয়া থাকা দ্রব্য-সামগ্রীও উঠানো চলিবে না, কেবল ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে উহার হারানো বস্তু সম্বন্ধে যথারীতি প্রচার ও ঘোষণা করিতে প্রস্তুত থাকিবে। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখিত "মুনশিদ" শব্দের অর্থ হইতেছেঃ যে ব্যক্তি পরিচয় করাইয়া দেয় আর 'খালা' শব্দের অর্থ তাজা ঘাস।

মীনা এবং মুযদালিফা হারাম সীমানার অন্তর্ভূক্ত আর আরাফাত হারাম এলাকার বহির্ভূত অর্থাৎ হালাল এলাকার অন্তর্গত।

পরিচ্ছেদ-فصل

মক্কায় পৌঁছিয়া হাজীগণ কি করিবে?

মক্কায় পৌঁছিয়া হাজীদের কা'বার তওয়াফের পূর্বে গোসল করা উত্তম কাজ। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ সময় গোসল করিয়াছিলেন। তারপর মসজিদুল হারামে প্রবেশকালে সুন্নত মুতাবিক প্রথমে ডান পা রাখিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিম্নোক্ত দোআ পাঠ করিবেঃ

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ্, আউযুবিল্লাহিল আযীম ওয়া বিওয়াজ্‌হিহিল কারীম ওয়া সুলতা নিহিল ক্বাদীম মিনাশ্‌ শায়তানির রাজীম-আল্লাহুম্মাফ্‌তাহ্‌লী আবওয়াবা রাহ্‌মাতিকা।

আল্লাহ্‌র নামে শুরু করিতেছি দরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি। মহান ও মহীয়ান আল্লাহ্ এবং তাঁহার মর্যাদাশীল সত্তা ও চিরন্তন কর্তৃত্বের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি বিতাড়িত শয়তান হইতে। হে দয়াময় আল্লাহ্! তোমার রহমতের দরওয়াজা আমার জন্য খুলিয়া দাও।

ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم.

"শুধু মসজিদুল হারামেই নয়, সমস্ত মসজিদে প্রবেশকালেই এই দোআ পড়িবে। আমি যতদূর জানি, খাস করিয়া মসজিদুল হারামে

প্রবেশ করার সময় পড়ার জন্য পৃথকভাবে নির্দিষ্ট কোন দোআ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে প্রমাণিত নাই।"

بسم الله والله أكبر.

মসজিদুল হারামে প্রবেশের পূর্বে কেবল উমরাহ্ অথবা হজ্জের সঙ্গে উমরাহ্-তামাত্তু করিতে মনস্থ করিলে প্রথমে কা'বা শরীফ তওয়াফ করিবে। তওয়াফ আরম্ভ করার পূর্বে কা'বায় পৌছিয়া তালবিয়া বন্ধ করিয়া দিবে।

তারপর কা'বার দক্ষিণ কোণে রক্ষিত হাজ্‌রে আসওয়াদের নিকট যাইবে। সেখানে গিয়া কেবলামুখী হইয়া হাজ্‌রে আসওয়াদকে সম্মুখে রাখিয়া উহা স্বীয় হস্তদ্বারা স্পর্শ করিবে এবং অতঃপর মুখ লাগাইয়া চুম্বন করিবে যদি উহা করা সহজ হয়; আর ভীড়ের দরুন চুম্বন সম্ভব না হইলে ঠেলাঠেলি বা ধাক্কাধাক্কি করিবে না। ইহাতে যেমন একদিকে নিজের কষ্ট হইবে, অপরদিকে অনেকে কষ্ট পাইতে পারে। হাজরে আসওয়াদ স্পর্শের সময় بسم الله والله أكبر 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার' বলিবে। যদি বেশী ভীড়ের কারণে চুম্বন করা সম্ভব না হয় তবে ডান হাত অথবা হাতের ছড়ি বাড়াইয়া উহা দ্বারা হাজ্‌রে আসওয়াদ স্পর্শ করাইবে। অতঃপর ঐ হাত বা ছড়ি চুম্বন করিবে। আর যদি হাত বা ছড়ি দ্বারাও স্পর্শ করা সম্ভব না হয়, তবে কেবলমাত্র হাজ্‌রে আসওয়াদের প্রতি নিজ হাতে ইশারা করিয়া 'আল্লাহু আকবার' বলিবে। কিন্তু ইশারাকৃত হাত চুম্বন করিবে না। তারপর বায়তুল্লাহকে বামে রাখিয়া তওয়াফ আরম্ভ করিবে। প্রথম তওয়াফে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত এই দোআ পাঠ করা উত্তমঃ

اللَّهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَإِتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ঈমানাম বিকা ওয়া তাসদীকাম বিকিতাবিকা ওয়া ওয়াফাআম বিআহদিকা ওয়া ইত্তিবাআললিসুন্নাতি নাবিইয়্যিকা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

হে আল্লাহ্! আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করিয়া এবং আপনার কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আপনার নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নতের অনুসরণ করিয়া আমি এই কর্তব্য পালন করিতেছি।

তওয়াফে ৭ চক্র দিতে হয়। জানিয়া রাখা দরকার যে, উমরাকারী অথবা হজ্জে তামাত্তুকারী কিংবা কেবলমাত্র ইহ্রামকারী কিংবা হজ্জ ও উমরাহ একত্রে হজ্জে কেরানকারী সর্বপ্রথম যখন মক্কায় পৌছিবে, তখনই প্রথম তওয়াফের তিনটি চক্রে রামল করিবে। অবশিষ্ট চারি চক্র হাঁটিয়া চলিবে। হাজ্রে আসওয়াদ হইতে প্রত্যেক চক্র আরম্ভ করিয়া ঐখানেই পৌছিলে প্রথম চক্র শেষ হইবে এবং এইভাবে এক চক্র পূর্ণ হইবে। 'রামাল' হইল ছোট ছোট কদমে বা পদক্ষেপে দ্রুত চলা।

পুরা ৭ চক্রের এই প্রথম তওয়াফে ইযতিবা করিতে হইবে। ইযতিবা সহকারে এই প্রথম বারের ৭চক্রের তওয়াফ মুস্তাহাব। হজ্জ ও উমরার জন্য প্রথম বার আল্লাহ্র ঘর তওয়াফ কালে 'ইযতিবা' করিতে হয়। উহার পর যতবার তওয়াফ করিবে উহার কোনটিতেই 'ইযতিবা' নাই। এখন ইয্তিবা কি জানা দরকার।

ইযতিবার নিয়ম

ইহরাম অবস্থায় পরিহিত চাদরের মধ্যভাগকে ডাইন কাঁধের নীচে দিয়া চাদরের উভয় কোণ বাম কাঁদের উপর ধারণ করিতে হইবে অর্থাৎ ডাইন কাঁধ খোলা রাখিয়া বাম কাঁধ আবৃত করিয়া উক্ত চাদর পরিতে হইবে। ইহার ফলে চাদরের দুই কোণই বাম দিকে থাকিবে।

তওয়াফের ব্যাপারে যদি সন্দেহের উদ্রেক হয়

তওয়াফের ব্যাপারে যদি সন্দেহের উদ্রেক হয় যেমন তিন না চারি চক্র পূর্ণ হইয়াছে তৎসম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিলে এই অবস্থায় কম চক্র অর্থাৎ তিন 'চক্র'কে নিশ্চিত ধরিয়া অবশিষ্ট চারি চক্র পূর্ণ করিবে। 'সাঈ'-এর ব্যাপারেও 'সন্দেহ' জাগিলে তাহাই করিতে হইবে। এই তওয়াফ হইতে ফারেগ হওয়ার পর আগের ন্যায় চাদর ঠিকমত পরিধান করিবে অর্থাৎ দুই কাঁধই ঢাকিবে এবং উহার ফলে চাদরের দুই কোণ বুকের উপর আসিবে। এই কাজ তওয়াফের পরবর্তী দুই রাকাত নামায পড়ার পূর্বেই করিয়া লইবে।

মেয়েদের যথারীতি পর্দা করা এবং নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ হইতে বিরত থাকা

বর্তমান যুগে যে বস্তু হইতে নারীদের অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন তাহা হইতেছে নিজ দেহের সৌন্দর্য প্রকাশের আগ্রহ এবং খোশবু লাগাইয়া পর্দার সহিত তওয়াফ করার প্রবণতা! যে কোন অবস্থায় এবং

ويجب عليهن التستر وترك الزينة حال الطواف.

তওয়াফের অবস্থায় পর্দা করা এবং সৌন্দর্য প্রকাশ পরিহার করা নারীদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। কারণ তাহারা হইতেছে 'আওরাত'[1] এবং পুরুষের জন্য ফিৎনার কারণ। এই ফিৎতনার প্রকাশ না ঘটিলেই উহা জাতির জন্য মঙ্গলের কারণ হইবে। মহিলাদের মুখমন্ডল তাহাদের

---

[1] আরবীতে 'আওরাত' বলিতে ঢাকিয়া রাখার বস্তুকে বুঝায়-যাহা প্রকাশে লজ্জা অনুভূত হয়। মহিলাদের আপাদমস্তকই ঢাকিয়া রাখার বস্তু। অতএব হস্ত, মুখমন্ডল, গলা ও কান এবং কান ও গলা'র অলংকার সমস্তই পর্দায় রাখা প্রয়োজন।

সৌন্দর্যের প্রতীক। তাই তাহাদের মাহ্রাম ব্যতীত অন্যের সম্মুখে উহার প্রকাশ বৈধ নহে। এই বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ হইতেছেঃ

﴿وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ﴾.

"মুসলিম নারীগণ তাহাদের সৌন্দর্য তাহাদের স্বামীগণ ছাড়া অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না।" (সূরাঃ নূর)

অতএব মহিলাদের পক্ষে হাজ্রে আসওয়াদ চুম্বনের সময় মুখ খোলা রাখা চলিবে না। মুখখোলা রাখিলে তাহাদিগকে কোন পরপুরুষ দেখিতে পাইবে, মহিলাদের জন্য হাজ্রে আসওয়াদ চুম্বন করা বা স্পর্শ করা যখন সহজসাধ্য নয়, তখন পুরুষের ভীড়ে প্রবেশ করা তাহাদের পক্ষে মোটেই সঙ্গত হইবে না। বরং তাহারা পুরুষের পিছনে তওয়াফ করিবে। অধিক পুরুষের ভীড়ে ঢুকিয়া তওয়াফ করা অপেক্ষা ইহাতেই তাহাদের মঙ্গল নিহিত।

ولايشرع الرمل والاضطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء.

হজ্জ বা উমরার জন্য মক্কায় পৌঁছাইয়া প্রথম বারের মত তওয়াফ ছাড়া ইযতিবা ও রমল সহকারে তওয়াফ করা শরীয়তসিদ্ধ নহে, সাফা ও মারওয়ার 'সাঈ' কালেও রামল বা ইযতিবা নাই, নারীদের জন্যও কোন তওয়াফ ও সাঈতে উহার একটিও নাই। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কায় যখন শুভাগমন করেন, তখন প্রথম তওয়াফ ছাড়া অন্যান্য তওয়াফে রামল বা ইযতিবা করেন নাই।

যাবতীয় প্রকারের নোংরা ও নাপাকি হইতে মুক্ত হইয়া ওযূ অবস্থায় তওয়াফ করা উচিত।

ويكون خاضعًا لربه متواضعًا له ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء وإن قرأ فيه شيئًا من القرآن فحسن.

ইহার সাথে আপন প্রভুর অবনত এবং নিজেকে গর্বশূন্য অন্তরে নতমুখে তওয়াফ করিতে হইবে। এই অবস্থায় অধিক মাত্রায় আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা এবং দোআ পড়া উচিত।

তওয়াফ অবস্থায় মনে মনে কুরআন পাঠও একটি উত্তম কাজ হইবে।

তওয়াফ ও সাঈ-এর সময়ে নির্দিষ্ট কোন দোআ বা যিকরের কোন কালেমা নাই।

ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الاطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له.

তবে কিছু সংখ্যক লোক তওয়াফ কালে বা সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে চলাকালে পাঠ করিবার জন্য কতকগুলি যিক্‌র ও দোআ নিজ হইতে আবিষ্কার করিয়া লইয়াছে। এই সবই মুহদাসাত বা শরীয়তের মধ্যে নূতন ভাবে প্রবর্তিত অভিনব রীতি-যাহার কোন ভিত্তি নাই।

বরং যে কোন যিক্‌র ও দোআ যাহা তাহার পক্ষে সহজ হয়-পড়াই যথেষ্ট। অতঃপর যখন রুকনে ইয়ামানী বরাবর পৌঁছিবে, তখন উহাকে স্বীয় দক্ষিণ হাত দ্বারা স্পর্শ করিবে আর বলিবেঃ

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ.

"বিসমিল্লাহে ওয়াল্লাহু আকবর এবং উহা চুম্বন করিবে না। আর যদি উহা স্পর্শ করা ভীড়ের কারণে কঠিন হয়, তবে উহা স্পর্শ করা পরিত্যাগ করিয়া তওয়াফে চলিতে থাকিবে এবং উহার প্রতি হাত ইশারা করিবে না ; আর উহার বরাবর স্থানে 'আল্লাহু আকবার' বলিবে না।

"لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم".

কেননা আমাদের জানা মতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ঐরূপ করার প্রমাণ নাই। রুক্‌নে ইয়ামানী এবং হাজ্‌রে আসওয়াদের মধ্যভাগে চলাকালে নিম্নের দোআটি পড়িবেঃ

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

উচ্চারণঃ রাব্বানা-আ-তিনা ফিদ্‌দুনয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল্ আখিরাতে হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা আযা-বান্নার।"

"হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক! তুমি আমাদিগকে দুনিয়া এবং আখিরাতের মঙ্গল দান কর। আর আমাদেরকে দোযখের আযাব হইতে রক্ষা কর।

তওয়াফ কালে যখনই হাজরে আসওয়াদ বরাবর পৌঁছিবে, তখনই উহা স্পর্শ করিবে ও চুম্বন দিবে, এবং আল্লাহু আকবার বলিবে, যদি স্পর্শ ও চুম্বন সহজ সাধ্য না হয় তবে যখনই উহার বরাবর পৌঁছিবে তখনই হাতে ইশারা করিয়া আল্লাহু আকবার বলিবে।

তওয়াফকালীন অত্যধিক ভীড় ঠেলাঠেলি হইতে দেখিলে যম্‌যম্ এবং মাকামে ইব্‌রাহীম-এর পিছন দিয়াও তওয়াফ করা যাইতে পারে- ইহাতে কোন দোষ নাই। কারণ মসজিদে হারামের সমস্ত স্থানই তাওয়াফের উপযোগী। অতএব যদি কেহ মসজিদের রোয়াকে খুটিসমূহের মাঝের ফাঁকা জায়গা দিয়ে তওয়াফ করে তবুও তওয়াফ বৈধ হইবে। তবে কা'বার নিকটবর্তী তওয়াফই উত্তম যদি উহা সহজসাধ্য হয়।

তওয়াফ করা শেষ হইলে মাকামে ইব্‌রাহীমের পিছনে দুই রাকাত নফল নামায পড়িবে-যদি সম্ভব হয়। আর যদি ভীড়ের কারণে উহা সম্ভব

না হয় তবে মসজিদের যে কোন স্থানে পড়িলেই চলিবে। উক্ত দুই রাকাত নামাযের প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকাতে ফাতিহার পর সূরা ইখলাস পড়া সুন্নত। তারপর হাজরে আসওয়াদের নিকট আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুকরণে সম্ভব হইলে উহাকে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিবে। অতঃপর বাবে সাফা হইয়া সাফা পর্বতের দিকে রওয়ানা হইবে উহাতে আরোহণ করিয়া এই আয়াত পাঠ করিবেঃ

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا...﴾.

"নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্র নির্দশনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং, যাহারা কা'বা ঘরে হজ্জ বা উমরাহ পালন করিবে, তাহাদের পক্ষে এই দুইটিতে প্রদক্ষিণ করাতে কোন দোষ নেই।" আরোহণ করিতে সমর্থ না হইলে নীচে দাঁড়াইয়া কেবলামূখী হইয়া আলহামদু লিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার' বলিয়া এই দোআ পড়িবে। (আল-বাকারাঃ ১৫৮)

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকালাহু লাহুলমূলকু ওয়া লাহুল হাম্দু ইউহয়ী ওয়া ইয়ূমীতু ওয়া হূয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর; লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু আনজাযা ওয়াহদাহু ওয়া নাসারা আবদাহূ হাযামাল আহ্যাবা ওয়াহদাহু।

অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত কেহ মা'বূদ নাই এবং আল্লাহ্ মহান আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই, তিনি একক তাঁহার কোন অংশীদার নাই- আসমান যমীনে সার্বভৌম আধিপত্য একমাত্র তাঁহারই যিনি মহান স্রষ্টা! সমস্ত প্রশংসা তাঁহারই প্রাপ্য, তিনিই জীবিত করেন, তিনি মৃত্যু প্রদান করেন। সর্বস্থানে তাঁহারই অপ্রতিহত ক্ষমতা-তিনিই কেবল উপাসনার যোগ্য, তিনি ছাড়া কেহ নাই, যত প্রতিজ্ঞা-তিনি পূর্ণ করিয়াছেন, স্বীয় বান্দাকে তিনি মদদ করিয়াছেন এবং একাই শত্রুদলকে ধ্বংস করিয়াছেন।

তারপর হাত উঠাইয়া জানা কোন দোআ পাঠ করিবে এবং উপরের দোআটি তিনবার পড়িবে। অতঃপর সাফা পর্বত হইতে অবতরণ করতঃ মারওয়া পর্বতের দিকে চলিবে এবং প্রথম সবুজ চিহ্ন হইতে দ্বিতীয় চিহ্ন পৌছানো পর্যন্ত মধ্যখানে জোরে জোরে চলিবে,

وأما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة.

"মেয়েদের জন্য জোরে জোরে চলা কোনো অবস্থাতেই বৈধ নহে। কারণ মেয়েরা পর্দা-পুশিদার বস্তু। সুতরাং সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থান তাহারা অতি সাধারণভাবে অতিক্রম করিবে। তারপর সাফা হইতে যখন মারওয়াহ্ পৌছিবে তখন উহাতে আরোহণ করিয়া উহার উপরে দাঁড়াইবে। যদি সহজ হয় এবং ভীড় না থাকে তবে উপরে উঠাই উত্তম। সাফায় যেভাবে হাত উঠাইয়া দোআ করিতে বলা হইয়াছে মারওয়াতেও তদ্রূপ নিয়মে দোআ করিবে। পুনরায় মারওয়াহ্ হইতে অবতরণ করিয়া সাফার দিকে আসিবে এবং ঐ সময় যেখানে হাঁটিয়া চলার নিয়ম সেখানে হাঁটিয়া চলিবে এবং যেখানে দৌড়িয়া চলার নিয়ম সেখানে দৌড়িয়া চলিবে। এইভাবে সাতবার সাফা পর্বত পর্যন্ত সাঈ করিবে। যাওয়া এক সাঈ এবং ফিরিয়া আসা আর এক সাঈ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এইরূপই করিয়াছেন এবং বলিয়াছেনঃ

"خذو عنّي مَناسِكَكُمْ"

তোমরা আমার নিকট হইতে হজ্জের আহকাম শিখিয়া লও।

সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে চলাচল ও দৌড়ানোর সময় জানা মতে যিকির ও দোআ পড়িতে থাকিবে এবং নাপাকি হইতে পাকসাফ ও ওযূ অবস্থায় থাকিবে। সাথে সাথে অন্তরকেও পাপমুক্ত করিবে। যদি সাফা-মারওয়ার মধ্যাবর্তী স্থানে চলাকালীন অনিবার্য কারণবশতঃ ওযূ নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে বিনা ওযূতেও সাঈ করায় কোন ক্ষতি বা দোষ হইবে না।

আল্লাহ্‌র ঘর তওয়াফ করিবার পর মেয়েরা যদি ঋতুবতী হইয়া পড়ে তবুও সাফা-মারওয়ার মধ্যকার সাঈর কাজ সম্পন্ন করিবে। কারণ আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফকালীন পবিত্রতার যে শর্ত-এই স্থানে তাহা জরুরী নহে। আগেই বলা হইয়াছে পাক-পবিত্র থাকা উত্তম কিন্তু অপরিহার্য শর্ত নহে। সাঈ পূর্ণ হইবার পর মাথার চুল মুড়াইবে অথবা ছোট করিয়া কাটিবে। পুরুষদের জন্য চুল মুড়ানই উত্তম। উমরার সময়ে চুল ছোট করিয়া কাটিয়া হজ্জের সময় চাঁছিয়া ফেলাই উত্তম। বিশেষ করিয়া যদি হজ্জের অল্প-সময় পূর্বে মক্কায় আসা হয় তখন ক্ষুর ব্যবহার না করাই উচিত; ইহাতে হজ্জের মধ্যে দশ তারিখে মাথার অবশিষ্ট চুল মুড়ানো সুবিধা হয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবাবর্গ সমভিব্যাহারে যখন ৪ঠা যিলহজ্জ মক্কায় আসেন, তখন সাহাবাগণের তামাত্তো হজ্জ ছিল। যাহারা কুরবানীর জানোয়ার সঙ্গে আনেন নাই তাহাদিগকে তিনি উমরার পর মাথার চুল ছোট করিবার নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং মাথা মুন্ডন করিবার জন্য কাহাকেও নির্দেশ প্রদান করেন নাই।

মাথার চুল ছোট করার সময় সম্পূর্ণ মাথার চুল ছোট করা জরুরী। মাথার চুলের কিছু অংশ খাট করা যথেষ্ট হইবে না, যেমন মাথা মুন্ডন

কালে উহার কিছু অংশ মুন্ডন করিলে যথেষ্ট হইবে না। মেয়েদের চুল ছোট করা ব্যতীত মুন্ডন আদৌ বৈধ নহে। তাহারা তাহাদের কেবল চুলের অগ্রভাগ হইতে মাত্র এক আঙ্গুল পরিমাণ কাটিয়া ফেলিবে। উহার বেশী তাহারা কাটিবে না।

অতএব মুহরিম যখন উল্লেখিত কাজগুলি সমাধা করিল, তখন তাহার উমরাহ পূর্ণ হইল এবং ইহরামের কারণে তাহার উপর যে সমস্ত কাজ হারাম ছিল এখন উহা হালাল হইয়া গেল। হ্যাঁ, তবে যদি সে ইহরাম বাঁধার পর মক্কার হারাম এলাকায় প্রবেশ করার পূর্বে কুরবানীর জানোয়ার সঙ্গে লইয়া মক্কায় আসে হজ্জ কেরানের নিয়তে তবে ঐ হাজী তাহার ইহরামের অবস্থায় থাকিয়া যাইবেন-১০ই যিলহজ্জ তারিখে হজ্জ ও উমরাহ উভয়টি সম্পাদনের পর হালাল হইবে।

আর যে ব্যক্তি কেবল মুফরাদ হজ্জের ইহরাম করিয়াছে কিংবা হজ্জ ও উমরাহ্ একত্রে কেরান হজ্জের নিয়ত করিয়া ইহরাম বাঁধিয়াছে, তাহার জন্য সুন্নত তরীকা হইলঃ সে উমরাহ করিয়া ইহরাম খুলিয়া দিবে এবং তামাত্তো হজ্জওয়ালারা যাহা করে, সেও ঠিক সেইরূপ করিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের সাথে কুরবানীর জানোয়ার লইয়া আসিয়াছে, সে ইহরাম অবস্থায়ই থাকিবে।

لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال "لـــولا أني سقت الهدي لأحللت معكم".

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তদীয় সাহাবাগণকে ঐ মুতাবিক নির্দেশ দিয়াছিলেন, এবং ঐ সময় বলিয়াছিলেনঃ "আমি যদি কুরবানীর জানোয়ার সাথে না আনিতাম তবে তোমাদের সহিত আমি ইহরাম খতম করিয়া হালাল হইয়া যাইতাম।

وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامـــها بـــالعمرة لم تطـــف بالبيت.

আর মেয়েরা যদি উমরার ইহরামের পর ঋতুবতী হইয়া যায় অথবা সন্তান প্রসব করে তাহা হইলে আল্লাহ্‌র ঘর তওয়াফ করিবে না এবং সাফা-মারওয়াহ্ সাঈও করিবে না যে পর্যন্ত ঋতু বা সন্তান প্রসবের পর রক্তক্ষরণ বন্ধ না হয়। যখন পবিত্রতা হাসিল হইবে তখন তওয়াফ করিবে ও সাঈ করিবে এবং মাথার চুল ছোট করিবে। এইভাবে তাহার উমরাহ্ পূর্ণ হইবে আর যদি ৮ই যিলহজ্জ পর্যন্তও ঋতু হইতে বা প্রসবের পর রক্তক্ষরণ হইতে পাক না হয়, তবে যেখানে সে অবস্থিত ছিল ঐ স্থানেই হজ্জের ইহরাম বাঁধিবে এবং অন্যান্য হাজীদের সাথে মীনায় চলিয়া যাইবে। ঐ নিয়মে এই পর্যায়ে মেয়েরা হজ্জ ও উমরার মধ্যে যোজনাকারী কেরান হজ্জকারিনী হইল হাজীগণ যাহা যাহা করিবে ঐ রমণীও অনুরূপ হজ্জের নিয়মাবলী পালন করিবে। আরাফায় অবস্থান, মুযদালিফা ও মীনায় রাত্রি যাপন, কুরবানী করণ, মাথার চুল ছোট করণ সমস্তই করিবে। তারপর যখন পবিত্র হইবে, তখন আল্লাহ্‌র ঘর তওয়াফ, সাফা-মারওয়াহ-এর সাঈ কাজ একই দফায় সম্পাদন করিবে। অর্থাৎ পূর্ব করা উমরাহ ও পরের হজ্জ উভয় ইবাদতের জন্য একবার তওয়াফ ও একবার সাঈ যথেষ্ট হইবে। এই তওয়াফ ও সাঈ হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর হাদীস মুতাবিক পালন করা হইবে। তিনি উমরার ইহরাম করার পর ঋতুবতী হইয়া পড়েন, ফলে তাঁহাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

"افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري".

হাজী হজ্জের জন্য যে নিয়ম পালন করিয়া থাকে তুমিও তাহাই কর, কেবল আল্লাহ্‌র ঘর তওয়াফ করিবে না পাক না হওয়া পর্যন্ত। (বুখারী ও মুসলিম)

এই অবস্থায় মেয়েদের দশ তারিখে কাঁকর মারা, কুরবানী করা ও চুল ছোট করার পর ইহরামকালীন নিষিদ্ধ বস্তুগুলি ব্যবহার করা বৈধ হইবে, যেমন সুগন্ধি বা ঐ ধরনের নিষিদ্ধ বস্তুগুলি স্বামীর সহিত সহবাস ব্যতীত যতক্ষণ অন্যান্য পাক মেয়েদের ন্যায় তাহার হজ্জের রুক্ন পূর্ণ

না করিবে অর্থাৎ তরয়াফে এফাযা না করিবে। অতএব যখন ঋতু হইতে পবিত্র হওয়ার পর আল্লাহ্‌র ঘর তওয়াফ, সাফা-মারওয়াহ্-এর সাঈ করিবে তখন তাহার জন্য স্বামী ও তাহার সহিত মিলন হালাল হইবে, অর্থাৎ ঋতু হইতে পবিত্র হওয়াই যথেষ্ট নহে যতক্ষণ পর্যন্ত তওয়াফে এফাযা ও সাঈ করিয়া হজ্জের রুক্‌ন পূর্ণ না হইবে তখন পর্যন্ত তাহার স্বামী তাহার জন্য হালাল হইবে না।

পরিচ্ছেদ-فصل

الأعمال في منى وعرفات

মীনা ও আরাফায় করণীয়

যখন ৮ই যিলহজ্জ তালবিয়ার দিবস সমাগত হইবে তখন মক্কায় অবস্থানকারী হজ্জযাত্রীগণ এবং মক্কাবাসীদের মধ্যে যাহারা হজ্জ করিতে ইচ্ছা করিবেন তাহারা নিজ নিজ অবস্থান স্থল হইতে পূর্বে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়া মীনার পথে রওয়ানা হইবেন। তবে ঐ ইহরাম অবস্থায় কা'বা ঘরের তওয়াফ করিতে হইবে না।

কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবীগণ (রাযিআল্লাহু আনহুম) বিদায় হজ্জের সময় আবতাহ্ নামক স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশ মত ৮ই যিলহজ্জ ঐ স্থান হইতেই ইহরাম বাঁধিয়াছিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবাদিগকে আল্লাহ্র ঘরের নিকট আসিয়া সেই স্থানে অথবা মীযাব নামক স্থান হইতে ইহরাম বাঁধিবার নির্দেশ দান করেন নাই। অনুরূপভাবে মীনা যাওয়ার প্রাক্কালে বিদায় তওয়াফও করিতে নির্দেশ দেন নাই। যদি ঐ সমস্ত কার্য শরীয়তসম্মত হইত তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি সাহাবাদেরকে উহা শিক্ষা দিতেন। সকল প্রকার পূণ্য ও বরকতপূণ্য কাজ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁহার সাহাবাগণ (রাযিআল্লাহু আনহুম) অনুসরণের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে।

হজ্জের ইহরামের পূর্বে উমরার নিমিত্ত ইহরাম বাঁধিবার জন্য পূর্ব বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইবার উদ্দেশ্যে গোসল করা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। হজ্জের ইহরামে لبيك حجة লাব্বায়কা হাজ্জাতান বলিতে হইবে। ঐ সময় সেলাই বিহীন কাপড় পরিধান করিবে।

হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর অন্য কোথায়ও না গিয়া মীনার দিকে রওয়ানা হইয়া যাওয়াই সুন্নত তরীকা, সূর্য ঢলার পূর্বে হউক অথবা পরেই হউক ৮ই যিলহজ্জ তারিখে মীনায় পৌছাইতে চেষ্টা করিবে। এই সময় হইতে ১০ই তারিখে জামরাতুল আকাবায় কাঁকর মারা পর্যন্ত খুব বেশী করিয়া তালবিয়া পড়িতে থাকিবে। মীনায় ৮তারিখে যুহর, আসর, মাগরিব, এশা এবং ৯ তারিখের ফজর নামায পড়িবে।

السنة ان يصلى كل صلاة في وقتها قصراً بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران.

মীনার প্রত্যেক নামায সুন্নত মুতাবিক পড়ার নিয়ম এই যে, সমস্ত নামায উহার নির্দিষ্ট সময়ে কসর পড়িবে, জমা করিবে না, মাগরিব ও ফজর ব্যতীত-এই দুই নামাযের কসর নাই।

ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ... لم يأمر أهل مكة بالإتمام.

এই ব্যাপারে মক্কায় অবস্থানকারী এবং বহিরাগতদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসী এবং অন্যান্য স্থানের লোকদের লইয়া মীনা, আরাফা ও মুযদালিফায় কসর নামায পড়াইয়াছিলেন, এবং মক্কাবাসীদেরকে পুরা নামায পড়িতে নির্দেশ দেন নাই।

ولو كان واجباً عليهم لبينه لهم.

যদি মক্কাবাসীদের পুরা নামায পড়া ওয়াজিব হইত, তবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাদিগকে উহা অবশ্যই বর্ণনা করিয়া দিতেন।

৯ই তারিখে সূর্যোদয়ের পর হাজীগণ মীনা হইতে আরাফার দিকে রওয়ানা হইবেন এবং সূর্য ঢলা পর্যন্ত নামেরা নামক ময়দানে অবস্থান

সুন্নত যদি উহা সহজসাধ্য হয়। যদি ইহা সহজ হয় করিবে যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐরূপ করিয়াছিলেন, তারপর যখন সূর্য ঢলিয়া যাইবে তখন ইমাম সাহেব স্বয়ং অথবা তাহার প্রতিনিধি জনগণকে সময়োপযোগী খুৎবা প্রদান করিবেন। আর হাজীদের জন্য ঐ দিবসে এবং পরের দিবসে শরীয়ত সম্মত করণীয় কাজগুলি বর্ণনা করিবেন।

ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال.

আর তাহাদিগকে ঐ খুৎবার মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয় করিয়া চলা এবং তাওহীদ সম্পর্কীয় মাসআলাগুলি বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়া দিবেন। আর প্রত্যেক আমলের মধ্যে খুলুসিয়াত-নিষ্ঠার সহিত আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করিবেন এবং আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ কাজ হইতে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিবেনঃ

ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والحكم بهما والتحاكم إليهما في الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله.

ঐ খুৎবায় জনগণকে আল্লাহ্‌র কিতাব ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে দৃঢ়তার সহিত অবলম্বন করিয়া চলার অসিয়ত করিবে, এবং নিজেদের যাবতীয় কাজকর্ম কুরআন-হাদীস মুতাবিক সম্পন্ন করার এবং নিজেদের সমুদয় কাজে আল্লাহ্‌র কিতাব এবং তাঁহার সুন্নাতকে চূড়ান্ত মীমাংসাকারীরূপে গ্রহণ করার তাকীদ প্রদান করিবে-যেন সমুদয় কাজে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পূর্ণ অনুসরণ করা সম্ভব হয়।

وبعدها يصلون الظهر والعصر قصراً وجمعاً في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث جابر.

ইহার পর যোহর ও আসরের নামায আউয়াল ওয়াক্তে এক আযান ও দুই একামত দ্বারা কসরসহ একত্রে পড়িবে। অর্থাৎ যোহরের ও আসরের নামায একই আযানে পড়িবে তবে প্রত্যেক নামাযের জন্য পৃথক ইকামত দিবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই রূপই করিয়াছিলেনঃ যাহা সহীহ মুসলিম শরীফে সাহাবী জাবের (রাযিআল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে।

তারপর হাজীগণ আরাফায় অবস্থান করিবে, আরাফার প্রান্তর সমস্তই অবস্থানস্থল ওরানার অংশ ছাড়া-ওরানাহ আরাফার সংলগ্ন একটি নির্দিষ্ট স্থানের নাম। যদি সহজ হয় তবে জাবালে রাহমাত নামক পবর্তকে সম্মুখে রাখিয়া কেবলামুখী হইয়া বসিবে, আর যদি জাবালে রাহমাত না জানার কারণে অথবা উহাকে সামনে রাখার মত উপযুক্ত স্থান না পাওয়া যায় তবে যেখানেই হউক কেবলামুখী হইয়া বসিবে। হাজীদের জন্য এই স্থানে আল্লাহ্ পাকের যিকির তাহার নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন, কান্না-কাটি করার আপ্রাণ চেষ্টা করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। দোআর সময় হাত উঠাইবে। নিজের জন্য এবং পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদির জন্য অন্তরের অন্তরস্থল হইতে হাত তুলিয়া দোআ করিবে। এই সময় যদি 'লাব্বায়কা' উচ্চারণ এবং কুরআন হইতে কিছু তেলাওয়াত করিতে থাকে তবে তাহা হইবে উত্তম। অতঃপর নিম্নের দোআগুলি খুব বেশী করিয়া পড়া সুন্নত।

لَا إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইয়ূহ্য়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি একক। তাঁহার কোন শরীক নাই। সমস্ত রাজত্ব একমাত্র তাঁহারই অধিকারভুক্ত। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁহারই প্রাপ্য। তিনিই জীবিত করেন, তিনি মৃত্যু প্রদান করেন। আর তিনি সববস্তুর উপর সর্বশক্তিমান।

কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেনঃ

"خير الدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ".

শ্রেষ্ঠ দোআ হইতেছে আরাফার দিবসের দোআ আমি এবং নবীগণ কর্তৃক উচ্চারিত শ্রেষ্ঠতম কথা হইতেছেঃ

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহূ লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইয়ুহ্‌য়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সহীহ সনদে আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌র নিকট চারটি কালাম সর্বাধিক প্রিয় আর উহা হইতেছে সুবহানাল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার। অতএব এই ধনের যিক্‌র ও দোআ বড় নম্রতার সহিত এবং মনোযোগ সহকারে পাঠ করা চাই। ইহা ছাড়া ঐ সমস্ত দোআ যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত হইয়াছে। এই মহান মর্যাদাপূর্ণ স্থান ও দিনে ঐ দোআ পড়া চাই যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়িয়াছেন এবং অর্থের দিক দিয়া অধিক ব্যাপক।

এই দোআগুলি হৃদয়ে ভয়ভীতি এবং নরম দেলে খুব বেশী করিয়া পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে থাকিবে। এইভাবে কুরআন এবং হাদীসে অন্যান্য যেসব যিক্‌র-আযকার এবং দোআসমূহ অন্য সময়ে পড়ার তাকীদ রহিয়াছে সেগুলিও খুব বেশী করিয়া পাঠ করিবে। বিশেষ করিয়া এই পবিত্র জায়গায় এই মহান দিবসে ব্যাপক অর্থবোধক যিক্‌র এবং দোআসমূহ নির্বাচন করিবে যেগুলির মধ্যে খাস করিয়া নিম্নলিখিত দোআসমূহ পাঠ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ."

উচ্চারণঃ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম।

পাক-পবিত্র আল্লাহ, তাঁহারই প্রশান্তি বর্ণনা করিতেছি, যিনি সর্বদোষমুক্ত মহান ও মহীয়ান।

"لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ."

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাআনতা সুব্‌হানাকা ইন্নী কুন্‌তু মিনায যালিমীন।

তুমি ছাড়া কোন যোগ্য ইলাহ নাই। তুমি পাক-পবিত্র। বস্তুতঃ আমিই ছিলাম অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত।

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া লা-না'বুদু ইল্লা এইয়্যাহু লাহুন নে'মাতু ওয়া লাহুল ফায্‌লু ওয়া লাহুস্‌সানাউল হাসানু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিসীনা লাহুদ্‌দীনা ওয়া লাও কারিহাল কাফিরূন।

আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নাই, আমরা তাঁহাকে ছাড়া অপর কাহারও ইবাদত করি না, যত নিয়ামত ও অনুগ্রহরাশি রহিয়াছে সমস্তই

তাঁহারই প্রদত্ত আর তাঁহারই জন্য উত্তম প্রশংসা, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, একমাত্র তাঁহারই দ্বীনকে সম্পূর্ণ খালেস ও নির্ভেজাল করি, যদিও ইহা কাফিরদের নিকট অপছন্দনীয়।

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.

উচ্চারণঃ লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহি।

কাহারও শক্তি নাই দুঃখ-কষ্ট ফিরাইবার আর কাহারও ক্ষমতা নাই সুখ-শান্তি প্রদানের-একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া।

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

উচ্চারণঃ রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা আযাবান্নার।

হে প্রভু পরওয়ারদিগার! আমাদিগকে প্রদান কর এই পার্থিব জগতে, আর পারলৌকিক জীবনে কল্যাণ এবং রক্ষা কর আমাদিগকে জাহান্নামের আযাব হইতে।

اللّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِيْنِي الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِيْ وَأَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِي فِيْهَا مَعَاشِيْ وَأَصْلِحْ لِيْ آخِرَتِي الَّتِي فِيْهَا مَعَادِيْ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِيْ كُلِّ خَيْرٍ وَالْمَوْتَ رَاحَةً لِيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আসলিহ্ লী-দ্বীনী আল্লাযী হুয়া ইসমাতু আমরী ওয়া আসলিহ্ লী দুনয়া-য়া আল্লাতী ফীহা মাআশী ওয়া আস্‌লিহ্ লী আখিরাতি আল্লাতী ফীহা-মাআদী ওয়াজ্‌আলিল হায়া-তা যিয়াদাতাল্লী ফী কুল্লি খাইরিন ওয়াল মাওতা রা-হাতাল্‌লী মিনকুল্লি শাররিন।

হে আল্লাহ্! আমার দ্বীনকে আমার জন্য পরিশুদ্ধ করিয়া দাও-যাহার ভিতর নিহিত রহিয়াছে আমার সমুদয় কাজে আত্মরক্ষার নিশ্চিত উপায়। আর সংশোধন করিয়া দাও আমার পার্থিব জীবনকে যাহার ভিতর

রহিয়াছে আমার জীবিকা, আর আমার আখিরাতকে তুমি করিয়া দাও বিশুদ্ধ যেখানে আমাকে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। আর আমার আয়ূকে প্রত্যেক ভাল কাজে বর্ধিত করার উপকরণ কর এবং মৃত্যুকে যাবতীয় অমঙ্গল হইতে অব্যাহতি পাওয়ার কারণ বানাইয়া নাও।

أَعُوْذُ بِااللهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَــــةِ الأَعْدَاءِ.

উচ্চারণঃ আ'উযু বিল্লা-হি মিন জাহদিল বালায়ি ওয়া দারকিশ্ শিক্বায়ি ওয়া সুয়িল ক্বাযা-য়ি ওয়া শামা-তাতিল আ'দায়ি।

আমি আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাহিতেছি বালা-মুসীবতের ভয়াবহতা ও দূর্ভাগ্যের চরম অবস্থা হইতে, আর খারাপ অদৃষ্ট এবং দুশমনের হাসি-মস্কারা হইতে।

اللهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَمِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَمِـــنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَمِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ وَمِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল হাম্‌মি ওয়াল হুয্‌নী ওয়া মিনাল আজ্‌যি ওয়াল্ কাসালি ওয়া মিনাল জুব্‌নি ওয়াল বুখ্‌লি ওয়া মিনাল মা'সামি ওয়াল মাগরামি ওয়া মিন গালাবাতিদ্ দাইনি ওয়া ক্বাহরির রিজালি।

হে আল্লাহ্! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি চিন্তা ও উদ্বেগ হইতে, অক্ষমতা ও অলসতা হইতে, ভীরুতা ও কৃপণতা হইতে আর আশ্রয় চাহিতেছি পাপাচার ও কর্জ গ্রহণ হইতে এবং ঋণের গুরুভার ও জনবৃন্দের দুর্দম অপপ্রভাব হইতে।

أَعُوْذُ بِكَ اللّٰهُمَّ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّءِ الأَسْقَامِ.

উচ্চারণঃ আ'উযুবিকা আল্লাহুম্মা মিনাল বারাসি ওয়াল জুনুনি ওয়াল জুযামি ওয়া মিন সাইয়েয়িল আসক্বামি।

হে আল্লাহ্! আমি তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি ধবল রোগ, কুষ্ঠ রোগ এবং বদ্ধ পাগল হওয়ার দুর্ভাগ্য হইতে এবং দুরারোগ্য জটিল ব্যাধি হইতে।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ফিদ্‌দুনয়া ওয়াল আখিরাতি।

হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট অপরাধ মার্জনা এবং দুনিয়া ও আখিরাতে বিপদ-আপদ হইতে নিরাপত্তা চাহিতেছি।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِي.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ফী দ্বীনি ওয়াদ্ দুনইয়ায়া ওয়া আহ্‌লী ওয়া মালী।

হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই মার্জনার, আর কামনা করি আমার দ্বীন ও দুনিয়ার, আমার পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদের নিরাপত্তা।

اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ وَاحْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنَ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِيْ وَأَعُوْذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাস্‌তুর আওরাতী ওয়া আ-মিন রাওআতী ওয়াহ্‌ফায্‌নী মিমবাইনা ইয়াদাই-ইয়া ওয়ামিন খালফী ওয়াআন ইয়ামীনী ওয়াআন শিমালী ওয়ামিন ফাওক্বী ওয়া 'আউযু বিআযমাতিকা আন উগতালা মিন তাহ্‌তী।

হে আল্লাহ্! আমার গোপন দোষসমূহ তুমি ঢাকিয়া রাখিও, আমাকে ভয়-ভীতি হইতে সংরক্ষণ করিও, আমার সম্মুখে এবং পশ্চাতে দৃশ্য এবং অদৃশ্যভাবে আমকে তুমি নিরাপদ, রাখিও, আর নিরাপদ রাখিও আমার ডানে-বামে এবং আমার উর্ধ্বদেশ হইতে আর তোমার আশ্রয় চাহি আমার নিম্নদেশে মাটি ধ্বসিয়া মৃত্যুবরণ হইতে।

اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ خَطِئَتِيْ وَجَهْلِيْ وَإِسْرَافِيْ فِيْ أَمْرِيْ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলী খাত্বিয়াতী ওয়া জাহ্লী ওয়া ইসরাফী ফী আমরী ওয়া মাআনতা আ'লামু বিহী মিন্নী।

হে আল্লাহ্! তুমি মাফ করিয়া দাও গুনাহ, ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং অজ্ঞতা, আমার কাজ-কর্মে আমার সীমালংঘন এবং আমার তরফ হইতে সংঘটিত সেই সব অপরাধ যাহা তুমি আমা অপেক্ষা অধিক অবহিত রহিয়াছ।

اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ جِدِّيْ وَهَزْلِي وَخَطَئِي وَعَمَدِيْ وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগফির্লী জিদ্দী ওয়া হাযলী ওয়া খাত্বায়ী ওয়া আমাদী ওয়া কুল্লা যালিকা ইন্দী।

হে আল্লাহ্! মাফ করিয়া দাও তুমি আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত প্রকৃত অপরাধ, আমার হাসি-তামাশাকৃত পাপ, আমার ছোট-খাট ত্রুটি-বিচ্যুতি, আমার সংকল্পিত কিন্তু অকৃত অনাচার এবং আমার তরফ হইতে কৃত সমস্ত পাপাচার।

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي. أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ

أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগ ফিরলী মাক্বাদ্দামতু ওয়ামা আখ্খারতু ওয়ামা আস্রারতু ওয়ামা-আ'লানতু ওয়ামা আন্তা আ'লামুবিহি মিন্নী আন্তাল মুক্বাদ্দিমু ওয়া আন্তাল মুআখ্খিরু ওয়া আন্তা আ'লা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর।

হে আল্লাহ্! আমাকে তুমি মাফ করিয়া দাও যে অন্যায় আমি পূর্বে করিয়াছি, যাহা আমি পরে করিয়াছি, যে অপরাধ আমি গোপনে করিয়াছি, যাহা আমি প্রকাশ্যে করিয়াছি, আর যে গুনাহ্ সম্পর্কে তুমি আমা অপেক্ষা বেশী জান। তুমিই তো যাহাকে ইচ্ছা আগাইয়া আন আর যাহাকে চাহ পিছনে হটাইয়া দাও এবং তুমিই সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ الثَّبَاتَ فِيْ الأَمْرِ وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَأَسْئَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ. وَأَسْئَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ إِنَّكَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাস্সাবাতা ফিল আম্রি ওয়াল আযীমাতা আলার্রুশ্দি ওয়া আসআলুকা শুক্রা নি'মাতিকা ওয়া হুস্না ইবাদাতিকা ওয়া আস্আলুকা ক্বালবান সালীমান ওয়ালিসা-নান সা-দিক্বান ওয়া আসআলুকা মিন খাইরি মা-তা'লামু ওয়া 'আউযুবিকা মিন্শার্রি মা তা'লামু ওয়া আস্তাগ্ফিরুকা লিমা তা'লামু ইন্নাকা আল্লামুল গুয়ূব।

হে আল্লাহ্! তোমার নিকট দ্বীনের কাজে আমি চাই অনড়-অবিচলতা, সৎ পথে দৃঢ় নিষ্ঠা, আর তোমার কাছে প্রার্থনা করি তোমার নিয়ামতের শুক্র গুযারী, আর তোমার ইবাদত সুন্দর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার

তওফীক, আমি তোমার নিকট আরও চাই-নির্ভেজাল প্রশান্ত হৃদয়, সত্যনিষ্ঠ বাকশক্তি আর প্রার্থনা জানাই সেই মঙ্গলের জন্য যাহা তুমি আমার জন্য ভাল জান, আর আশ্রয় প্রার্থনা করি সেই অনিষ্ট হইতে যে সম্পর্কে তুমি সুবিদিত, আর আমি মাগফিরাত চাই সেই অন্যায় অপকর্ম হইতে যাহা তুমিই জান, নিশ্চয় তুমি গায়েব সম্পর্কে পরিজ্ঞাত।

اللُّهُمَّ رَبَّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلاَمُ إِغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِيْ وَأَعِذْنِيْ مِنْ مُضِلاَّتِ الْفِتَنِ مَا أَبْقَيْتَنِيْ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা রাব্বান্ নাবিইয়ি মুহাম্মাদিন আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু ইগ্ফিরলী যাম্বী ওয়া-আযহাব গায়যা ক্বাল্বী ওয়া আইয্নী মিন মুযিল্ লা-তিল্ ফিতানে মা-আবক্বায়তানী।

হে আল্লাহ্ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রভু প্রতিপালক! মাফ করিয়া দাও আমার সমুদয় গুনাহ্। আমার হৃদয়ের ক্রোধসমূ দূর করিয়া দাও আর ফেৎনার গুমরাহী হইতে আমাকে বাঁচাও যতদিন আমাকে বাঁচিয়ে রাখ্বে।

"اللّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ، وَالْقرآنِ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ. أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ. أَقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ."

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা রাব্বাস্ সামাওয়াতি ওয়া রাব্বাল আরযি ওয়া রাব্বাল আরশিল আযীম ওয়া রাব্বা কুল্লি শাইয়্যিন ফা-লিক্বাল হাববি ওয়ান্নাওয়া মুন্যিলাত্তাওরাতি ওয়াল্ ইন্জীলি ওয়াল কুরআনি, 'আউযুবিকা মিন শার্রি কুল্লি শাইয়িন আনতা আখিযুন্ বি-নাসিয়াতিহী আন্তাল আউয়ালু ফালাইসা ক্বাবলাকা শাইয়ুন ওয়া আনতাল আখিরু ফালাইসা বা'দাকা শাইয়ূন ওয়া আনতায যা-হিরু ফালাইসা ফাওক্বাকা শাইয়ূন ওয়া আনতাল্ বাতিনু ফালাইসা দুনাকা শাইয়ূন ইক্বযি আনিদ্দাইনা ওয়াআগনিনী মিনাল ফাক্বরি।

হে আল্লাহ্! আকাশমন্ডলীর প্রভু পরোয়ারদিগার, পৃথিবীর পরোয়ারদিগার, মহান আরশের প্রভু পরোয়ারদিগার এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রভু পরোয়ারদিগার। বীজ এবং আঁটিকে চিরিয়া চারা ও বৃক্ষের উদ্ভব ঘটাও তুমি! তাওরাত ও ইন্জীল এবং কুরআন কারীমের নাযিলকারী তুমি, প্রত্যেক বস্তুর অনিষ্ট হইতে তোমার নিকটেই আশ্রয় প্রার্থনা করি আমি। তুমিই সব কিছুর পেশানীকে তোমারই হাতে ধারণ করিয়া আছ। তুমিই আদি- তোমার পূর্বে কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না; তুমিই অন্ত- তোমার পরে কোন কিছুই নাই থাকিবে না, তুমি প্রকাশ্য-সকল বস্তুর উপর বিজয়ী তোমার উপরে কিছুই নাই। তুমি গোপন-তুমি ছাড়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই-হইতে পারে না। আমার যত ঋণ আছে তুমি- হে প্রভু! উহা পরিশোধ করিয়া দাও। আর আমাকে দারিদ্র্য হইতে মুক্তি দিয়া বেনেয়াজ করিয়া দাও!

اللّٰهُمَّ اعْطِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আ'তি নাফসী তাক্বওয়াহা ওয়া যাক্কিহা আনহা খাইরু মান্ যাক্কাহা, আনতা ওয়ালিইয়ুহা ওয়া মাওলা-হা।

হে আল্লাহ্! আমার হৃদয়ে দাও তোমার ভয়-ভীতি ও তাক্ওয়া পরহেযগারী আর কলুষমুক্ত কর আমার অন্তরকে, উহাকে নিষ্কলুষ করার

সর্বোত্তম সত্তা যে একমাত্র তুমিই। তুমিই উহার ওলী এবং মালিক মুখতার।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী 'আউযুবিকা মিনাল্ আজযি ওয়াল কাসালি ওয়া 'আউযুবিকা মিনাল জুব্নি ওয়াল হারামি ওয়াল বুখলি ওয়া 'আউযুবিকা মিন আযাবিল্ ক্বাবরি।

হে আল্লাহ্! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি অক্ষমতা ও অলসতা হইতে, তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করি ভীরুতা, কাপুরুষতা, বার্ধক্যের অপরাগতা এবং কৃপণতার লা'নত হইতে আর তোমারই আশ্রয় চাই কবরের আযাব হইতে।

اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ أَعُوْذُبِعِزَّتِكَ أَنْ تُضِلَّنِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِيْ لاَ يَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوْتُوْنَ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা লাকা আসলামতু ওয়াবিকা আ-মানতু ওয়া আলাইকা তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইকা আনাবতু ওয়াবিকা খা-সাম্তু 'আউযুবিয্যাতিকা আন-তুযিল্লানী লা-ইলা-হা ইল্লা আন্তা। আন্তাল হাইয়ূল লাযী লা-ইয়ামুতু ওয়ালজিন্নু ওয়াল ইন্সু ইয়ামুতুন।

হে আল্লাহ্! তোমারই আনুগত্য বরণ করিয়াছি, তোমার প্রতিই ঈমান আনিয়াছি, তোমারই উপর ভরসা করিয়াছি, তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হইয়াছি আর তোমারই জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই। আমাকে পথ ভ্রষ্ট করার দুর্ভাগ্য হইতে তোমার ইয্যতের দোহাই দিয়া তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করি। তুমি ভিন্ন কোন সত্য ইলাহ্ নাই, তুমি এমন চিরঞ্জীব যাহার কখনও মৃত্যু নাই। অপর পক্ষে সমুদয় জিন এবং মানবকুল মরণশীল।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَّ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَّيُسْتَجَابُ لَهَا.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী 'আউযুবিকা মিন ইল্মিল লা-ইয়ানফাউ ওয়া মিন ক্বালবিল লা-ইয়াখশাউ' ওয়ামিন নাফসিল্ লা তাশ্বাউ' ওয়ামিন দা'ওয়াতিল্ লা-ইউসতাজাবু লাহা।

হে আল্লাহ্! আমি তোমার আশ্রয় চাহিতেছি এমন ইলম হইতে, যাহা কোন উপকারে আসে না, এমন হৃদয় হইতে যাহা আল্লাহ্র ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয় না, এমন অন্তর হইতে যাহা কোন কিছুতেই তৃপ্ত হয় না এবং এমন দো'আ হইতে যাহা কবুল হয় না।

اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ الأَخْلاَقِ وَالأَعْمَالِ وَالأَهْوَاءِ وَالأَدْوَاءِ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা জান্নিবনী মুনকারাতিল্ আখ্লা-ক্বী ওয়াল আমালি ওয়াল আহ্ওয়া-য়ি ওয়াল আদ্ওয়ায়ি।

হে আল্লাহ্! আমাকে তুমি দূরে রাখ ঘৃণিত স্বভাব এবং অবাঞ্ছিত আচরণ হইতে আর আমাকে রক্ষা কর কুপ্রবৃত্তির তাড়না এবং দৈহিক রোগ হইতে।

اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي وَأَعِذْنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِي.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আলহিম্নী রুশদী ওয়া আইযনী মিন শাররি নাফসী।

হে আল্লাহ্! আমাকে হিদায়াত দ্বারা অনুগৃহীত কর এবং আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট হইতে আমাকে রক্ষা কর।

اللَّهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাক্‌ফিনী বি-হালালিকা আন হারামিকা ওয়া আগ্‌নিনী বি-ফাযলিকা আম্মান সিওয়াকা।

হে আল্লাহ্! তোমার নিষিদ্ধ বস্তু হইতে দূরে রাখিয়া আমাকে তোমার হালাল বস্তুর মাধ্যমে অভাবমুক্ত রাখ আর তুমি ব্যতীত অন্য সব কিছু হইতে আমাকে তোমার অনুগ্রহরাশি দ্বারা বেনেয়াজ করিয়া দাও।

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدَي وَالتُّقَي وَالْعَفَافَ وَالْغِنَي.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াত্‌তুক্বা-ওয়াল আফাফা ওয়াল গিনা।

হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই হিদায়াত, সংযম, পবিত্র স্বভাব এবং অভাবশুণ্যতার নিয়ামতের।

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدَي وَالسَّدَادَ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াস্ সাদা-দা।

হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি হিয়াদাত এবং সঠিক পথে চলার তাওফীক।

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرٍّ كله عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিনাল খায়রি কুল্লিহী আ'জিলিহী ওয়া আ-জিলিহী মা আ'লিম্‌তু মিন্‌হু অয়ামা-লাম্ আ'লাম ওয়া 'আউযুবিকা মিনাশ্‌শার্‌রি কুল্লিহী আ'জিলিহী ওয়া আ-জিলিহী মা

আ'লিমতু মিন্‌হু ওয়ামা লাম আ'লাম ওয়া আসআলুকা মিনাল খাইরি মা সাআলাকা মিন্‌হু 'আবদুকা ওয়া নাবিইয়ূকা মুহাম্মাদান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া আউযুবিকা মিন্ শার্‌রি মাস্‌তা'আ-যা মিনহু আবদুকা ওয়া নাবিইয়ূকা মুহাম্মাদান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ, নিকট এবং দূরবর্তী কল্যাণ যে কল্যাণ সম্পর্কে আমি অবহিত এবং যে সম্পর্কে আমি অবিদিত। আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই সর্বপ্রকার অনিষ্ট হইতে-যাহা সন্নিকটে এবং যাহা দূরে অবস্থিত- যে বিষযে আমি অবহিত এবং যে বিষয়ে আমি অনবহিত। আর আমি তোমার নিকট সেই কল্যাণের আকাঙ্খী যাহার প্রার্থনা জানাইয়াছেন তোমার বান্দা এবং তোমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর আমি সেই অকল্যাণ হইতে তোমার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করি যে অকল্যাণ হইতে তোমার নিকট পানাহ্ চাহিয়াছেন তোমার বান্দা এবং তোমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِيْ خَيْرًا.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল জান্নাতা ওয়ামা ক্বার্‌রাবা ইলাইহা মিন ক্বাওলিন আওআমালিন ওয়া আউযুবিকা মিনান্‌নারি ওয়ামা ক্বার্‌রাবা ইলাইহা মিন ক্বাওলিন আওআমালিন ওয়া আস্‌আলুকা আন্ তাজ্‌আলা কুল্লা ক্বাযায়িন্ ক্বাযায়তাহ্ লী খাইরান্।

হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই জান্নাতের আর সেই কথা ও সৎ কাজের জন্য যাহা জান্নাতের নিকটে আমাকে লইয়া যায়। আর প্রার্থনা করি জাহান্নামের আগুন হইতে তোমার নিকট আশ্রয়ের এবং সেই কথা ও কাজ হইতে যাহা আমাকে উহার নিকটে লইয়া যায় আর

আমার জন্য তুমি যাহা নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছ সেই নির্ধারিত বস্তুকে আমার নিমিত্ত মঙ্গলময় করার জন্য তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই।

"لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ."

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল্ মুল্‌কু ওয়ালাহুল হামদু ইয়ুহ্য়ী ওয়া ইয়ুমীতু বিইয়াদিহিল খাইরু ওয়াহুয়া আলাকুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর।

নাই কোন সত্য ইলাহ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া তিনি একক তাঁহার কোন শরীক নাই, সমস্ত রাজত্ব তাঁহারই, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁহারই জন্য। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু প্রদান করেন, তাহারই হাতে সমস্ত কল্যাণ তিনি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

"سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لله وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

উচ্চারণঃ সুব্‌হানাল্লা-হি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আক্‌বার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিইয়্যিল আযীম।

পাক-পবিত্র আল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য, নাই কোন সত্য ইলাহ আল্লাহ্ ছাড়া, মহান ও মহীয়ান একমাত্র আল্লাহ্‌ই, নাই কোন ক্ষমতা ও কাহারও কোন কল্যাণ করার, নাই কোন শক্তি বিপদ-আপদ দূর করার। মহান মর্যাদাবান আল্লাহ্‌র শক্তি ছাড়া।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ."

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা-আ-লি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা-ইব্রাহীমা ওয়া আলা আ-লি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ, আল্লাহুম্মা বা-রিক 'আলা-মুহাম্মাদিন ওয়া আলা-আলি মুহাম্মাদিন কামা বা-রাক্তা আলা-ইব্রাহীম ওয়া আলা-আ-লি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

হে আল্লাহ্! শান্তি বর্ষণ কর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বংশধরগণের প্রতি যেমন তুমি শান্তি বর্ষণ করিয়াছিলে ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সালাম) এবং তাঁহার বংশধরগণের প্রতি, নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত এবং মর্যাদা সম্পন্ন। হে আল্লাহ্! তুমি বরকত সমৃদ্ধ কর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এবং তাঁহার বংশধরদেরকে যেমন বরকত সমৃদ্ধ করিয়াছিলে তুমি ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সালাম)- কে এবং তাঁহার বংশধরদেরকে, নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত এবং মর্যাদা সম্পন্ন।

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

উচ্চারণঃ রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুন্য়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা আযাবান্নার।

প্রভু! তুমি আমাদেরকে এই দুনিয়ায় কল্যাণ প্রদান কর এবং কল্যাণ প্রদান কর পারলৌকিক জীবনে এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হইতে বাঁচাও।

আরাফায় যাহা যাহা করণীয়

এই মহান মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে হাজীগণ পূর্বোল্লিখিত দোআ ও যিক্‌রগুলি পুনঃ পুনঃ পড়িতে থাকিবে এবং ঐ ধরনের অন্যান্য দোআসমূহ পড়িতে থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে দরূদ পাঠ করিবে। দোআগুলি পাঠ করার সময় বার বার অতি নম্রতার সহিত দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ আল্লাহ্‌র নিকট চাহিতে থাকিবে। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দোআ করিতেন, তখন প্রত্যেকটি দোআ তিনি তিনবার করিয়া করিতেন।

সুতরাং তাঁহার অনুকরণে আরাফায় অবস্থানকালে ঐ সমস্ত দোআ সহযোগে নিজেকে অত্যন্ত দীনহীন ভাবে প্রভু পরোয়ারদিগারের নিকট পেশ করিয়া আবেদন-নিবেদন করিতে থাকিবে। আল্লাহ্‌র রহমত ও মার্জনার আশায় আশান্বিত এবং তাঁহার গযব ও আযাবের বিষয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হইবে। নিজের নফসের হিসাব মনে মনে গ্রহণ করিয়া নতুনভাবে তওবা করিবে। কারণ এই দিনই বড়ই মর্যাদাপূর্ণ এবং এই দিনের সমাবেশে অত্যন্ত বিপুল। এই দিবসে মহান আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের জন্য তাঁহার অনুগ্রহের দ্বার খুলিয়া দেন। আর ফেরেশ্‌তাদের নিকট বান্দাদের আনুগত্য ও নিজের গৌরব প্রকাশ করেন। এই দিবসে তিনি বেশী সংখ্যক লোককে দোযখ হইতে মুক্ত করেন।

শয়তানকে এই দিন যত লাঞ্ছিত, হীন ও নিকৃষ্ট এবং ম্লান দেখা যায় অন্য কোনও দিনই ঐরূপ দেখা যায় নাই- কেবল বদর দিবস ছাড়া।

ইহা এই জন্য যে, শয়তান দেখিতে পায় যে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাদের প্রতি অকাতরে দয়া বখশিশ ও মার্জনা বিলাইয়া চলিয়াছেন এবং তাহাদের বেশী সংখ্যায় মুক্তি দিতেছেন। সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) হইতে এই মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন,

বৎসরে এমন কোনও দিন নাই যে, আল্লাহ্ আরাফার দিবস অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় স্বীয় বান্দাদেরকে দোযখ হইতে মুক্ত করেন এবং তিনি সেইদিন বান্দাদের অতি নিকটবর্তী হন। তারপর ফেরেশ্তাগণের নিকট গৌরব প্রকাশ করিয়া বলেন, আমার এই বান্দাগণ কী চায়?

অতএব, মুসলমানগণের উচিত নিজদের তরফ হইতে আল্লাহ্কে নেকীর কাজ দেখানো এবং বেশী সংখ্যক যিক্র -আযকার ও দোআ-দরূদ পাঠ এবং সর্বপ্রকার পাপ এবং ভুলত্রুটি হইতে তওবা ইস্তিগ্ফারের মাধ্যমে শয়তানকে হেয় ও উদ্বিগ্ন করিয়া তোলা কর্তব্য। সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফার মর্যাদাপূর্ণ মহা সমাবেশে হাজীগণ যিক্র - আযকার দোআ-দরূদসহ বিনম্র হৃদয়ে আল্লাহ্র নিকট আহাজারি করিতে থাকিবে।

সূর্যাস্ত যাওয়ার পর প্রশান্ত হৃদয়ে ধীরে-সুস্থে আরাফাত হইতে মুয্দালিফার দিকে গমন করিবে। এই সময় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুকরণে খুব বেশী করিয়া "লাব্বায়ক" উচ্চারণ করিতে থাকিবে। স্মরণ রাখা কর্তব্য, আরাফা হইতে সূর্যাস্তের পূর্বে মুয্দালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া সিদ্ধ নহে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত তথায় অবস্থান করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন,

"خذو عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ"

তোমরা আমার নিকট হইতে হজ্জের নিয়ম-কানুন শিখ এবং গ্রহণ কর।

মুয্দালিফায় রাত্রি প্রবাস

হাজীগণ যখন মুযদালিফায় পৌছিয়া যাইবে, তখন পৌছিয়াই মাগরিবের ৩ রাকাত এবং ইশার ২ রাকাত নামায এক আযানে আর দুই ইকামতে একত্র করিয়া পড়িবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইরূপই করিয়াছিলেন।

মুয্দালিফায় হাজীগণ মাগরিবের সময়ই পৌছুক অথবা ইশার সময়; নামাযের তরতীব ঠিক এরূপই হইবে-অর্থাৎ প্রথমে মাগরিবের ৩ রাকাত, পরে ইশার দুই রাকাত কসর পড়িতে হইবে ; যে সব লোক মুয্দালিফায় পৌছার সঙ্গে সঙ্গেই নামাযের পূর্বে কঙ্কর সংগ্রহের কাজে লাগিয়া যায় এবং তাহাদের অনেকে এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, উক্ত কাজ শরীয়ত-সিদ্ধ তাহারা ভ্রান্ত, এরূপ করা সম্পূর্ণ ভুল, উহার কোনই ভিত্তি নাই।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাশ্আরুল হারাম হইতে মীনার দিকে গমনকালেই কঙ্কর সংগ্রহের আদেশ দিয়াছিলেন-তাহার পূর্বে নহে। যেখান হইতেই কঙ্কর লওয়া হউক তাহা জায়েয হইবে। তবে মুয্দালিফা হইতেই উহা চয়ন করিতে হইবে এরূপ নির্দিষ্ট স্থানের সহিত উহাকে বিশেষভাবে সম্পর্কিত করিবে না। বরং মীনা হইতেও উহা চয়ন করা শরীয়ত সম্মত হইবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে ঐ দিনে জামরা উকবায় মারিবার জন্য কেবল সাতটি কঙ্কর চয়ন করা সুন্নত। অবশিষ্ট তিন দিবস-মীনা হইতেই প্রতি দিন ২১টি করিয়া কঙ্কর চয়ন করিবে এবং তিন জামরায় পর্যায়ক্রমে উহা নিক্ষেপ করিবে।

কঙ্করগুলিকে ধৌত করা মুস্তাহাব নয় ; বরং না ধুইয়াই উহা নিক্ষেপ করিবে। কেননা এই কঙ্কর ধৌতকরণের কোন কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার সাহাবাগণ হইতে বর্ণিত হয় নাই। আর ব্যবহৃত কঙ্কর পুরনায় ব্যবহার করা ঠিক নহে।

দূর্বল নারী ও শিশুদের অর্ধরাত্রির পর মীনায় প্রেরণ

হাজীদের এই রাত্রিতে মুযদালিফাতেই অবস্থান করিতে হইবে। অপরপক্ষে নারীদের মধ্যে যাহারা দূর্বল তাহাদের এবং শিশুদের শেষ রাত্রে মীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা সিদ্ধ হইবে। অনুরূপ নির্দেশ অন্যান্য অক্ষমদের বেলায়ও। প্রমাণ হইতেছে আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) এবং হযরত উম্মে সালমা (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর হাদীস। কিন্তু ইহা ছাড়া অন্যসব হাজীদের ফজরের নামায না পড়া পর্যন্ত মুযদালিফাতে অবস্থান করিতে হইবে। ফজরের নামাযের পর হাজীগণ মাশ'আরুল হারাম সামনে রাখিয়া কিবলামুখী হইয়া দাঁড়াইবে এবং খুব বেশী সংখ্যায় আল্লাহ্‌র যিক্‌র , তাকবীর এবং দোআ-দরূদ পাঠ করিতে থাকিবে- যে পর্যন্ত না খুব ফর্সা হইয়া যায় অর্থাৎ যে পর্যন্ত না প্রভাতের আলোকরেখা অনেকটা উজ্জ্বল হইয়া উঠে অর্থাৎ ফর্সা নামিয়া আসে। দোআর সময় হাত উঠান মুস্তাহাব। মাশ্‌আরুল হারামের কাছেই অবস্থান করিতে হইবে বা উহাতে উঠিতে হইবে এমন কোন কথা নাই ; বরং মুযদালিফার যেখানেই অবস্থান করিবে তাহাই সিদ্ধ এবং যথেষ্ট হইবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

"وقفت ههنا- يعني على المشعر- وجمع كلها موقف". (رواه مسلم)

আমি এখানে অর্থাৎ মাশ্‌আরুল হারামের কাছে অবস্থান করিয়াছি তবে পুরা মুযদালিফাই অবস্থানের স্থল। (সহীহ মুসলিম)

ভোর হইতে মীনায় গমন, কঙ্কর নিক্ষেপকরণ প্রভৃতি

যখন পূর্বাকাশ অরুণালোকে উদ্ভাসিত হইবে এবং বেশ ফর্সা হইয়া যাইবে- তখন সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে-মীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবে এবং পথে খুব বেশী করিয়া লাব্বায়ক পড়িতে থাকিবে। যখন মুহাস্‌সার উপত্যকায় পৌঁছিয়া যাইবে তখন কিঞ্চিৎ দ্রুত চলা মুস্তাহাব, মীনা

পৌঁছার পর জামরাতুল উক্‌বার কাছে গিয়া তালবিয়া-লাব্বায়ক ধ্বনি বন্ধ করিয়া দিবে। সেখানে পৌঁছিয়াই বড় জামরায় পর পর সাতটি কঙ্কর মারিবে-প্রত্যেকটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় হাত উঠাইবে এবং তাক্‌বীর-আল্লাহু আকবার পাঠ করিবে। কঙ্কর মারার সময় কা'বা শরীফকে বাম দিকে এবং মীনাকে ডান দিকে রাখিবে আর উপত্যকার মধ্য হইতে কঙ্কর নিক্ষেপ করিবে, কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এইরূপ করিয়াছিলেন, তবে অন্য দিক হইতেও যদি মারে, তবু উহা জায়েয হইবে- যদি উহা নিক্ষেপের লক্ষ্যস্থলে পতিত হয়। সেখানে পড়াটাই শর্ত, পড়িয়া থাকিয়া যাওয়াটা শর্ত নয়, যদি নিক্ষেপের লক্ষ্যস্থলে পতিত হওয়ার পর কঙ্করগুলি উহা হইতে গড়াইয়া পড়িয়া যায়, বিস্তৃত ব্যাখ্যা ইমাম নওয়াভী তাঁহার শারহুল মুহায্‌যাব গ্রন্থে প্রদান করিয়াছেন। কঙ্করগুলি ছেলেদের ব্যবহৃত গুলালের গুলির সমান হওয়া বাঞ্ছনীয় যাহা বুটের দানা অপেক্ষা কিছু বড় হইয়া থাকে।

কঙ্কর মারার পরেই কুরবানীর জানোয়ার যবহ্ করিবে। যবহ্ করার সময় বলিতে হইবেঃ

"بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ".

উচ্চারণঃ বিস্‌মিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহুম্মা হাযা মিন্‌কা ওয়া লাকা।

"আল্লাহ্‌র নামে কুরবানী করিতেছি এবং আল্লাহ্ হইতেছেন মহান মহীয়ান। হে আল্লাহ্! ইহা তোমারই তরফ হইতে প্রাপ্ত তোমারই উদ্দেশ্যে নিবেদিত।" জানোয়ারটিকে কেবলামুখী করিবে। উহা উট হইলে সুন্নত পদ্ধতি হইল উহাকে দাঁড় করাইয়া সামনের বাম পা বাঁধা অবস্থায় বক্ষদেশে বর্শা দ্বারা আঘাত করা। সে অবস্থায় ফিনকি দিয়া রক্ত বাহির হইবে এবং উহা পড়িয়া যাইবে।

গরু, ছাগল বা দুম্বা হইলে উহাকে উহার বাম কাইতে শায়িত করিয়া যবহ করিতে হইবে। কিবলামুখী না করিয়া যদি অন্যমুখী যবহ হইয়া যায় তবে সুন্নত ছুটিয়া যাইবে ; কিন্তু যবহ সিদ্ধ হইবে। কেননা যবহের সময় জানোয়ারকে কিবলামুখী করা সুন্নাত- উহা অবশ্যকরণীয় ওয়াজিব নহে। কুরবানীর গোশত হইতে নিজে কিছু খাওয়া মুস্তাহাব, বাকীটা হাদিয়ারূপে বন্ধু ও আপনজনদের এবং সাদ্‌কা স্বরূপ গরীবদের প্রদান করিবে, যেমন আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশ প্রদান করিয়াছেনঃ

﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾.

তোমরা উহা হইতে খাও এবং অভাবগ্রস্ত দরিদ্র ব্যক্তিদের খাওয়াও। (সূরা হাজ্জ ঃ ৩৬)

কুরবানীর দিবস সমূহ

বিদ্বানগণের অধিকতর বিশুদ্ধ মতানুযায়ী কুরবানীর সময়সীমা আইয়ামে তাশরীকের ১৩ই তারিখের সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত সম্প্রসারিত। অর্থাৎ ১০ই হইতে ১৩ই যিলহজ্জ পর্যন্ত চারি দিবসই কুরবানী করা চলে। জানোয়ার নহর অথবা যবহ করার পর হাজী হয় তার মাথা মুন্ডন করিবে, নতুবা চুল ছোট করিয়া কাটিবে। তবে মাথা মুন্ডন করাই উত্তম। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা মুন্ডনকারীদের জন্য তিনবার রহমত ও মাগফেরাতের দোআ করিয়াছেন- অপর পক্ষে চুল ছোট করিয়া কর্তনকারীদের জন্য মাত্র একবার উক্ত দোআ করিয়াছেন। মাথার কিছু অংশের চুল ছোট করিয়া কাটা যথেষ্ট হইবে না ; বরং মাথা ন্যাড়া করার মত সমস্ত মাথার চুলই ছোট করা অবশ্য কর্তব্য। আর নারীদের জন্য তাহাদের চুলের প্রত্যেক বেণী হইতে কমপক্ষে আঙ্গুল পরিমাণ কাটিতে হইবে। জাম্‌রা উকবায় কঙ্কর নিক্ষেপ এবং মাথা মুন্ডন অথবা চুল কর্তনের পর মুহরিমের জন্য স্ত্রীর সহিত যৌন মিলন ছাড়া অন্য সব বস্তুই হালাল হইয়া যাইবে যাহা ইহরামের কারণে তাহার উপর

হারাম হইয়া গিয়াছিল। এই হালাল হওয়াকে তাহাল্লুলে আওয়াল বা প্রথম হালাল হওয়া বলা যাইতে পারে।

এই 'হালাল' হওয়ার পর হাজীর জন্য খুশবু মাখা এবং তওয়াফে ইফাযা করার জন্য মক্কার দিকে অগ্রসর হওয়া সুন্নত। হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহরাম বাঁধিবার পূর্বে এবং প্রথম হালাল হওয়ার পর বায়তুল্লাহ্র তওয়াফের পূর্বে খুশবু মাখাইয়া দিয়াছি। (বুখারী ও মুসলিম) এই তওয়াফকে তওয়াফে ইফাযা এবং তওয়াফে যিয়ারতও বলা হয়। ইহা হজ্জের আরকানসমূহের অন্যতম রুকন। ইহা ভিন্ন হজ্জ উদ্‌যাপন পূর্ণ হয় না। আর ইহাই হইতেছে মহান ও মহীয়ান আল্লাহ্র নিম্নোক্ত ইরশাদের তাৎপর্য।

﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾.

অতঃপর তাহারা যেন তাহাদের দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাহাদের মানত পূর্ণ করে এবং তওয়াফ করে প্রাচীন ঘরের -কা'বা গৃহের।

তওয়াফ এবং মাকামে ইব্‌রাহীমে দুই রাকাত নামায পড়ার পর সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থলে 'সাঈ' করিবে-যদি হাজী মুতাম্মাত্তে হয় অর্থাৎ তাহার হজ্জ তামাত্তো হজ্জ হয়। আর এই 'সাঈ' হইবে তাহার হজ্জের 'সাঈ' প্রথম 'সাঈ' ছিল তাহার উমরার 'সাঈ'।

তামাত্তো হজ্জের জন্য এক 'সাঈ' যথেষ্ট নহে।

"আলেমগণের সর্বাধিক সহীহ্ মতানুসারে হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর এই হাদীসের আলোকে তামাত্তো' হজ্জ পালনকারীর জন্য এক 'সাঈ' যথেষ্ট নহে। হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) বলেনঃ

আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত হজ্জের জন্য বাহির হইলাম, এই হাদীসের পরবর্তী অংশের শব্দ এইঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তির সহিত কুরবানীর জানোয়ার আছে সে উমরার সহিত হজ্জেরও ইহ্‌রাম বাঁধিবে এবং উমরাহ্ ও হজ্জ উভয়ই উদ্‌যাপন করিবার পর হালাল হইবে। তারপর হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) বলেন, যাহারা শুধু ইহ্‌রাম বাঁধিয়াছিলেন তাহারা কা'বা শরীফের তওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার 'সাঈ' করিয়া হালাল হইয়া যায়, তারপর তাহারা হজ্জ সমাপন করিয়া যখন মীনা হইতে প্রত্যাবর্তন করিল, তখন আর একটি তওয়াফ করিল। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর কথা অনুসারে যেসব লোক উমরার ইহ্‌রাম বাঁধিয়াছিল তাহারা হজ্জের পর মীনা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া যে তওয়াফ করিয়াছিল সে তওয়াফের তাৎপর্য এই হাদীসের বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা অনুসারে সাফা এবং মারওয়ার তওয়াফ। যে সব লোক বলে যে, হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) যে তওয়াফের কথা বলিয়াছেন- তাহা দ্বারা তিনি তওয়াফে ইফাযা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তাহা মোটেই সহীহ্ নয়। কেননা তওয়াফে ইফাযা হইতেছে সকলের জন্য অবশ্যপালনীয় একটি রুক্‌ন যাহা তাহারা সবাই সম্পাদন করিয়াছিল।

এই তওয়াফ তামাত্তো হজ্জকারীদের জন্য নির্দিষ্ট-উহা সাফা ও মারওয়ার তওয়াফ যাহা হজ্জব্রত সমাপন অন্তে মীনা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর দ্বিতীয় দফায় করিতে হয়। আল্‌হামদু লিল্লাহ্-অতএব মাসআলা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়া গেল। আর ইহাই অধিকাংশ বিদ্বানগণের অভিমত। অর্থাৎ তামাত্তো হজ্জকারীদের সাফা-মাওয়ার 'সাঈ' বা তওয়াফ দ্বিতীয় দফায় করিতে হয়। উহার বিশুদ্ধতার সপক্ষে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের সেই হাদীস উল্লেখ করা যাইতে পারে যাহা ইমাম

বুখারী স্বীয় সহীহ্ বুখারীতে নির্ভরযোগ্য শব্দে “তা’লীকান” রেওয়ায়েত করিয়াছেন। ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু)কে তামাত্তো হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, মুহাজেরীন ও আনসার এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সহধর্মিনীগণ বিদায় হজ্জের ইহ্রাম বাঁধিলেন, আমরাও ইহ্রাম বাঁধিলাম। যখন আমরা মক্কায় পৌঁছিলাম তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ “তোমরা তোমাদের হজ্জের ইহ্রামকে উমরার ইহ্রাম রূপে গণ্য কর- কিন্তু ঐ সব ব্যক্তি ছাড়া যাহাদের সঙ্গে কুরবানীর জানোয়ার রহিয়াছে।”

মূলতঃ আমরা বায়তুল্লাহ্ এবং সাফা-মারওয়ার তওয়াফ করিলাম এবং আমরা স্বীয় স্ত্রীদের নিকটও গেলাম এবং সিলাইকৃত কাপড়ও পরিধান করিলাম। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, আর যাহাদের সঙ্গে কুরবানীর জানোয়ার রহিয়াছে তাহারা কিন্তু হালাল হইবে না যে পর্যন্ত না কুরবানীর জানোয়ার স্বীয় নির্দিষ্ট স্থানে অর্থাৎ মীনায় না পৌছে। ৮ই জিলহাজ্জার দিবসে তিনি আমাদিগকে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধার হুকুম প্রদান করিলেন। অতঃপর আমরা যখন আবার হজ্জের ইহ্রাম বাঁধার ক্রিয়াকর্ম শেষ করিয়া ফারেগ হইলাম তখন কা’বা শরীফ এবং সাফা-মারওয়া তওয়াফ করিলাম, শেষ পর্যন্ত। এই বিবরণ হইতে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল এবং তামাত্তো হজ্জকারীদের দুই দফা ‘সাঈ’ করার অপরিহার্যতা পরিষ্কার হইয়া গেল।

এখন বাকী রহিল মুসলিম শরীফে হযরত জাবের (রাযিআল্লাহু আনহু) কর্তৃক সেই হাদীস যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁহার সাহাবাগণ মাত্র একবারই সাফা-মারওয়ার তওয়াফ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রথম তওয়াফ, ইহা শুধু তাঁহাদের উপরে প্রযোজ্য যাহারা কুরবানীর জানোয়ার সঙ্গে আনিয়াছিলেন। কেননা তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে তাহাদের স্বীয় ইহ্রাম অবস্থাতেই রহিয়া

গিয়াছিলেন- যে পর্যন্ত না তাহারা হজ্জ ও উমরাহ্ হইতে ফারেগ হওয়ার পর হালাল হইলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও একই সাথে হজ্জ ও উম্‌রার ইহ্‌রাম বাঁধিয়াছিলেন। যাহারা কুরবানীর জানোয়ার সঙ্গে আনিয়াছিল তাহাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, তাহারা উমরার সহিত হজ্জেরও ইহ্‌রাম বাঁধিবে এবং যে পর্যন্ত এই দুইটি হইতে ফারেগ না হইবে সে পর্যন্ত তাহারা হালাল হইবে না। আর হজ্জ ও উমরাহ্ যাহারা এক সাথে করার নিয়ত করিবে তাহাদের জন্য 'সাঈ' হইবে একবার মাত্র যাহা জাবের (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর উল্লেখিত হাদীস এবং অন্যান্য সহীহ্ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হইয়া যায়।

এইভাবে যে ব্যক্তি হজ্জে এফরাদের ইহ্‌রাম বাঁধে এবং কুরবানীর দিবস পর্যন্ত স্বীয় ইহ্‌রামের অবস্থায় থাকে তাহার জন্যও সাফা-মারওয়ায় একবার মাত্র 'সাঈ' যথেষ্ট হইবে।

অতএব যখন কেরান হজ্জকারী এবং ইফরাদ হজ্জকারী-মক্কায় পৌঁছিয়া তওয়াফে কুদূমের পর যখন সাফা-মারওয়া 'সাঈ' করিল, তখন তওয়াফে ইফাযার পর আর 'সাঈ' করিতে হইবে না প্রথমবারের 'সাঈ'ই যথেষ্ট হইবে। যেমন, হযরত জাবেরের (রাযিআল্লাহু আনহু) উল্লেখিত হাদীস এবং অন্যান্য সহীহ্ হাদীসের মাধ্যমে উহা পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল।

এইভাবে হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের হাদীস এবং হযরত জাবেরের (রাযিআল্লাহু আনহু) হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল এবং একটির সহিত অপরটিকে বাহ্যিক বৈসাদৃশ্যও দূরীভূত হইয়া গেল এবং এই সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে সকল হাদীসের উপর আমল হইয়া গেল।

এই সামঞ্জস্যের স্বপক্ষে আর একটি সমর্থন এইভাবেও হইতে পারে যে, হযরত আয়িশার (রাযিআল্লাহু আনহা) এবং হযরত ইবনে আব্বাসের

(রাযিআল্লাহু আনহু) সহীহ্ হাদীস দুইটি-তামাত্তো হজ্জকারীদের জন্য দুই দফায় 'সাঈ' সাব্যস্ত করে। আর জাবেরের (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর হাদীস দৃশ্যতঃ উহা অস্বীকার করে। কিন্তু ইল্‌মে উসূল এবং হাদীসের ইস্‌তিলাহ মুতাবিক সাব্যস্তকারী হাদীস অস্বীকারকারী হাদীসের উপর অগ্রগণ্য বিবেচিত হইয়া থাকে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ও তাআলাই সঠিক তথ্যের তাওফীকদাতা, আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত কাহারও ভালমন্দের কোন ক্ষমতা নাই।

পরিচ্ছেদ-فصل

কুরবানীর দিবসে করণীয় কাজসমূহের শ্রেণীবিন্যাস

হাজীদের জন্য কুরবানীর দিবসে করণীয় ৪টি কাজ উল্লিখিত বিন্যাস অনুসারে করা উত্তম। তরতীব বা পর্যায়ক্রমটি এইরূপঃ

প্রথম করণীয় কাজ হইতেছে জাম্‌রাতুল উকবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা, দ্বিতীয় কাজ হইতেছে কুরবানী করা, তৃতীয় পর্যায়ের কাজ হইল মাথা মুন্ডন অথবা চুল ছোট করিয়া ছাঁটা, চতুর্থ পর্যায়ের কাজ কাবাগৃহের তওয়াফ করা। এবং মুতামাত্তে হাজীর জন্য সাফা-মারওয়ার 'সাঈ' করা আর মুফরাদ অথবা ক্বারেন হজ্জকারী যদি তওয়াফে কুদূমের সঙ্গে 'সাঈ' না করিয়া থাকে তবে তাহাদের জন্যও 'সাঈ' করা প্রয়োজন।

এই চারি পর্যায়ের উল্লিখিত তরতীবে যদি ব্যতিক্রম ঘটে এবং কাজগুলি কোনটি আগে-পরে ঘটিয়া যায় তবু উহা জায়েয হইবে। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হইতে উহার রুখসতের প্রমাণ মওজুদ রহিয়াছে।

তওয়াফের পূর্বে 'সাঈ' এই রুখ্‌সতের অন্তর্ভুক্ত হইবে কেননা ইহা কুরবানীর দিবসে করণীয় কাজসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কোন সাহাবী কর্তৃক এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হওয়ায় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ افعل ولا حرج। কর, উহাতে কোন দোষ বর্তিবে না। কারণ ভুল এবং অজ্ঞতাবশতঃ এরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং সহজসাধ্যতা ও সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 'তওয়াফ' ও 'সাঈ'-এর আগে-পরে হওয়ার ব্যাপারটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাধারণ রুখ্‌সতের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া পারে না।

এক ব্যক্তি তওয়াফের পূর্বে সাফা-মারওয়ার 'সাঈ' করিয়া ফেলে, তাঁহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হওয়ায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছিলেনঃ "কোন ক্ষতি নাই।" ইমাম আবূ দাউদ উসামা ইবনে

শারীকের বর্ণনায় উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং নিঃসন্দেহে ইহা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রদত্ত রুখ্সতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ব্যাপারটি পরিষ্কার হইয়া গেল। আল্লাহই তাওফীকদাতা।

যে সমস্ত কাজ পূর্ণ করার ফলে হাজীগণ পুরাপুরি হালাল হইয়া যায় উহা তিনটি-জাম্রা উকবায় কঙ্কর মারা, মাথা মুন্ডন অথবা চুল ছোট করা এবং তওয়াফে ইফাযার সহিত 'সাঈ' করা, -ঐ সমস্ত হাজীদের জন্য যাহাদের কথা এইমাত্র উল্লেখ করা হইল। অতএব হজ্জ পালনকারী যখন এই তিনটি কাজ সমাধা করিবে, তাহার জন্য ইহ্রামের কারণে নিষিদ্ধ প্রত্যেকটি কাজ হালাল হইয়া যাইবে, স্ত্রীর সহিত মিলন, সুগন্ধি লাগানো প্রভৃতি সবই তাহার জন্য সিদ্ধ হইবে। আর যে ব্যক্তি উক্ত তিনটির মধ্যে দুইটি সমাপন করিবে তাহার জন্য ইহ্রামের কারণে হারাম কাজগুলি সবই হালাল হইবে একমাত্র স্ত্রীর সহিত যৌন মিলন ব্যতীত। এই অবস্থায় এই হালাল হওয়াকে বলা হইবে তাহাল্লুলে আউয়াল বা প্রাথমিক হালাল।

যম্যমের পানি পান করা

হাজীদের জন্য যম্যমের পানি পান করা এবং উহা পেট পুরিয়া পান করা উত্তম কাজ। যম্যমের পানি পান করার সময় কল্যাণপ্রদ দোআগুলির মধ্যে যাহা সহজ সাধ্য সেই দোআগুলি পড়া বাঞ্ছনীয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেনঃ

"ماء زمزم لما شرب له"

"যম্যমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হইবে সেই উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইবে।" সহীহ্ মুসলিম শরীফে আবু যার গিফারী (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যম্যমের পানি সম্পর্কে বলিয়াছেনঃ

"إنه طعام طعم"

"উহা পানকারীর জন্য উত্তম খোরাক স্বরূপ।" আবু দাউদে এই হাদীসের অতিরিক্ত শব্দগুলি নিম্নরূপঃ

"وشفاء سقم"

"উহা রোগীর জন্য আরোগ্য স্বরূপ।"

তওয়াফে ইফাযা এবং যাহার জন্য সাঈ করা কর্তব্য তাহার সাঈ করার পর হাজীগণ মীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে এবং মীনায় তিন দিন, তিন রাত্রি অবস্থান করিবে। প্রত্যেক দিনই সূর্য ঢলার পর তিন জামরাতেই কঙ্কর মারিবে,

ويجب الترتيب في رميها.

এই কঙ্কর মারার তরতীব রক্ষা করা ওয়াজিব। অতএব মসজিদে খায়েফের সন্নিকটে অবস্থিত জামরা উলায় প্রথম কঙ্কর মারা শুরু করিবে অতঃপর সাতটি কঙ্কর একের পর এক মারিবে।

প্রত্যেক কঙ্কর নিক্ষেপের সময় হস্ত উত্তোলন করিতে হইবে। মাসনূন নিয়ম এই যে, কঙ্কর মারার পর কিছুটা পিছাইয়া আসিবে এবং জামরাকে বাম দিকে রাখিয়া কেবলামুখী হইবে এবং দুই হাত তুলিয়া করুণ আবেদন-নিবেদন সহকারে আল্লাহ্‌র নিকট অধিক মাত্রায় দোআ করিতে থাকিবে।

তারপর দ্বিতীয় জামরায় পৌঁছিয়া প্রথম বারের ন্যায় কঙ্কর নিক্ষেপ করিবে। এখানে মাসনূন পদ্ধতি এই যে, কঙ্কর নিক্ষেপের পর কিছুটা সম্মুখের দিকে সরিয়া যাইবে এবং জামরাকে ডাইন দিকে এবং কেবলাকে সম্মুখ দিকে রাখিয়া হাত উঠাইয়া খুব বেশী করিয়া দোআ পাঠ করিবে। তারপর তৃতীয় জামরায় গিয়া কঙ্কর নিক্ষেপ করিবে কিন্তু সেখানে দাঁড়াইবে না এবং দোআ পাঠ করিবে না কঙ্কর মারিয়াই চলিয়া আসিবে।

আইয়ামে তাশরিকের দ্বিতীয় দিবসে সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলিবার পর প্রথম দিবসের ন্যায় ঐ তিন জামরায় কঙ্কর মারিবে এবং প্রথম দিবসে প্রথম ও দ্বিতীয় জামরায় যেরূপ করা হইয়াছে ঠিক সেইভাবেই উক্ত কাজ সমাধা করিবে যেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পুরাপুরি অনুসরণ করা সম্ভব হয়। জানিয়া রাখা কর্তব্য যে, আইয়ামে তাশ্‌রীকের প্রথম দুই দিবস অর্থাৎ ১১ই ও ১২ই যিলহজ্জে কঙ্কর মারা হজ্জের ওয়াজিব কাজসমূহের অন্তর্ভুক্ত। ঐ একইভাবে মীনায় প্রথম এবং দ্বিতীয় রাত্রি যাপন করা প্রত্যেক হাজীর জন্য ওয়াজিব, তবে যাহারা যম্‌যমের পানি পান করানোর কাজে নিয়োজিত এবং যাহারা মেষ পালক তাহাদের জন্য এবং এই ধরনের অন্যদের জন্য ওয়াজিব নয়।

উল্লিখিত দুই দিবস কঙ্কর মারার পর যাহারা মীনা হইতে তাড়াতাড়ি প্রত্যাবর্তন করিতে ইচ্ছুক হইবে, তাহাদের জন্য ঐরূপ চলিয়া আসা বৈধ হইবে কিন্তু ঐদিন সূর্যাস্তের পূর্বেই বাহির হইতে হইবে। তবে যে ব্যক্তি আরও বিলম্ব করিবে এবং তৃতীয় রাত্র তথায় যাপন করিয়া তৃতীয় দিবসে জামরাগুলিতে কঙ্কর মারিবে সে উত্তম কাজ করিবে এবং অধিক সওয়াবের হক্বদার হইবে যেমন আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ

﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِيْ أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾. الآية.

"তোমরা গণনার নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহ্‌র যিক্‌র কর- অর্থাৎ মীনায় অবস্থানকালে- অতঃপর যে ব্যক্তি দুইদিনের মধ্যে চলিয়া আসিতে চায় তাহার উপর কোনরূপ দোষ নাই এবং যে পিছাইয়া থাকে তাহাদের প্রতিও কোন দোষ বর্তিবে না।" (সূরা বাক্বারাঃ ২০৩)

১৩ তারিখের রাত্রি যাপনপূর্বক কঙ্কর মারিয়া থাকার কাজ অতিউত্তম হওয়ার কারণ এই যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লোকদিগকে ১২ তারিখে চলিয়া আসার অনুমতি দিলেও নিজে চলিয়া

আসেন নাই বরং মীনায় অবস্থান করেন এবং ১৩ তারিখে সূর্য ঢলার পর সমস্ত জামরায় কঙ্কর মারিয়া যোহর পড়ার পূর্বেই রওয়ানা হইয়াছিলেন।

অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেদের পক্ষে উহাদের অভিভাবকদের জন্য কঙ্কর মারা জায়েয হইবে। উহারা নিজেদের জন্য কঙ্কর মারার পর উহাদের পক্ষে মারিবে। অনুরূপ অপ্রাপ্ত বয়সের মেয়েদের পক্ষে তাহার ওলীরা কঙ্কর মারিবে। সাহাবী জাবের (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সহিত হজ্জ করিয়াছিলাম,

"...ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم' (أخرجه ابن ماجه)

"আমাদের সহিত নারী ও শিশু ছিল, অতঃপর আমরা বাচ্চাদের পক্ষ হইতে লাব্বায়িক বলিয়াছিলাম এবং কংকর মারিয়াছিলাম। বর্ণনায় ইবনে মাজাহ-

ويجوز للعاجز .. أن يوكل من يرمي عنه.

অসুস্থতার কারণে কিংবা বয়ঃবৃদ্ধি বা মেয়েদের গর্ভের কারণে নিজ হাতে কঙ্কর মারিতে অপারগ ব্যক্তিবর্গের জন্য অপরকে দিয়া কঙ্কর মারার কাজ করা জায়েয হইবে। কেননা আল্লাহ্ বলিয়াছেনঃ

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾.

"তোমরা সাধ্য মুতাবিক আল্লাহ্কে ভয় করিয়া চল।" (সূরাঃ তাগাবুনঃ ১৬) আর তাহারা মানুষের ভীড় ঠেলিয়া কঙ্কর মারিতে সক্ষম নহে।

وزمن الرمي يفوت ولايشرع قضاؤه فجازلهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك.

আর কঙ্কর মারার সময় চলিয়া গেলে উহা কাযা করার সুযোগ নাই সুতরাং তাহাদের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা বৈধ হইবে। ইহা ব্যতীত হজ্জের অন্য কোনও কাজ অপরকে দিয়া করানো চলিবে না। নফল বা বদলা যে কোন হজ্জেই যে ইহ্‌রাম বাঁধিয়াছে বা বাঁধিবে তাহাকে হজ্জের যাবতীয় কাজ নিজেই করিতে হইবে। কারণ আল্লাহ্ তাআলা বলিয়াছেনঃ

﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ﴾.

"তোমরা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে হজ্জ ও উমরার কাজ পূর্ণভাবে সম্পাদন করো।" (সূরা বাক্বারা ঃ ১৯৬)

তাওয়াফ ও সাঈর সময় ফউত (শেষ) হইয়া যায় না। পক্ষান্তরে কঙ্কর নিক্ষেপের সময় ফউত (শেষ) হইয়া যায়। আর আরাফায় অবস্থান এবং মুযদালিফা ও মীনায় রাত্রিবাসের সময়সীমা নির্দিষ্ট বিধায় উক্ত সময় নিঃসন্দেহে ফউত হইয়া যায়। কিন্তু কোন অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে কষ্টসাধ্য হইলেও এই সব জায়গায় (বিলম্ব হইলেও) পৌছা সম্ভব। অনুরূপভাবে প্রস্তর নিক্ষেপের সময়সীমাও নির্দিষ্ট তাই প্রস্তর নিক্ষেপে অক্ষম ব্যক্তির প্রতিনিধি নিয়োগ সালাফে সালেহীন হইতে সুসাব্যস্ত। হজ্জের অন্যান্য অনুষ্ঠানে প্রতিনিধি নিয়োগ সাব্যস্ত নয়।

জানিয়া রাখা কর্তব্য যে, ইবাদাতের ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন আল্লাহ্‌র তরফ হইতে প্রাপ্ত নির্দেশের উপরই নির্ভরশীল। কাজেই কাহারও পক্ষেই দলীল প্রমাণ ছাড়া কোন বস্তুকে শরীয়তসিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা জায়েয নয়।

কঙ্কর মারার জন্য নিয়োজিত নায়েব তথা প্রতিনিধির প্রথমে নিজের তরফ হইতে এবং পরে স্বীয় মুয়াক্কিলের পক্ষে কংকর মারা সিদ্ধ। তিনবার কংকর মারার প্রত্যেক বারে একই স্থানে দাঁড়াইয়া উহা করা চলিবে। তিনবারের সমস্ত কংকর নিক্ষেপ প্রথমে নিজের তরফ হইতে সমাপ্ত করিয়া পরে মুয়াক্কিলের পক্ষে কংকর নিক্ষেপ করিতে হইবে-

এমন প্রক্রিয়া ওয়াজিব নহে। ইহাই উলামাদের বিশুদ্ধ মত। কেননা ঐরূপ পদ্ধতি বাধ্যবাধকতার মধ্যে কঠিনতা ও কষ্টসাধ্যতা রহিয়াছে অথচ আল্লাহ্র বাণী হইতেছে যে,

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ﴾.

"আল্লাহ্ তোমাদের দ্বীনের কোন অপ্রশস্ততা রাখেন নাই।" আর প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ

"يسروا ولا تعسروا"

সহজভাবে সমাধা কর, কঠিন বা কষ্টসাধ্য করিয়া তুলিও না। ইহা ছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কোন সাহাবী হইতেও এরূপ রেওয়ায়েত নাই যে, তাহারা যখন তাহাদের বাচ্চাদের এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা ছিল অক্ষম তাহাদের পক্ষে কংকর মারিয়াছে তখন ঐ পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন। যদি ঐরূপ করিতেন তবে নিশ্চয় উহা বর্ণিত হইত বিশেষ করিয়া বর্ণনার সবরকম সুযোগই যখন বিদ্যমান ছিল। একমাত্র মহান আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

পরিচ্ছেদ-فصل

কুরবানী প্রসঙ্গ

হাজী যদি তামাত্তু অথবা ক্বেরান হজ্জ সম্পাদনকারী হয় এবং সে মসজিদুল হারামের সীমার মধ্যে বসবাসকারী না হয়, তবে তাহার জন্য পশু কুরবানী করা ওয়াজিব, ছাগ- মেষ জাতীয় হইলে একটি এবং উট কিংবা গরুর সাত ভাগের এক ভাগ হইলেও চলিবে।

কুরবানীর জানোয়ার হালাল রোযগারের হইতে হইবে

কুরবানীর জানোয়ার হালাল মাল এবং পবিত্র উপায়ে অর্জিত অর্থ দ্বারা হইতে হইবে। কেননাঃ

"إن الله طيب لايقبل إلا طيبًا".

আল্লাহ্ পাক-পবিত্র এবং পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু কবুল করেন না।

মুসলিম হিসাবে উচিত ফরয কুরবানীর জানোয়ার বা অন্য কোনরূপ কুরবানীর জন্য মানুষের নিকট সওয়াল-যাঞ্চা করা হইতে বিরত থাকা, সে যাচ্যমান ব্যক্তি স্বয়ং বাদশা হউক, অথবা অন্য কেহ হউক। অর্থাৎ কাহারও নিকট যাঞ্চা করা উচিত নহে, যখন আল্লাহ্ তাহাকে তাহার মাল দ্বারা নিজের পক্ষে কুরবানী করার সুযোগ দিয়াছেন এবং অপরের হাতে রক্ষিত মালের মুখাপেক্ষী হওয়া হইতে তাহাকে বেনিয়ায করিয়াছেন।

এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হইতে এমন বহু হাদীস আসিয়াছে, যাহাতে সওয়াল করার নিন্দা ও উহার প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে এবং পরের নিকট যাঞ্চা পরিত্যাগ করার প্রতি প্রশংসা করা হইয়াছে।

যে হাজী কুরবানী করিতে অক্ষম তাহাকে কি করিতে হইবে

তামাত্তো এবং ক্বেরান হজ্জ পালনকারী যদি পশু কুরবানী করিতে সক্ষম না হয় তবে তাঁহার জন্য হজ্জের সময় তিনদিন এবং গৃহে নিজ

পরিবারে প্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন রোযা রাখা ওয়াজিব। সে ইচ্ছা করিলে কুরবানীর পূর্বে উক্ত তিনটি রোযা রাখিতে পারে অথবা আইয়ামে তাশরীকে অর্থাৎ ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জ তারিখেও রাখিতে পারে। যেমন স্বয়ং আল্লাহ্ কুরআন মজীদে ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ

﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾.

তামাত্তো হজ্জকারী সাধ্যানুসারে পশু কুরবানী করিবে, যে ব্যক্তির জন্য সহজসাধ্য না হয়, তাহাকে হজ্জের সময়ে তিন দিন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন-এই পূর্ণ দশ দিন রোযাপালন করিতে হইবে। ইহা তাহাদের জন্য যাহারা মসজিদুল হারাম এলাকার বাসিন্দা নহে। (সূরা বাক্বারা ঃ ১৯৬)

সহীহ্ বুখারীতে হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, উভয়ই বলিয়াছেন, আইয়ামে তাশ্রীকে রোযা রাখার জন্য শুধু তাহাদিগকেই রুখ্সত দেওয়া হইয়াছে যাহারা কুরবানীর পশু সংগ্রহ করিতে অক্ষম হইয়াছে। এই হুকুম নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হইতে মরফু পর্যায়ে প্রমাণিত। আর উক্ত তিন রোযা আরাফার দিবসের পূর্বে রাখাই উত্তম- যেন হজ্জ পালনকারী আরাফার দিবসে রোযা না-রাখা অবস্থায় থাকিতে পারে। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরাফার দিবসে (৯ই যিলহজ্জ তারিখে) আরাফায় অবস্থান কালে রোযা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইহার অন্যতম কারণ ইহাও যে, ইফতার অর্থাৎ রোযা না-রাখা অবস্থায় যিক্র -আয্কার ও দোআ-দরূদ পাঠে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা যায়। উল্লিখিত তিন দিবসের রোযা পর পর এক সঙ্গে অথবা ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পৃথক ভাবেও

করা যাইবে। ঐরূপ গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর ৭ দিবসের রোযাও এক সঙ্গে রাখা জরুরী নহে, উহা একত্রে অথবা পৃথকভাবেও রাখা জায়েয। কেননা, আল্লাহ্ সুবহানাহু উহা একত্রে পর পর রাখার কোন শর্ত আরোপ করেন নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-ও কোন শর্ত লাগান নাই। পরবর্তী ৭টি রোযা গৃহে পরিবারের নিকট প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত বিলম্বিত করাই উত্তম। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ

﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾.

"আর সাত দিন যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবে অর্থাৎ রোযা রাখিবে।"

والصوم للعاجز أفضل من سؤال الملوك وغيرهم.

কুরবানী করিতে অক্ষম ব্যক্তির জন্য সুলতান বা আমীর, উমারা প্রভৃতির নিকট চাহিয়া কুরবানীর জানোয়ার যবহ করার চেয়ে রোযা রাখাই উত্তম। তবে যে ব্যক্তিকে না চাহিতেই এবং স্বীয় হৃদয়ের লোভ-লালস ছাড়াই কাহারও পৃক্ষ হইতে কোন হাদিয়া, তোহ্ফা বা উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়, তবে তাহা গ্রহণ করিতে কোন দোষ নাই-এমন কি সেই হাজী যদি হজ্জে বদলের জন্য আসে এবং তাহাকে প্রতিনিধিরূপে প্রেরক ব্যক্তি যদি তাহার প্রদত্ত অর্থে কুরবানীর পশু ক্রয়ের শর্ত আরোপ না করিয়া থাকে। আর যে সব লোক সরকার কিংবা অন্য কাহারও নিকট অন্য কোন লোকের নামে মিথ্যা-মিথ্যি কুরবানীর পশুর প্রার্থনা জানায়-তাহার এইরূপ কাজ নিঃসন্দেহে হারাম হইবে, কেননা উহা হইবে মিথ্যা বেসাতির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন, সুতরাং উহা হইবে হারাম খাওয়ার তুল্য।

عَافَانَا اللهُ وَالْمُسْلِمِيْنَ مِنْ ذٰلِكَ.

আল্লাহ্ আমাদিগকে এবং মুসলমানদের উহার পাপ হইতে অব্যাহতি দিন।

পরিচ্ছেদ-فصل

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

আম্‌র বিল মা'রূফ ওয়ান্ নাহ্‌য়ী আনিল্ মুন্‌কার এবং বাজামা'আত পাঞ্জেগানা নামাযের পাবন্দী

হাজীগণ এবং অন্যদের উপর সব চাইতে যে বড় কর্তব্য তাহা হইতেছে আম্‌র বিল্ মা'রূফ এবং নাহ্‌য়ী আনিল মুনকার অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজ হইতে নিষেধাজ্ঞার কর্তব্য সম্পাদন করা আর জামা'আতের সহিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়করণ- যে কাজের নির্দেশ আল্লাহ্ তাআলা তাঁহার পাক কুরআনে এবং তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যবানে প্রদান করিয়াছেন।

মক্কাবাসী এবং অন্যান্যদের মধ্যে অনেকেই যে তাহাদের গৃহে নামায পড়ে এবং মসজিদকে মু'আত্তাল (অনাবাদী) করিয়া রাখে, উহা তাহাদের জন্য মস্ত বড় ভুল। উহা শরীয়তের বরখেলাপ এবং উহা হইতে তাহাদিগকে নিবৃত্ত থাকা একান্ত কর্তব্য

মসজিদে পাবন্দীর সহিত নামায আদায়করণের তাকীদ এই হাদীস হইতে বিশেষভাবে অনুভূত হইবে যে, ইবনে উম্মে মাকতুম রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খেদমতে আসিয়া নিবেদন করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি অন্ধ এবং মসজিদ হইতে আমার গৃহ দূরে অবস্থিত বিধায় আমি কি জামা'আতে শরীক না হইয়া গৃহে নামায পড়ার অনুমতি পাইতে পারি? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন,

"هل تسمع النداء بالصلوة؟ قال : نعم، قال: فأجب".

তুমি কি নামাযের জন্য প্রদত্ত আযানের শব্দ শুনিতে পাও? ইবনে উম্মে মাকতুম বলিলেনঃ জী হ্যাঁ, শুনিতে পাই। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, তবে তুমি সেই ডাকে সাড়া দাও। আযান শুনিলে উহার ডাকে তোমার মত অন্ধকেও সাড়া দিয়া মসজিদে নামাযের জামা'আতে শামিল হইতে হইবে।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, لا أجد لك رخصة আমি তোমার জন্য রুখ্‌সতের কোন গুঞ্জায়েশ দেখিতে পাইতেছি না। অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আমি ইচ্ছা পোষণ করি যে, নামায শুরু করার আদেশ প্রদান করি, ফলে মুসল্লীগণ যখন নামাযের জন্য দন্ডায়মান হয়, তখন কোন একজনকে হুকুম দেই এবং সে উক্ত নামাযের ইমামতের দায়িত্ব পালন করে,

"ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار".

আর আমি সেই লোকদের নিকট গমন করি যাহারা নামাযের জন্য (মসজিদে) উপস্থিত হয় নাই এবং (জামা'আতে উপস্থিত না হওয়ার কারণে) তাহাদের গৃহে আগুন ধরাইয়া উহা পোড়াইয়া দিই।

সুনানে ইবনে মাজাহ্ এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু) কর্তৃক হাসান সনদে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ

"من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر".

"যে ব্যক্তি আযান শুনিতে পাইল এবং ন্যায়সঙ্গত ওযর ছাড়া মসজিদে আসিল না তাহার নামায সিদ্ধ হইবে না।"

সহীহ্ মুসলিমে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি আগামীকাল আল্লাহ্‌র সহিত মুসলিমরূপে সাক্ষাৎ করিতে আনন্দ অনুভব করে, তাহার উচিত যে,

فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن.

যখনই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদ্দেশ্যে আযান দেওয়া হয়, তখনই উহাতে সাড়া দিয়া উক্ত নামাযগুলির হিফাযত করা একান্ত প্রয়োজন।

নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য হিদায়াতের তরীকা সুসাব্যস্ত করিয়া দিয়াছেন, আর পাঁচ ওয়াক্ত নামায উক্ত হিদায়াতের তরীকার অন্তর্ভুক্ত। যদি তোমরা তোমাদের গৃহে নামায পড়িয়া লও, যেরূপ এই পিছাইয়া পড়া ব্যক্তি নিজের ঘরে নামায পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে সে অবস্থায়

"لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم".

তোমরা তোমাদের নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুন্নত পরিত্যাগ করিলে। আর যখনই তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নত পরিত্যাগ করিবে, তখনই তোমারা পথভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। অপর পক্ষে যে ব্যক্তি সুন্দররূপে উযূ করিয়া মসজিদসমূহের মধ্যে কোন এক মসজিদে গমন করে, সে অবস্থায় আল্লাহ্ তাঁহার প্রত্যেক পদক্ষেপে একটি করিয়া নেকী লিখিয়া দেনও একটি পদমর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং উহার বদৌলতে একটি পাপ মাফ করিয়া দেন। ইবনে মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহু) বলিয়াছেন, আর আমাদেরকে দেখিয়াছি যে, নামাযের জামা'আতে কেহই পিছাইয়া থাকিত না কেবল ঐরূপ মুনাফিক ছাড়া যাহার নেফাক সুবিদিত। ...সাহাবী আরও বলিয়াছেন যে,

"ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف".

রাসূলের যুগে মানুষের দুই বগলে হাত রেখে আনা হইত এবং তাহাকে কাতারে খাড়া করাইয়া দেওয়া হইত।

ويجب على الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله تعالى.

হাজীদের জন্য পাপ হইতে দূরে অবস্থান একান্ত প্রয়োজন

হাজীগণ এবং অন্যদের আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ বস্তু হইতে দূরে অবস্থান একান্ত জরুরী। যেমন ব্যভিচার, (সমকামিতা) চুরি, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ, ব্যবসা প্রভৃতি কার্যকলাপে ধোঁকা প্রদান, আমানতের খেয়ানত করা, নেশা হয় এমন বস্তু এবং টাখনুর গীটার নীচে কাপড় ঝুলান, অহংকার, হিংসা গীবত চুগলখুরী রিয়াকারী মুসলমানদের সম্পর্কে হাসি মশকারী করা, বেহালা-তবলা সারেংগী প্রভৃতি যন্ত্রের মাধ্যমে গান-বাজনা শ্রবণ করা, অশ্লীল গান বাজনায় ভরপুর রেডিও হারমোনিয়াম ক্যাসেট প্রভৃতির ব্যবহার, বাঘ-বকরী খেলা, তাস, জুয়া ও লটারী প্রভৃতি কাজে অংশ নেওয়া, মানুষ বা যে কোন প্রাণবান বস্তুর ছবি তোলা বা অঙ্কন করা, উহা পছন্দ করা এবং এই ধরণের অন্যান্য অবাঞ্ছিত অপকর্ম যাহা আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক যুগে এবং প্রত্যেক দেশে তাহার বান্দাদের উপর হারাম করিয়া দিয়াছেন।

এই সব হারাম কাজ হইতে বিরত থাকা অন্যদের অপেক্ষা হাজীগণের এবং মক্কার অধিবাসীদের জন্য বেশী প্রয়োজন। উহা এজন্য প্রয়োজন যে, পবিত্র মক্কায় অনুষ্ঠিত পাপ কাজের গুনাহ্ অধিক গুরুতর এবং উহার শাস্তিও বেশী ভীতিপ্রদ হইবে। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ

﴿ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾.

"আর যে ব্যক্তি হারাম সীমানায় যুলমের সাথে সাথে ইলহাদের (ধর্মদ্রোহী কাজ করার) কামনা করিবে আমি তাহাকে ভয়াবহ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাইব। (সূরা হজ্জঃ ২৫)

হারাম এলাকার ভিতর যুলমের সঙ্গে সঙ্গে ইলহাদের ইচ্ছা করিবে যে ব্যক্তি, তাহার জন্যই যখন আল্লাহ্ এইরূপ ভয়াবহ শাস্তির ওয়াদা

করিতেছেন, তখন যে ব্যক্তি সত্য সত্যই অপরাধ এবং অন্যান্য পাপ করিয়া বসিবে তখন উহার শাস্তি যে আরও কত ভয়ঙ্কর হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। নিঃসন্দেহে উহা হইবে আরও অধিক ভয়ঙ্কর , আরও বেশী ভয়াবহ। কাজেই উহা হইতে এবং সমুদয় পাপরাজি হইতে নিবৃত্ত থাকা অবশ্যকর্তব্য।

এই সব পাপাচার এবং অন্যান্য যেসব কাজকে আল্লাহ্ তাআলা হারাম করিয়াছেন তাহা হইতে সাবধানতা অবলম্বন এবং দূরে অবস্থান ব্যতীত হাজীদের জন্য হজ্জের কল্যাণ অর্জন এবং পাপসমূহের মার্জনা লাভ করা সম্ভব নয়। অপর পক্ষে যাহারা পাপ হইতে বিরত থাকে তাহাদের সম্বন্ধে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র যবানে বর্ণিত হইয়াছেঃ

"من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه."

"যে ব্যক্তি হজ্জ করিল এবং উহাতে নির্লজ্জ কোন আচরণ করিল না এবং পাপাচারে লিপ্ত হইল না, সে এমন নিষ্পাপ অবস্থায় দেশে প্রত্যাবর্তন করিল যেমন সে ছিল ঐদিন যেদিন তাহার মা তাহাকে প্রসব করিয়াছিল।"

وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء الأموات والإستغاثة بهم والنذر لهم... رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله ... وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله وهو دين مشركي الجاهلية.

"উপরোক্ত সমস্ত অবাঞ্ছিত ব্যাপারে এবং পাপরাজির মধ্যে সবচাইতে বেশি কঠোর এবং অবাঞ্ছিত অন্যায় কাজটি হইতেছে মৃত ব্যক্তিদের নিকট দোআ প্রার্থনা করা, তাহাদের নিকট ফরিয়াদ করা, তাহাদের জন্য নযর-মান্নত করা, তাহাদের জন্য পশু যবেহ করা এই আশায় যে, তাহারা ঐ আহ্বানকারীদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট শাফায়াত করিবে, অথবা উহারা তাহাদের রোগীদের আরোগ্য প্রদান করিবে,

কিংবা তাহাদের হারানো ব্যক্তিকে ফিরাইয়া দিতে সমর্থ হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি, এইগুলিই হইতেছে শির্কে আকবারের অন্তর্ভুক্ত-যাহা আল্লাহ্ তাআলা হারাম করিয়াছেন। এইগুলিই ছিল জাহেলী যুগের মুশ্‌রিকদের দ্বীন- যে দ্বীন অস্বীকার করার এবং উহা হইতে মানব সমাজকে নিবৃত্ত থাকার আহ্বান জানানোর জন্য আল্লাহ্ তাআলা যুগে যুগে রাসূলগণকে পাঠাইয়াছেন এবং কিতাবসমূহ নাযিল করিয়াছেন। সুতরাং প্রত্যেক হাজীর এবং অন্যদের অবশ্যকর্তব্য হইতেছে উহা হইতে সাবধানতা অবলম্বন ও আত্মরক্ষা করিয়া চলা। আর যদি অতীতে তাহারা শির্কের মহা অন্যায়ে লিপ্ত হইয়া থাকে তবে পূর্বকৃত সমস্ত পাপের জন্য তাহাদের উচিত আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করা এবং হজ্জের জন্য নূতন করিয়া তৈয়ার হওয়া। কারণ শির্ক সমস্ত আমলকেই বরবাদ করিয়া দেয়। যেমন আল্লাহ্ ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ

﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾.

"যদি তাহারা শির্ক করিয়া থাকে, তবে তাহারা যত কিছু আমল করিয়াছে, উহার সমস্তই বরবাদ হইয়া যাইবে।

ইহার পর শির্কে আসগারের কথা। শির্কে আসগার তথা ছোট শির্কের মধ্যে রহিয়াছে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারও কসম খাওয়া। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অথবা কা'বা শরীফ বা আমানত প্রভৃতির নামে কসম খাওয়া। ঐ একই পর্যায়ের শির্ক হইতেছে রিয়াকারী বা লোক দেখানো আমল, খ্যাতি অর্জন ও প্রচারের মোহে অথবা এই বলাঃ ماشاء الله وشئت 'যাহা আল্লাহ্ চাহেন এবং আপনি চাহেন।" অথবা এই কথা বলা যদি আল্লাহ্ এবং আপনি না থাকিতেন। অথবা এরূপ বলা "ইহা আল্লাহ ও আপনার বদৌলতে প্রাপ্ত। এইরূপ এবং এই ধরণের সব রকম শিরক কাজ ও অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিবে, এবং উহা পরিত্যাগ করার জন্য পরিবারের সকলকে, ওসীয়ত করিবে। উহা একান্ত প্রয়োজন যেমন রাসূলুল্লাহ্

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ ব্যাপারে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেনঃ

"من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك".

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারও নামে শপথ গ্রহণ করিয়াছে সে কুফরী অথবা শেরেকী কাজ করিয়াছে।" এই হাদীস সহীহ্ সনদে বর্ণনা করিয়াছেন আহমদ আবূ দাউদ ও তিরমিযী।

আর সহীহ বুখারীতে হযরত উমর (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর বর্ণনায় হাদীস উদ্ধৃত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ

"من كان حالفاً فليحلف بالله او ليصمت"

"যে ব্যক্তি কসম খাইতে চাহে সে যেন কেবল আল্লাহ্র নামে শপথ গ্রহণ করে নতুবা সে চুপ থাকে।"

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলিয়াছেনঃ

"من حلف بالأمانة فليس منا"

"যে ব্যক্তি আমানতের কসম খাইল সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" এই হাদীস সংকলন করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলিয়াছেনঃ

"أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر".

"আমি তোমাদের সম্পর্কে যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশী আশঙ্কা করি তাহা হইতেছে শির্কে আসগার।

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলঃ শির্কে আস্গার কি? فقال : الرياء তিনি বলিলেন, রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানো আমল।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলিয়াছেনঃ

"لا تقولوا ما شاء الله فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان".

"তোমরা একথা বলিও না যে, আল্লাহ্ যাহা চাহেন এবং অমুক যাহা চাহে, বরং বলঃ যাহা আল্লাহ্ চাহেন, তারপর সেইমতে অমুক যাহা চাহে।"

ইমাম নাসায়ী হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সম্মুখে আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! ماشاء الله وشئت "আল্লাহ্ যাহা চাহেন এবং আপনি যাহা চাহেন।" তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন,

"أجعلتني لله ندًا؟ بل ما شاء الله وحده".

"কী? তুমি আমাকে আল্লাহ্র শরীক বানাইলে? বরং বল, যাহা আল্লাহ্ এককভাবে চাহেন।"

وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وتحذيره أمته من الشرك الأكبر والأصغر.

উপরোক্ত সমস্ত হাদীস হইতে একথাই বুঝা যাইতেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহান তাওহীদকে সুদৃঢ় রাখার জন্য জোর তাকীদ দিয়াছেন এবং তাঁহার উম্মতকে শির্কে আক্বার এবং শির্কে আস্গার হইতে নিবৃত্ত থাকার জন্য হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। এতদ্বারা আরও বুঝা যাইতেছে, উম্মতের ঈমান নিষ্কলুষ রাখার এবং তাহাকে আযাব ও গযবে এলাহীর কারণসমূহ হইতে নিরাপদ রাখার জন্য তিনি ছিলেন অতীব আগ্রহী।

فجزاه الله أفضل الجزاء.

এজন্য আল্লাহ্ তাআলা তাহাকে সর্বোত্তম পুরস্কার প্রদান করুন। তিনি মানুষের নিকট আল্লাহ্র পয়গাম পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, তাহাদেরকে

অবাধ্যতার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তাঁহার বান্দাকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন- তাঁহাদের শুভেচ্ছা কামনা করিয়াছেন।

صلى الله عليه وسلم صلاة وسلامًا دائمين إلى يوم القيامة.

আল্লাহ্‌ ক্বিয়ামত দিবস অবধি তাঁহার প্রতি নিরন্তর দরূদ এবং শান্তি প্রেরণ করিতে থাকুন।

বিদেশাগত হাজীগণ এবং আল্লাহ্‌র শহর পবিত্র মক্কা ও রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শহর মদীনার অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা ইলমে দ্বীনে পারদর্শী তাহাদের উপর অবশ্য কর্তব্য হইতেছে যে, লোকদেরকে তাহারা আল্লাহ্‌র শরীয়ত শিক্ষা দিবেন এবং বিভিন্ন প্রকরণের শির্ক ও সেই সব পাপাচার হইতে তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন যাহা আল্লাহ্‌ তাআলা তাহাদের জন্য হারাম করিয়া দিয়াছেন। তাহারা দলীল-প্রমাণসহ সকল বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া পরিষ্কারভাবে বোধগম্য ভাষায় বুঝাইয়া দিবেন- যাহাতে তাহারা এতদ্বারা লোকদেরকে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে বাহির করিয়া আনিতে পারেন এবং এইভাবে তাহাদের উপর আল্লাহ্‌ যে তাবলীগ এবং তা'লীম তথা পয়গাম পৌছান এবং বুঝাইয়া দেওয়ার যে দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন তাহা যেন সঠিকভাবে পালন করিতে সক্ষম হন।

আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾.

"যাহাদেরকে কিতাব প্রদান করা হইয়াছিল সেই সব লোকদের নিকট হইতে যখন আল্লাহ্‌ এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলেন যে, "তোমারা লোকদের নিকট উহা বর্ণনা করিবে এবং তোমরা কিতাবের বিষয়বস্তুকে লোকদের নিকট গোপন রাখিবে না"-শেষ পর্যন্ত। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৭)

এই আয়াতের উদ্দেশ্য হইতেছে এই উম্মতের আলেম সমাজকে এই মর্মে সতর্ক করিয়া দেওয়া যে, তাহারা যেন সত্য গোপন করার ব্যাপারে আহ্‌লে কিতাব যালিমদের অনুসৃত পথে না চলে এবং এইভাবে পারলৌকিক জীবনের স্থায়ী সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়া পার্থিব জীবনের আপাত মধুর সুখ-সমৃদ্ধি বরণ করিয়া না নেয়।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলার এই বাণীও উল্লেখ্যঃ

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَي مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُوْنَ- إِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا وَأَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَأُولَئِكَ أَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴾.

"নিশ্চয় সেই সব লোক যাহারা গোপন করিয়া রাখে ঐসব দলীল এবং হিদায়াত যাহা নাযিল করিয়াছি-কিতাবে লোকদের জন্য সমস্ত বিষয় বিশদ্ভাবে বর্ণনা করার পরও-উহারাই তো সেই সব লোক যাহাদের প্রতি লা'নত করেন আল্লাহ্ তাআলা এবং লা'নত করেন অন্যান্য লা'নতকারীগণও; কিন্তু যাহারা তওবা করে পরিশুদ্ধ হয় এবং সব শুদ্ধ করে সব কথাই বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া দেয় লোকদের নিকট, তাহাদের তওবা আমি কবুল করি আর আমি হইতেছি অত্যাধিক তওবা কবুলকারী এবং করুণাময়।"(সূরা বাক্বারাঃ১৫৯-১৬০)

এতদ্ব্যতীত বহু সংখ্যক কুরআনী আয়াত এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস দ্বারা এই কথা প্রতিপন্ন হয় যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু তাআলার দিকে আমন্ত্রণ জ্ঞাপন এবং বান্দাদেরকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হইয়াছে সে দিকে পথ-প্রদর্শন অত্যন্ত নেকীর কাজ এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর ইহাই ক্বিয়ামতকাল অবধি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাহাদের অনুসারীদের অবলম্বিত পথ।

যেমন আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾.

"এবং ঐ ব্যক্তির চাইতে কথার দিক দিয়া সুন্দরতর আর কে হইতে পারে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানায় এবং সৎকাজসমূহ সম্পাদন করে, আর বলে যে, আমি হইতেছি আত্মসমর্পিত মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।" (হা-মীম সাজদাহঃ ৩৩)

﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِي أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾.

"আপনি হে রাসূল! ঘোষণা করিয়া দিনঃ ইহাই আমার তরীকা, আল্লাহ্র দিকে আমি এবং আমার অনুসারীগণ আহ্বান জানাই জ্ঞান-চক্ষে আলোকদীপ্ত পথে আল্লাহ হইতেছেন পাক-পবিত্র, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নহি।" (সূরা ইউসুফঃ ১০৮)

আর এই প্রসঙ্গে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ

"من دل على خير فله مثل أجر فاعله".

"যে ব্যক্তি কল্যাণের দিকে কাহাকেও পথ দেখায়, সেই ব্যক্তি উক্ত কাজ সম্পাদনকারীর সমান সওয়াবপ্রাপ্ত হয়।" (সহীহ মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আলী (রাযিআল্লাহু আনহু)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন,

"لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من حمر النعم".

"যদি আল্লাহ্ তোমার মাধ্যমে এক ব্যক্তিকে হিয়াদাতের পথে পরিচালিত করেন, তবে উহা তোমার জন্য একটি লাল উটনি অপেক্ষাও উত্তম।" (সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম)

এই মর্মে আরও অসংখ্য কুরআনী আয়াত ও হাদীস রহিয়াছে। আলেম সমাজ ও মুমিন বান্দাদের উচিত আল্লাহ্র পথে আহ্বানের কাজে তাঁহাদের প্রচেষ্টাকে আরও কয়েকগুণ বর্ধিত করা এবং আল্লাহ্র বান্দাকে মুক্তির পথ প্রদর্শনে আর ধ্বংসের উপায়-উপকরণগুলি হইতে নিবৃত্ত করার ব্যাপারে তাহাদের প্রচেষ্টাকে পুরাপুরিভাবে চালাইয়া যাওয়া। বিশেষ করিয়া এই যুগে যখন মানুষের প্রবৃত্তি পরায়ণতা বেশী রকম প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং ধ্বংসকর কর্মতৎপরতা আর ভ্রান্ত পথে আকর্ষণ সৃষ্টিকারী উপায়-উপকরণ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। অপরদিকে সত্যপথে আহ্বানকারীদের সংখ্যা ক্রমেই স্বল্প হইতে স্বল্পতর হইয়া উঠিতেছে এবং ইল্‌হাদ, আনাচার ও অন্যায় কাজের দিকে আমন্ত্রণকারীদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে।

"فَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ."

আর আল্লাহ্ হইতেছেন পরম সাহায্যকারী এবং মহান আর আল্লাহ্ ব্যতীত সৎকাজ সম্পাদনের কোন উপায় নাই এবং বিপদ আপদ হইতে পরিত্রাণ দানের কোন ক্ষমতা কাহারও নাই।

পরিচ্ছেদ– فصل

মক্কা হইতে বিদায়ের পূর্বে যাহা করণীয়

হাজীগণ যতদিন মক্কা মুআয্যমায় অবস্থান করিবেন, ততদিন সর্বক্ষণ আল্লাহ্র যিক্র , তাঁহার আনুগত্যবরণ এবং আমলে সালিহ করিতে থাকিবেন। ইহা ছাড়া খুব বেশি বেশি নফল নামায পড়িবেন এবং কা'বা শরীফের তওয়াফও খুব বেশী করিয়া করিতে থাকিবেন। কেননা হারাম শরীফে ভাল কাজের সওয়াব অনেক গুণ বেশি এবং খারাপ কাজের পরিণতিও অত্যন্ত গুরুতর হইয়া থাকে। ঐ একই ভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি হাজীদের খুব বেশি করিয়া দরূদ ও সালাম জানান একান্ত প্রয়োজন এবং উত্তম কাজ।

হাজীগণ যখন মক্কা মুআয্যমা হইতে বাহির হইতে চাহিবেন, তখন তাহাদের জন্য তওয়াফে 'বিদা' বা বিদায়ী তওয়াফ করা অবশ্য কর্তব্য-ওয়াজিব, যেন তাহাদের সর্বশেষ অবস্থান কালটি বায়তুল্লাহ্তেই ব্যয়িত হয়।

কিন্তু এই কর্তব্য কাজটি ঋতুবতী এবং নেফাসওয়ালীর উপর প্রযোজ্য নহে। ইহাদের জন্য বিদায়ী তওয়াফ নাই। হযরত ইবনে আব্বাসের (রাযিআল্লাহু আনহু) হাদীস এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। তিনি বলেনঃ

"أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض". متفق علي صحته.

"লোকদেরকে হুকুম দেওয়া হইয়াছে তাহাদের শেষ সময়টি যেন সমাপন হয় বায়তুল্লাহে কিন্তু হায়েযা ঋতুবতী নারীদিগকে এই বিষয়ে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে।" (বুখারী-মুসলিম)

বায়তুল্লাহ্‌কে বিদায় জানাইয়া যখন হাজীগণ মসজিদুল হারাম হইতে বাহির হইতে চাহিবে তখন সোজা মুখেই হাঁটিয়া বাহির হইবে।

"ولا ينبغي له أن يمشي القهقرى..."

বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ রাখিয়া কখনই উল্টা পায় হাঁটিয়া বাহির হইবে না। কারণ এইরূপ করা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হইতেও যেমন প্রমাণিত নহে, তাঁহার সাহাবাগণ হইতেও এরূপ করার কোন নযীর নাই। বরং উহা নবাবিষ্কৃত বিধায় সুস্পষ্ট বিদ্‌য়াত। আর বিদ্‌আত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সতর্কবাণী এইঃ

"من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".

"যে ব্যক্তি এমন কিছু কাজ করিল যাহার পিছনে আমার শরীয়তের কোন অনুমোদন নাই, উহা বাতিল।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেনঃ

"إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة"

"নেকীর উদ্দেশ্যে নব আবিষ্কৃত কাজ হইতে তোমরা দূরে অবস্থান করিও, কেননা প্রত্যেকটি (দ্বীন ইসলামে) নূতন কাজ বিদ্‌য়াত আর প্রত্যেকটি বিদ্‌য়াতই পথপভ্রষ্টতা।"

আল্লাহ্‌র নিকট তাঁহার দ্বীনের উপর কায়েম থাকার তওফীক আমরা কামনা করি। আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁহার বিরোধীদের ষড়যন্ত্র হইতে সুরক্ষিত রাখুন। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত দানশীল এবং মর্যাদাবান।

পরিচ্ছেদ– فصل

في زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.

মসজিদে নববী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যিয়ারত প্রসঙ্গে

হজ্জের পূর্বে বা পরে মদীনা মুনাওয়ারার মসজিদে নববী যিয়ারত করা সুন্নত, যেমন সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ

"صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام".

"আমার এই মসজিদে এক (ওয়াক্ত) নামায মসজিদুল হারাম ছাড়া অন্য যে কোন মসজিদে এক হাজার নামায অপেক্ষা উত্তম।"

আর আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

"صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام".

"আমার এই মসজিদে এক (রাকাত) নামায মসজিদুল হারাম ছাড়া অন্য যে কোন মসজিদে এক হাজার (রাকাত) নামায অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" (মুসলিম)

আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়র (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ

"صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا."

"আমার এই মসজিদে এক (ওয়াক্ত) নামায মসজিদুল হারাম ছাড়া অন্য মসজিদে এক হাজার (ওয়াক্ত) নামায অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর মসজিদে হারামে এক (ওয়াক্ত) নামায আমার এই মসজিদে একশত (ওয়াক্ত) নামায অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" (আহমাদ ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হিব্বান)

হযরত জাবির (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ

"صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجدي الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه."

"আমার এই মসজিদে এক (রাকাত) নামায মসজিদুল হারাম ছাড়া অন্য মসজিদে এক হাজার (রাকআত) নামায অপেক্ষা শ্রেয় আর মসজিদে হারামে এক (রাকাত) নামায অন্য মসজিদে এক লক্ষ (রাকাত) নামায অপেক্ষা শ্রেয়।" (আহমদ ও ইবনে মাজা)

এই মর্মে আরও বহু হাদীস মওজুদ রহিয়াছে। যিয়ারতকারী যখন মসজিদে নববীতে পৌঁছিবে, তখন তাহার ডান পা প্রথমে মসজিদে স্থাপন করিবে এবং এই দোআ পাঠ করিবে।

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، اللهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

"আল্লাহ্‌র নামে প্রবেশ করিতেছি আর দরূদ এবং সালাম রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি। মহান ও মহীয়ান আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাহিতেছি, আর তাঁহার মর্যাদাপূর্ণ চেহারা ও সত্তার এবং তাহার অবিনশ্বর বাদশাহীর শরণাপন্ন হইতেছি-বিতাড়িত মরদূদ শয়তান হইতে।"

হে আল্লাহ্! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দুয়ার উন্মুক্ত করিয়া দাও। ইহা সেই একই দোআ যাহা অন্য যে কোন মসজিদে প্রবেশের কালে পাঠ করিতে হয়। মসজিদে নববীতে প্রবেশের জন্য নির্দিষ্ট অন্য কোন দোআ নাই। (দোআর বাংলা উচ্চারণ ৪৩ পৃষ্ঠায়)

অতঃপর মসজিদে নববীতে দুই রাকআত নামায পড়িবে। উহাতে আল্লাহ্‌র নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের প্রিয় বস্তু তাহার নিকট চাহিবে। এই দুই রাকাআত নামায রওযা শরীফে যদি পড়া হয় তবে তাহাই উত্তম যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ

"ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة".

"আমার হুজরা এবং আমার মিম্বারের মাঝে বেহেশ্‌তের বাগিচাসমূহের মধ্যে একটি বাগিচা রহিয়াছে।"

অতঃপর উক্ত নামায (শেষে) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবর এবং তাঁহার দুই সাহাবী আবূ বকর (রাযিআল্লাহু আনহু) এবং উমার (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর কবরদ্বয় যিয়ারত করিবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবরের সম্মুখে আদবের সঙ্গে এবং বিনয় নম্রতার সাথে দন্ডায়মান হইবে। তারপর এই বলিয়া নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উদ্দেশ্যে সালাম জানাইবে।

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু,

সুনানে আবু দাউদে হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে উত্তম সনদে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ

"ما من أحد يسلم عَلَيَّ إلا رَدَّ الله عَلَيَّ روحي حتى أردَّ عليه السلام".

"যে ব্যক্তি আমার উদ্দেশ্যে সালাম পাঠায় আল্লাহ্ তাআলা আমার রূহকে আমার দেহে ফিরাইয়া দেন, ফলে আমি তাঁহার সালামের জওয়াব প্রদান করিয়া থাকি।"

যিয়ারতকারী তাহার সালামে যদি এই কথাগুলি বলেঃ

السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الله، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خِيرَةَ الله مِنْ خَلْقِهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ إِمَامَ الْمُتَّقِيْنَ، أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّيْتَ الأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الأُمَّةَ وَجَاهَدْتَ فِيْ الله حَقَّ جِهَادِهِ.

"হে আল্লাহ্র নবী! আপনার প্রতি সালাম, হে আল্লাহ্র সৃষ্টিসমূহের মধ্যে সুনির্বাচিত! আপনার প্রতি সালাম, হে নবীগণের সরদার এবং মুত্তাকীদের ইমাম! আপনার প্রতি সালাম। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি আল্লাহ্র রিসালত-পয়গাম পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, আপনি আমানত সঠিকভাবে আদায় করিয়াছেন। আপনি উম্মতকে নসীহত করিয়াছেন এবং আল্লাহ্র পথে যেরূপ জিহাদ করা প্রয়োজন সেই রূপই জিহাদ করিয়াছেন, এই সবই রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। তাহার প্রতি দরূদ প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জন্য দোআও করিবে, যেরূপ শরীয়তে দরূদ ও সালামকে একত্র করার সঠিকতা প্রমাণিত রহিয়াছে। কুরআনে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেনঃ

"يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا".

"হে মু'মিন সমাজ! তোমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি দরূদ পাঠ কর এবং সালাম জানাও।

আর আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাযিআল্লাহু আনহু) যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁহার দুই সাহাবীর প্রতি সালাম জানাইতেন তখন প্রায়শঃই এই কথাগুলির বেশী কিছু বলিতেন নাঃ

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكــــر، الســـلام عليك يا أبتاه.

"হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার প্রতি সালাম, হে আবূ বকর, আপনার প্রতি সালাম! হে পিতা আপনার প্রতি সালাম।"

এই কথাগুলি বলিয়াই তিনি সেই স্থান ত্যাগ করিতেন। এই যিয়ারত কেবলমাত্র পুরুষদের জন্যই শরীয়ত সম্মত। নারীদের জন্য কবরসমূহের যিয়ারত ঠিক নহে। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীস দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে,

"أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليــــها المســـاجد والسرج".

"তিনি কবরসমূহে নারী যিয়ারতকারীদের, উহাতে মসজিদ স্থাপনকারীদের এবং কবরে বাতি জ্বালানেওয়ালাদের লা'নত করিয়াছেন।"

মসজিদে নববীতে নামায পড়ার ও দোআ করার এবং তথায় অন্যান্য মসজিদসমূহের ন্যায় শরীয়তসম্মত কাজ করার জন্য মদীনার উদ্দেশে সফর করার সংকল্প করা নারী-পুরুষ সকলের জন্য সম্মত। এই মর্মে বহু হাদীস ইতিপূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে।

মসজিদে নববীতে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামায জামাআতের সাথে পড়া সুন্নাত। বেশী করিয়া যিক্‌র, দোআ এবং নফল নামায পড়িয়া অধিক সওয়াব হাসিলের এই সুযোগকে গণীমতরূপে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। এইভাবে বেহেশ্‌তী বাগিচা স্বরূপ রওযা শরীফে বেশী করিয়া নফল নামায পড়া অতি উত্তম কাজ। উহার ফযীলত সম্পর্কীয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীস ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছেঃ

"ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة".

"আমার গৃহ এবং আমার মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানে বেহেশ্‌তের বাগিচাসমূহের মধ্যে একটি বাগিচা রহিয়াছে।"

আর ইহা জানা কথা-যিয়ারতকারী হউক বা অন্য কেহ ফরয নামাযের বেলায় সম্মুখের দিকে আগাইয়া যাইবে এবং যথাসাধ্য প্রথম কাতারে শামিল হওয়ার চেষ্টা করিবে- যদিও তাহা মসজিদের বর্ধিতাংশেও হয়। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হইতে বিভিন্ন সহীহ হাদীসে প্রথম কাতারের প্রতি বেশী গুরুত্ব এবং উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই বাণীতে বলা হইয়াছেঃ

"لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا".

"মানুষ যদি জানিত যে আযান এবং প্রথম কাতারের মধ্যে কত ফযীলত কত সওয়াব রহিয়াছে তাহা হইলে সেই অবস্থায় লটারী করা ছাড়া প্রথম কাতারে স্থান পাওয়া সম্ভব হইত না, তখন অবশ্যই তাহারা স্থান পাওয়ার জন্য লটারী করিত।" (বুখারী ও মুসলিম)

ইহা ছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেনঃ

"تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله".

"তোমরা সম্মুখের কাতারে স্থান গ্রহণ কর এবং আমার ইকতিদা কর। আর তোমাদের পরবর্তী লোকেরা তোমাদের ইক্তিদা করিবে। মানুষ যখন নামাযে পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, তখন আল্লাহ্ও তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখেন। (মুসলিম)

আর আবূ দাউদ হযতর আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) হইতে হাসান সনদে রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ

"لايزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار."

"মানুষ যতই প্রথম কাতার হইতে পিছে পড়িয়া থাকিবে, ততই আল্লাহ্ তাআলা তাহাকে পিছনে রাখিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন।"

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার সাহাবাগণকে লক্ষ্য করিয়া আরও বলিয়াছেনঃ

"ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها."

"ফেরেশতাগণ তাঁহাদের প্রভু পরোয়ারদিগারের সম্মুখে যেরূপ কাতারবন্দী হয় তোমরা সেইরূপ কাতারবন্দী হও না কেন? সাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! ফেরেশ্তাগণ কিভাবে কাতারবন্দী হয়? তিনি বলিলেনঃ

يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف.

"তাহারা প্রথম কাতার পূর্ণ করিয়া লয় এবং প্রত্যেক কাতারে তাঁহারা পরস্পরের সহিত দালানের গাঁথুনির ন্যায় মিলিয়া দাঁড়ায়। (মুসলিম)

এই মর্মে আরও বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। এই ব্যাপারে মসজিদে নববী এবং অন্যান্য মসজিদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। মসজিদে

নববী সহ অন্যান্য সব মসজিদের জন্য প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর ফযীলত সমভাবে প্রযোজ্য। মসজিদে নববীর পরিসর বর্ধিত হওয়ার পূর্বেও এবং পরে একই হুকুম। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হইতে সহীহ্ সনদে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি তাঁহার সাহাবীগণকে কাতারের ডান দিকে দন্ডায়মান হওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন।

আর একথা সকলেরই সুনির্দিষ্টভাবে জানা যে, সাবেক মসজিদে নববীর ডান ভাগ রওযার বাহিরেই অবস্থিত ছিল। সুতরাং ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, মসজিদে নববীর প্রথম কাতার এবং কাতারসমূহের ডান অংশ রওযা শরীফের তুলনায় ফযীলতে অগ্রগণ্য। উহাতে পাবন্দীর সহিত নামায পড়া রওযা শরীফে পাবন্দীর সহিত নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম। আর যে কোন ব্যক্তি এই পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হাদীসসমূহের প্রতি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করিবে-তাহার নিকটেই এই আপেক্ষিক ফযীলতের বিষয়টি পরিষ্কার ও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। আর আল্লাহ্ হইতেছেন এই পার্থক্য অনুধাবনের তাওফীকদাতা।

ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بهـــا لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة منكرة.

অতঃপর কাহারও পক্ষে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হুজরা তথা কবরের চতুঃস্পার্শ্বস্থ লোহার রড বা জালগুলিকে স্পর্শ করা বা চুমা খাওয়া অথবা উহার তওয়াফ করা জায়েয নহে। কেননা সালাফে-সালেহীন হইতে এরূপ করার কোন নযীর উদ্ধৃত হয় নাই। বরং ইহা জঘন্য বিদ্‌আত।

ولايجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك.

"আর কাহারও পক্ষে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট কোন প্রয়োজন মিটানোর অথবা বিপদ দূর করার কিংবা

রোগমুক্তির অথবা এই ধরনের অন্য কিছুর জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপনও ঠিক নয়।"

لأن كل ذلك لايطلب إلا من الله سبحانه وطلبه من الأموات شرك بالله تعالى وعبادة لغيره سبحانه وتعالى.

"কেননা এই সব বস্তুর প্রার্থনা আল্লাহ্ সুবহানুহু তাআলা ছাড়া অপর কাহারও নিকট করা চলে না-একমাত্র তাঁহারই নিকট করিতে হয়। মৃত ব্যক্তির নিকট এইগুলির প্রার্থনা জ্ঞাপনে আল্লাহ্র সঙ্গে শেরেক করা হয় এবং ইহা গায়রুল্লাহ্র ইবাদত বৈ কিছুই নয়।"

দ্বীন ইসলামের দুইটি মূলভিত্তি

ودين الإسلام مبني على أصلين أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده والثاني أن لا يعبد إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا معنى شهادة أن لا إلا إلا الله وأن محمدًا رسول الله.

"দ্বীন ইসলাম দুইটি মূলভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। উহার প্রথমটি এই যে, এক আল্লাহ্ ভিন্ন আর কাহারও ইবাদত করা চলিবে না, আর দ্বিতীয়টি এই যে, ইবাদত একমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তরীকা অনুসারেই করিতে হইবে। বস্তুতঃ আশ্হাদু-আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্-এই কালেমা শাহাদাতের তাৎপর্য ইহাই।"

وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأنها ملك الله سبحانه فلا تطلب إلا منه.

"অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শাফায়াত চাওয়া কাহারও জন্য জায়েয নহে। কারণ শাফায়াত একমাত্র

আল্লাহ্ তাআলার অধিকারভুক্ত। সুতরাং আল্লাহ্ ছাড়া অপর কাহারও নিকট চাওয়া চলিবে না।" আল্লাহ্ তাআলা বলিয়াছেনঃ

﴿ قل لله الشفاعة جميعاً ﴾.

"হে রাসূল! তুমি বলিয়া দাও যাবতীয় প্রকারের শাফায়াত একমাত্র আল্লাহর অধিকারে।"

অতঃপর এই নিয়মে শাফায়াত চাওয়া যাইবেঃ

اللهم شفع فيّ نبيك اللهم شفع فيّ ملائكتك وعبادك المؤمنين اللهم شفع فيّ أفراطي ونحو ذلك.

"হে আল্লাহ্"! তোমার নবীকে আমার সম্পর্কে শাফায়াতকারী বানাইয়া দাও। আয় আল্লাহ্! তোমার ফেরেশ্তাগণকে এবং তোমার মু'মিন বান্দাগণকে আমার সম্পর্কে সুপারিশকারী করিয়া দাও। আয় আল্লাহ্! আমি যে সন্তান-সন্ততি নাবালেগ অবস্থায় তোমার নিকট পাঠাইয়াছি, তাহাদেরকে আমার সুপারিশকারী করিয়া দাও। অর্থাৎ আমার পক্ষে তাহাদের সুপারিশ গ্রহণ কর।"

وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء لا الشفاعة ولا غيرها سـواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء لأن ذلك لم يشرع.

"আর মৃত ব্যক্তির নিকট বস্তুতঃপক্ষে কিছুই চাওয়া যাইবে না- তাহারা নবী হন অথবা নবী ছাড়া অন্য কেহই হন। কারণ এরূপ করা শরীয়তসম্মত নহে।" কেননা মৃত ব্যক্তির কাজ তাহার মৃত্যুর সাথে সাথে ছিন্ন হইয়া যায় একমাত্র সেই কাজগুলি ছাড়া যাহা শরীয়তদাতা ব্যতিক্রম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন সহীহ মুসলিম শরীফে আবূ হুরায়রা (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريـــــة، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له."

"বনু আদম যখন মরিয়া যায় তখন তাহার সমস্ত ক্রিয়াকর্ম বন্ধ হইয়া যায়। তবে মাত্র তিনটি কাজ ছাড়া যথাঃ

"সাদকা জারিয়া-উহা নিজ হাতে করা হউক অথবা তাহার পক্ষ হইতে ওয়ারিসগণ কর্তৃক করা হউক। অথবা এমন ইল্ম যাহা দ্বারা - তাহার মৃত্যুর পরও জনগণ উপকৃত হইতে থাকে। অথবা সৎ সন্তান যে তাহার জন্য দোআ করে।

وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياتـــــه ويوم القيامة لقدرته على ذلك.

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় এবং কিয়ামত দিবসে তাঁহার নিকট শাফায়াত তলব করা বৈধ। কেননা ইহা তাঁহার অধিকারভুক্ত ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত।" কারণ তিনি কিয়ামত দিবসে অগ্রসর হইয়া তাঁহার রবের নিকট হইতে শাফায়াত তলবকারীদের জন্য শাফায়াত করিবার অধিকার লাভ করিবেন। ইহা জানা কথা যে, দুনিয়ায় তাঁহার জীবদ্দশায় শাফায়াত তলব সকলের উপর সাধারণভাবে প্রযোজ্য। অতএব এক মুসলমান তাহার অপর মুসলমান ভাইকে ইহা বলিতে পারে যে, আপনি আমার প্রভুর নিকট অমুক অমুক ব্যাপারে সুপারিশ করুন। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট আমার জন্য দোআ করুন। যাহাকে ঐ কথা বলা হইল তাহার পক্ষে তাহার উক্ত মুসলিম ভাই-এর জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দোআ চাওয়া বা সুপারিশ করা বৈধ হইবে- যদি যাচঞাকৃত বস্তু বৈধ হয়।

কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে প্রাপ্ত অনুমতি ছাড়া কেহই কাহারও জন্য সুপারিশ করিতে পারিবে না। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলিয়াছেনঃ

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ﴾.

"কে আছে এমন ব্যক্তি (আসমান-যমীনে) যে আল্লাহ্র বিনা অনুমতিতে তাঁহার নিকট সুপারিশ করিবে?"

বাকী থাকিতেছে মৃত অবস্থার কথা, উহা তো এমন এক বিশেষ অবস্থা যে অবস্থায় মৃত্যুর পূর্বে মানুষের পার্থিব জীবনের অবস্থা এবং পুনরুত্থানের পর কিয়ামত দিবসের অবস্থার কোনরূপ তুলনাই চলিতে পারে না। কেননা যে ব্যক্তি মারা গিয়াছে তাঁহার আমল বন্ধ হওয়ায় নূতন কোন আমলের সুযোগ নাই-আর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যাহা কিছু সে করিয়াছে উহার ফল সে ভোগ করিবে। তবে শরীয়তদাতা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যতিক্রম হিসাবে যে কয়েকটি সুযোগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন শুধু সেইগুলি হইতে সেই উপকার লাভ করিতে পারিবে।

وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع فـــلا يجـــوز إلحاقها بذلك.

"মৃত ব্যক্তিদের নিকট শাফায়াত তলব করা ব্যতিক্রমধর্মী বৈধ কার্যরূপে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং মৃত ব্যক্তির নিকট শাফায়াত তলব ব্যতিক্রমের আওতায় না পড়ায় উহার সহিত ইহাকে জুড়িয়া দেওয়া যায় না।" যদি কেহ বলে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তো সাধারণ মৃতের ন্যায় নন-তিনি তো কবরে জীবিত। তাহার জবাব এইঃ

لاشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حيـــاة برزخيـــة أكمل من حياة الشهداء ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة بل حياة لايعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه.

“ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার কবরে জীবিত আছেন সে জীবন বারযাখী-বধ্যবর্তীকালীন জীবন যাহা শহীদগণের বারযাখী জীবন অপেক্ষা অধিকতর পূর্ণ। কিন্তু সেই জীবন মৃত্যুও পূর্বের জীবন এবং কিয়ামত দিবসের জীবনের ন্যায় সমপ্রকৃতির নয়। প্রকৃতিগতভাবে এই তিন জীবন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ব্যতীত অপর কেহই যাহার অবস্থার ও তাৎপর্য অনুধাবন করিতে সক্ষম নয়।

এই জন্যই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এইভাবে ইহার প্রকৃতির ইঙ্গিত দিয়াছেনঃ

"ما من أحد يسلم عَلَيَّ إلا رَدَّ الله عَلَيَّ روحي حتى أردَّ عليه السلام."

“যে কোন ব্যক্তি আমার প্রতি যখনই সালাম জানায়-তখনই আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়া তাআলা আমার রূহ আমার দেহে ফিরাইয়া দেন ফলে আমি তাহার সালামের জবাব দেই।”

فدل ذلك على أنه ميت وعلى أن روحه قد فارقت جسده والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم.

অতএব এই হাদীসের দ্বারা একথাই বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত এবং ইহার দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, তাঁহার রূহ্ তাঁহার দেহ হইতে পৃথক অবস্থায় থাকে। কিন্তু তাঁহার প্রতি যখন সালাম দেওয়া হয় তখন তাঁহার রূহ্ ফিরাইয়া দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু সংঘটিত হওয়া

কুরআন ও হাদীসের দলিল দ্বারা প্রমাণিত। ইহা বিদ্বানগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত মত।

ولكن ذلك لايمنع حياته البرزخية كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية.

"কিন্তু তাই বলিয়া এই মৃত্যু তাঁহার বারযাখী-মধ্যবর্তী কালীন-জীবনে জীবিত থাকিবার পরিপন্থী নহে।" যেমন শহীদদের মৃত্যু ও তাঁহাদের বারযাখী জীবনে জীবিত থাকিবার পরিপন্থী নহে। উক্ত বারযাখী জীবন সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে।

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ﴾

"যাহারা আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হইয়াছে তাঁহাদেরকে তুমি মৃত মনে করিওনা বরং তাঁহারা জীবিত অবস্থায় আল্লাহ্র নিকট অবস্থান করিতেছে। তাঁহাদিগকে জীবিত হিসাবে খোরাক দেওয়া হইয়া থাকে।" (সূরা আলে ইমরানঃ ১৬৯)

যিয়ারত অধ্যায়ে এই মাসয়ালা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এইজন্যই করা হইল যে, এই বিষয়েই মানুষ অত্যধিক সন্দেহে পতিত হয়-তাই ইহার আলোচনার প্রয়োজন ছিল। সন্দেহে পড়িয়া মানুষ শির্ক করে এবং আল্লাহ্কে ভুলিয়া মৃতের ইবাদত করে। অতএব আমাদের জন্য ও যাবতীয় মুসলমানদের জন্য আল্লাহ্র নিকট সকল প্রকার শরীয়ত-বিরোধী রীতিনীতির অনুসরণ হইতে অব্যাহতি চাহিতেছি। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

শরীয়তের পরিপন্থী প্রতিটি অবাঞ্ছিত পথ হইতে আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং সকল মুসলমানকে রক্ষা করুন এই প্রার্থনাই তাঁহার হুজুরে ঐকান্তিকভাবে নিবেদন করি।

وأما مايفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم فهو خلاف المشروع.

কোন কোন যিয়ারতকারী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর যিয়ারতকালে তাহাদের আওয়াজ বুলন্দ করে এবং সেখানে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকে। এই ধরণের কাজ শরীয়তের সম্পূর্ণ খেলাফ। কেননা আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়া তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওয়াজের উপর উম্মতকে তাহাদের আওয়াজ বুলন্দ করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং তাঁহার সমীপে লোকদেরকে নীচু আওয়াজে নম্র গলায় কথা বলার তরগীব দিয়াছেনঃ যেমন তিনি নির্দেশ দিয়াছেনঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُــوا لا تَرفَعُوا أَصْواتَكُم فَوْقَ صَوْتِ النَّبِــــي وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُوْنَ * إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ امتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ أَجْرٌ عَظِيْم ﴾

"হে মুমিন সমাজ! তোমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কণ্ঠ স্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করিও না এবং নিজেদের পরস্পরের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল, তাঁহার সহিত সেইরূপ কথা বলিওনা। কারণ এইরূপ করিলে তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের যাবতীয় পূণ্য কর্ম নিস্ফল হইয়া যাইবে।

যাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সম্মুখে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ্ তাহাদের অন্তরকে পরিশোধিত করিয়া দেন যাহাতে তাহারা আল্লাহ্কে ভয় করিয়া সাবধান হইয়া চলিতে পারে। তাহাদের জন্য রহিয়াছে-তাহাদের ভুল ও অপরাধ সমূহের মার্জনা এবং মহা পুরস্কার।" (সূরা হুজরাত ঃ ২-৩)

আল্লাহ্র এই নিষেধাজ্ঞা ছাড়াও উপরন্তু কথা এই যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবরের নিকট দীর্ঘ সময় দাঁড়াইয়া থাকা এবং পুনঃ পুনঃ তাঁহার প্রতি সালাম জানানের আশায় তথায় অবস্থানরত থাকার ফলে লোকের ভীড় বর্ধিত হইবে এবং তাঁহার কবরের নিকটে শোরগোল বাড়িয়া যাইবে। ফলে আল্লাহ্ তাআলা উল্লেখিত স্পষ্ট অর্থবোধক আয়াতগুলিতে মুসলমানদের জন্য-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের যে নিয়ম নীতি নির্ধারণ করিয়াছেন, ইহা হইবে উহার খেলাফ।

وهو صلى الله عليه وسلم محترم حيًا حياً وميتًا فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي.

"আর একথা স্মরণযোগ্য যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থাতেই মর্যাদার পাত্র।"

সুতরাং কোন মুমিনের জন্য তাঁহার কবরের নিকট এমন কিছু করা কিছুতেই উচিত হইবে না যাহা শরয়ী আদবের পরিপন্থী।

وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره مستقبلا للقبر رافعاً يديه يدعو فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، بل هو من البدع المحدثات.

অনুরূপভাবে যিয়ারতকারী এবং অন্যান্য লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের পার্শ্বে দোআ করিবার সময় কবরের দিকে মুখ করিয়া হাত উঠাইয়া দোআ করে। এইরূপ দোআ করাও সাহাবা, তাবেয়ীন এবং সালফে-সালেহীনদের অনুসৃত আচরণের সম্পূর্ণ খেলাফ। বরং উহা এক অভিনব বিদ্আত। অথচ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া গিয়াছেনঃ

"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين مـــن بعـــدي... وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة."

"তোমরা আমার সুন্নতকে আঁকড়াইয়া ধরিও এবং আমার পরে সত্য পথে চালিত ও হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত খলীফাদের তরীকাকেও মযবূত সহকারে উহা হাতে দাঁতে ধরিয়া রাখিও। আর সাবধান! শরীয়তে নবাবিস্কৃত প্রত্যেকটি কাজ বিদ্আত এবং প্রত্যেক বিদ্আতই হইল গোমরাহী।" আবূ দাউদ ও নাসায়ী সহীহ্ সনদে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেনঃ

"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد."

"যে ব্যক্তি আমাদের দেওয়া শরীয়তের মধ্যে নতূন কোন কাজ আবিস্কার করিবে যাহা উহার অন্তর্ভুক্ত নহে, সেই সমস্ত কাজ মরদূদ। মুসলিম শরীফে পৃথকভাবে বর্ণিত আছেঃ

"من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد."

"যে ব্যক্তি শরীয়তে ইসলামীয়ার ভিতর এমন কাজ করিল যে সম্পর্কে আমাদের নির্দেশ নাই, সেই কাজ মরদূদ।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৌহিত্র হযরত হুসাইন (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর পুত্র আলী-জয়নুল আবেদীন একদা এক ব্যক্তিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের নিকট দোআ করিতে দেখিয়া ঐরূপ করিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেনঃ

"ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي رسول الله صلـــى الله عليه وسلم أنه قال لاتتخذوا قبري عيدًا ولا بيوتكم قبورًا عَلَيَّ فـــإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم."

"আমি তোমায় এমন একটি হাদীস বর্ণনা করিতেছি যাহা আমি আমার পিতা হুসাইন (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর নিকট শুনিয়াছি। তিনি আমার প্রপিতামহ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, তোমরা আমার কবরকে ঈদগাহ বানাইয়া লইও না এবং তোমাদের গৃহগুলিকে কবর বানাইও না। তোমরা যেখানে থাকিবা, সেখান হইতেই আমার উপর দরূদ ও সালাম পড়িবা, কেননা ঐখান হইতেই তোমাদের সালাম আমার নিকট পৌঁছাইবে।" এই হাদীস হাফেজ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহেদ মাকদেসী স্বীয় কিতাব 'আলমুক্তারাত'-এর রেওয়ায়েত করিয়াছেন।

وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم...،

"অনুরূপ কেহ কেহ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর মোবারকের নিকট সালাম দেওয়ার সময় দক্ষিণ হস্তকে বাম হস্তের উপর রাখিয়া বুকের উপর অথবা নীচে স্থাপন করিয়া নামাযরত মুসল্লীর মত দাঁড়ায়। এইভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে

সালাম দেওয়া বৈধ নহে। কোন রাজা-বাদশাহ, আমীর-উমরা প্রমুখকে সালাম সম্ভাষণকালে ঐভাবে দাঁড়ানোও জায়েয নহে।

لأنـــها هيئة ذل وخضوع وعبادة لاتصلح إلا لله.

"কারণ ঐরূপ মিনতি ও ভয়ভীতি সহকারে দাঁড়ানো ইবাদতের পর্যায়ভুক্ত অবস্থা যাহা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারো জন্য বৈধ নহে।" হাফেজ ইবেন হাজার (রহঃ) ফাতহুল বারী গ্রন্থে আলেমগণ হইতে একথা উল্লেখ করিয়াছেন। আর এই ব্যাপারে যাহারাই গভীরভাবে চিন্তা করিবে তাহাদের জন্য ইহা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইয়া উঠিবে- যদি তাহাদের মূল উদ্দেশ্য সালাফে-সালেহীনদের অনুসরণ হয়।

পক্ষান্তরে যাহাদের হৃদয়ে হিংসাবিদ্বেষ, প্রবৃত্তিপরায়ণতা, অন্ধ তাকলীদ এবং সালাফে সালেহীনদের তরীকার দিকে আহ্বানকারীদের প্রতি বদ্ধমূল কুধারণা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহারা আল্লাহ্র হাওয়ালা- তিনিই তাহাদের হিসাব নিবেন। আল্লাহ্ তাআলার নিকট আমাদের জন্য এবং তাহাদের জন্য হিদায়াত প্রার্থনা করি। সর্বস্থানে সর্বকাজে ও সর্ববস্তুর উপর হকের প্রতিষ্ঠাদানের তওফীক তিনি আমাদেরকে দান করুন।

ঐরূপ পূর্বোল্লিখিত বিদ্‌আতসমূহের অন্তর্ভুক্ত সেই সব কাজ যাহা কতক লোক করিয়া থাকে। যেমন দূর হইতে কবর মোবারকের দিকে মুখ করিয়া মনে মনে সালাম বা দোআ পাঠ করা। আল্লাহ্র দ্বীনে এমন কাজ করিবার আদৌ কোন অনুমতি নাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে কোন অনুমতি দেন নাই। ইমাম মালেক (রাহেমাহুল্লাহ্) এইরূপ কাজের প্রতি ঘৃণা পোষণ করিয়া বলিয়াছেনঃ

لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.

"এই উম্মতের পরবর্তীদের সংশোধন ও সেই সব কাজের মাধ্যমে সম্পন্ন হইবে, যে সব কাজের দ্বারা পূর্ববর্তীদের সংশোধন হইয়াছিল এবং তাহারা নেক্‌কার বান্দায় পরিণত হইয়াছিলেন।

আর ইহা সকলের নিকটেই সুবিদিত যে, এই উম্মতের প্রথম যুগের লোকদের যে বস্তু দ্বারা সংশোধন ও সমৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল তাহা ছিল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), তাঁহার খোলাফায়ে রাশেদীন এবং তাঁহার সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনদের অনুসৃত তরীকায় চলা। এই উম্মতের পরবর্তীগণ ঐপথ দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া এবং সেই পথ নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করিয়াই সংশোধন ও সমৃদ্ধি অর্জন করিতে পারে।

আল্লাহ্ মুসলমানদের এমন বিষয়ে তওফীক দান করুন যাহার ভিতর রহিয়াছে তাহাদের সৌভাগ্য-সমৃদ্ধি এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সম্মান ও চরম কল্যাণ।

إنه جواد كريم.

নিশ্চয় তিনি মহান দাতা, অতীব মেহেরবান।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর মোবারক যিয়ারত

বিশেষ সতর্কবাণী

ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطـــا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর মোবারক যিয়ারত করা ওয়াজিব নহে এবং হজ্জের কোন শর্তও নহে- যেমন সাধারণের মধ্যে কিছু লোক ধারণা করিয়া থাকে। বরং যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদ যিয়ারত করিবে অথবা উক্ত মসজিদের নিকটবর্তী হইবে তাহার জন্য কবর মোবারক য়িারত করা মুস্তাহাব। মদীনা হইতে বহুদূরে যাহাদের বসবাস তাহাদের জন্য শুধু কবর শরীফ যিয়ারত করিবার উদ্দেশ্যে সফর করা উচিত নহে। অবশ্য মসজিদে নববী যিয়ারত করিবার উদ্দেশ্যে সফর করা সুন্নত। যখন মদীনায় পৌঁছিয়া যাইবে তখন কবর মোবারক এবং হযরত আবূ বকর ও উমার (রাযিআল্লাহু আনহুমা)-এর কবরদ্বয়ও যিয়ারত করিবে। (বলা বাহুল্য) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবর এবং তাঁহার দুই সাহাবী হযরত আবূ বকর ও হযরত উমার (রাযিআল্লাহু আনহুমা)-এর কবরদ্বয়ের যিয়ারত মসজিদে নববীর যিয়ারতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে) বলিয়াছেনঃ

"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى."

"তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনও স্থানের জন্য সফর করা যাইবে নাঃ আল্ মসজিদুল হারাম, আমার মসজিদ-মসজিদে নববী ও মসজিদে আল-আক্সা বায়তুল মাকদেস।" এই তিন মসজিদে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বাড়ী হইতে দূর -দূরান্ত পথের সফর করা বৈধ।

ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه السلام أو قبر غيره مشروعا لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله.

"যদি তাঁহার কবর মোবারক বা অন্য কোন নবী কিংবা সম্মানিত লোকের কবর যিয়ারত করা শরীয়তে বৈধ নীতির অন্তর্ভুক্ত হইত, তাহা হইলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই উম্মতকে উহার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতেন। কেননা, তিনি ছিলেন লোকদের সর্বাধিক মঙ্গলাকাঙ্খী, সবচাইতে বেশী আল্লাহ্কে জানতেন এবং তিনি সবচাইতে বেশী তাঁর জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন। প্রত্যেক ক্ষতিকারক বস্তু ও কাজ হইতে সাবধান ও বিরত থাকিতে বলিয়াছেন।

তিনি পুরাপুরিভাবে এবং প্রকাশ্যে নবুওয়াতের পয়গাম পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। তদীয় উম্মতকে তিনি প্রতিটি কল্যাণ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং প্রত্যেক অমঙ্গল হইতে তাহাদেরকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেনঃ

كيف وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة.

ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে যে, কবর যিয়ারত আসলে সওয়াবের কাজ-কিন্তু তিনি উহার বিপরীত তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য সব কিছুর উদ্দেশ্যে-সওয়াবের আকাঙ্খায় সফর করা নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন আর সাবধানবারী উচ্চারণ করিলেন এই বলিয়া-

"لا تتخذوا قبري عيدًا ولا بيوتكم قبورًا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم."

"আমার কবরকে তোমার উৎসবস্থল বানাইও না, আর তোমাদের গৃহগুলিকে কবরস্থানে পরিণত করিও না, এবং আমার প্রতি তোমরা দরূদ পাঠ কর। কেননা তোমরা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছিয়া যাইবে।"

"অতএব রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর শরীফের জন্য দূর-দূরান্ত হইতে সফর করাকে শরীয়ত সম্মত বলার অর্থই হইতেছে উক্ত কবর শরীফকে উৎসবালয় বা মেলা-সম্মেলনের স্থান বানাইয়া লওয়া এবং হৈ-হল্লা ও বাড়াবাড়ি যে নিষিদ্ধ কাজ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিয়া যাইবে। যেমন বহু সংখ্যক লোক উহাতে যোগদান শরীয়ত সম্মত ও লাভজনক ভাবিয়া দূর -দূরান্ত হইতে যোগদান করিয়া থাকে।"

وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث فهي موضوعة كما نبه على ذلك الحفاظ كالدار قطني والبيهقي والحافظ ابن حجر وغيرهم..

"শবর যিয়ারতের জন্য সফর করিবার বৈধতা প্রমাণের জন্য যে সমস্ত হাদীস বর্ণনা করা হয় তাহার সমস্তই যয়ীফ এবং মওযূ। সুতরাং প্রামাণের অযোগ্য। ঐ রেওয়ায়েতগুলি দূর্বল বলিয়া ইমাম দারাকুত্নী, বায়হাকী, হাফেজ ইবনে হাজার প্রমুখ হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করিয়াছেন।" ইহারা সকলেই হাদীস শাস্ত্রের অভিজ্ঞ আলেম। সুতরাং ঐ সমস্ত যয়ীফ ও উমযূ হাদীস দ্বারা সহীহ হাদীসের মোকাবেলা করা আদৌ বৈধ নহে। কারণ সহীহ্ ও নিখুঁত হাদীস দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, উক্ত তিন মসজিদ ছাড়া অন্য যে কোন স্থানের সফরই নিষিদ্ধ। উক্ত মউযূ হাদীসগুলি হইতে নিম্নে কয়েকটা হাদীস পেশ করা যাইতেছে যাহাতে পাঠকবৃন্দ উহা চিনিয়া লইতে এবং উহা দ্বারা ধোঁকা খাওয়া হইতে তাহারা বাঁচিতে পারেনঃ

"من حج و لم يزرني فقد جفاني."

যে ব্যক্তি হজ্জ করিল এবং আমার কবর যিয়ারত করিল না সে আমার প্রতি যুলুম করিল।

"من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي."

যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর আমার কবর যিয়ারত করিল, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার যিয়ারত করিল।

"من زارني وزار قبر أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة."

যে ব্যক্তি একই বৎসরে আমার এবং আমার পিতা ইব্‌রাহীম (আলাইহিস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালাম)-এর কবর যিয়ারত করিল, তাহার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট আমি জান্নাতের দায়িত্ব লইব।

"من زار قبري وجبت له شفاعتي."

যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করিবে তাহার জন্য শাফায়াত করা আমার পক্ষে ওয়াজিব হইয়া যাইবে।

فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.

এই হাদীসগুলি এবং ইত্যাকার অন্যান্য হাদীসগুলির কোন একটিও সনদের দিক দিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত বলিয়া সাব্যস্ত হয় নাই।

হাফেজ ইবনে হাজার (রাহেমাহুল্লাহ্) 'তালখীসুল হাবীর' গ্রন্থে এই সমস্ত রেওয়ায়েত উল্লেখ করিবার পর বলিয়াছেনঃ

طرق هذا الحديث كلها ضعيفة وقال الحافظ العقيلي: لايصح في هذا الباب شيء.

এই হাদীসের যাবতীয় সূত্রগুলি দূর্বল। হাফেজ ওক্বায়লী (রহঃ) বলিয়াছেনঃ "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর যিয়ারত অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসগুলির একটিও সহীহ্ নহে।

وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأحاديث كلها موضوعة وحسبك به علمًا وحفظًا واطلاعًا ولو كان شيء منها ثابتًا لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه.

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) দৃঢ়ভাবে মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই ধরনের যাবতীয় হাদীস ভিত্তিহীন। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ও বিদ্যাবত্তা, অসাধারণ স্মরণশক্তি এবং সূদূরপ্রসারী দৃষ্টিই এই মন্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট। যদি এ বিষয়ে এবং উহার সপক্ষে কোন হাদীস সহীহ্ সনদে প্রমাণিত হইত, তবে সাহাবাগণ উহার প্রতি আমল করিবার জন্য সর্বাগ্রে অগ্রণী হইতেন এবং পরবর্তী লোকদেরকে উহার প্রতি আহ্বান করিয়া যাইতেন। কেননা সাহাবাগণ ছিলেন নবীদের পরে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ তাআলা তাঁহার বান্দাদের জন্য যে শরীয়ত বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারা সে সম্পর্কে অন্যদের চাইতে অধিক সংবাদ রাখিতেন এবং আল্লাহ্র বান্দাদের জন্য সর্বাধিক মঙ্গলাকাঙ্খী ছিলেন।

فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع.

অতএব সাহাবাবর্গ হইতে যখন এতদ্সম্পর্কে কোন কিছু উদ্ধৃত হয় নাই- তাই প্রমাণিত হইতেছে যে, ঐরূপ করা শরীয়তে বৈধ নহে। আর যদি সহীহ্ সনদে সাহাবাগণ হইতে কোন কিছু প্রমাণিত হয়, তবে উহা শরয়ী যিয়ারত হইবে, যাহা কেবলমাত্র কবরের জন্য সফর করার অর্থ বুঝাইবে না, মসজিদে নববীর জন্য সফরের সহিত উহা সংযুক্ত হইবে। বিভিন্ন হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য এইভাবে রক্ষিত হইবে।

والله سبحانه وتعالى أعلم.

পরিচ্ছেদ-فصل

মসজিদে কু'বা, জান্নাতুল বাকী প্রভৃতির যিয়ারত

মদীনা যিয়ারতকারীগণের জন্য মসজিদে কু'বা যিয়ারত করা এবং তথায় নামায পড়া মুস্তাহাব যেমন সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাযিআল্লাহু আনহুমা) হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ

كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبًا وماشيًا ويصلي فيه ركعتين.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পদব্রজে এবং বাহনে চড়িয়া মসজিদে কু'বা গমন করিতেন এবং তথায় দুই রাকাত নামায পড়িতেন।

সহল ইবনে হুনাইফ (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة.

যে ব্যক্তি নিজ গৃহে ওযূ করিয়া কু'বা মসজিদে উপস্থিত হইল, তারপর সেখানে নামায পড়িল, তাহার জন্য এক উমরার নেকীর সমান গণ্য পুণ্য অর্জিত হইল। ইমাম আহমদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা ও হাকেম ইহা রেওয়ায়েত করিয়াছে। শব্দগুলি ইবনে মাজাহ্ এবং হাকেমের।

ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعولهم.

(জান্নাতুল বাকী) নামে পরিচিত মদীনার মশহুর কবরস্তানে যেখানে বড় বড় সাহাবাগণ শায়িত আছেন এবং শহীদানের কবরসমূহ এবং ওহুদ পর্বতের পাদদেশে হযরত হামযা (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর কবর যিয়ারত করাও সুন্নত। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐসব কবর যিয়ারত করিতেন এবং তাহাদের জন্য দোআ করিতেন।" এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

"زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة."

"তোমরা কবর যিয়ারত কর, কারণ কবর যিয়ারত আখিরাতকে স্মরণ করাইয়া দেয়।" মুসলিম শরীফ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে কবর যিয়ারতকালে এই দোআ পড়িবার শিক্ষা দিতেনঃ

"اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ."

উচ্চারণঃ আস্সালামু আলাইকুম আহ্লাদ্দিয়ারে মিনাল-মুমেনীনা ওয়াল মুসলেমীন, ওয়া ইন্না ইনশা আল্লাহু বেকুম্লাহেকুন, নাস্আলুল্লাহা লানা ওয়া লাকামুল আফিয়াতা।

"ওহে গৃহবাসী মু'মিন মুসলিম, তোমাদের প্রতি সালাম, আমরাও ইন্শাআল্লাহ তোমাদের সহিত মিলিত হইবে। আমরা আল্লাহ্র দরবারে আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য নিরাপত্তা চাহিতেছি।" এই হাদীস রেওয়ায়েত করিয়াছেন ইমাম মুসলিম হযরত বুরায়দার পুত্র সুলায়মান হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে।

ইমাম তিরমিযী সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেনঃ

"مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالأَثَرِ."

"একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার কবরসমূহের পার্শ্ব দিয়া অতিক্রম করিবার কালে কবরবাসীদের প্রতি মুখ করিলেন- তারপর বলিলেন, আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুরি ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়ালাকুম আনতুম সালাফুনা-ওয়া নাহনু বিল আসরি।"

"হে কবরসমূহের বাসিন্দাগণ! তোমাদের প্রতি সালাম। আল্লাহ্ তোমাদেরকে এবং আমাদেরকে মাফ করুন! তোমরা পূর্ববর্তী আর আমরা পশ্চাদবর্তী।

এই সমস্ত হাদীস হইতে বুঝা যায় যে, কবর যিয়ারতের শর্য়ী উদ্দেশ্য হইল পরকালকে স্মরণ করা, মৃত ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতি ও ইহ্‌সান প্রদর্শন, তাহাদের উপকারার্থে দোআ করা এবং তাহাদের প্রতি রহম করার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট আবেদন জ্ঞাপন। অপরপক্ষে কবরের বাসিন্দার নিকট নিজের জন্য দোআ চাহিবার উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারত করা, তথায় অবস্থান করা, নিজের অভাব-অভিযোগ পূরণ বা রোগমুক্তিও জন্য দোআ করা কিংবা তাহাদের মধ্যস্থতা অথবা মর্তবার দোহাই দিয়া আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করা-এই ধরণের যিয়ারত জঘন্য বিদ্‌আত। না আল্লাহ্ উহাকে বৈধ করিয়াছেন, না তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সালাফে সালেহীন রাযিআল্লাহু আনহুমও এ ধরণের কাজ কশ্মিনকালে করেন নাই।

بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.

বরং উহা এমন একটি কাজ যাহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

"زوروا القبور ولا تقولوا هجرًا"

"তোমরা যিয়ারত কর এবং কবরস্তানে শরীয়ত বিরোধী কথা বলিও না।"

وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة

এই সমস্ত বিষয়ের পরিণাম এই যে, ঐ ধরণের উদ্দেশ্যে যিয়ারত করা হইলে উহার সমস্তই বিদ্‌আত বলিয়া পরিগণিত হইবে। তবে উহার

বিভিনন প্রকরণ, কোন কোন বিদ্‌আত শির্কেও পর্যায়ভুক্ত নয়- যেমন কবরের পার্শ্বে গিয়া আল্লাহ্‌র নিকট দোআ করা এবং মৃত ব্যক্তিকে ওসীলা করিয়া বলা-

بحق هذا الميت وجاهه

"এই মৃত ব্যক্তির যে হক তোমার কাছে আছে তাহাই ওসীলায় আমি দোআ চাহিতেছি।"

وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستغاثة بهم ونحو ذلك.

"আবার অপর কতকগুলি যিয়ারত শির্কে-আকবারের অন্তর্ভুক্ত। তাহা হইল মৃত ব্যক্তিকে ডাকা এবং তাহার নিকট সাহায্য কামনা করা বা রোগমুক্তি, দুঃখ-মুসীবত দূরীকরণ ইত্যাদিও জন্য আবেদন করা। এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বেই করা হইয়াছে।

সুতরাং তুমি হে মুসলিম! সাবধান ও হুঁশিয়ার! আল্লাহ্‌র নিকট তওফীক ও হক পথের হেদায়াত কামনা কর।

فهو سبحانه الموفق والهادي لا إله غيره ولا رب سواه.

তিনি সুবহানাহু ওয়া তাআলা তওফীকদাতা, পথ-প্রদর্শক, তিনি ব্যতীত পূঁজিবার যোগ্য কেহই নাই- তিনি ছাড়া নাই অন্য কোনও প্রভূ প্রতিপালক।

এই বিষয়ে আমি যাহা লিখাইতে চাহিতেছিলাম ইহাই উহার শেষ করা।

هذا آخر ما أردنا إملاءه والحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله وسلم على عبده ورسله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

আল্লাহ্‌র হামদ্‌ প্রথমে ও শেষে। আল্লাহ্‌ তাঁহার আশীষ বর্ষণ করুন তাঁহার বান্দা ও রাসূল এবং সৃষ্টির সেরা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপরে এবং তাঁহার পরিবার-পরিজন ও তাঁহার সাহাবাবর্গেও প্রতি আর যাহারা কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের অনুসরণ করিবেন নিষ্ঠার সহিত তাহাদের প্রতি।

أهمية الصلاة

ويليها رسائل في الوضوء والغسل والطهارة

لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)

المترجم: الداعية: أبو الكلام أزاد

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسلي

নামাযের গুরুত্ব

ও পবিত্রতা হাছিলের উপায়

রচনায়ঃ

শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছা-লিহ আল উছাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ)

অনুবাদঃ আবুল কালাম আযাদ

(লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়)

আল-সুলাই ইসলামী দা'ওয়া সেন্টার

নামাযের গুরুত্ব

মুসলমান ভাইগণ!

নিঃসন্দেহে ইসলাম "নামাযের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বকে" খুব বড় আকারে প্রকাশ করেছে, উহার আলোচনা ও তাৎপর্যকে খুব গুরুত্ব দিয়েছে এবং ইহার মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে। মনে প্রাণে কালিমা শাহাদাতকে বিশ্বাস করার পরে এই নামাযই ইসলামের রুকনসমূহের মধ্য হতে সবচেয়ে বড় রুকন। যেমন নাবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:-

"بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ انْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ". (متفق عليه)

অর্থঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিষের উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রথমঃ এই কথার স্বাক্ষ দেওয়া যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার আর কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম) আল্লাহর রাসূল।

দ্বিতীয়ঃ নামায প্রতিষ্ঠা করা। তৃতীয়ঃ যাকাত প্রদান করা।

চতুর্থঃ রামাযান মাসে রোযা রাখা।

পঞ্চমঃ ক্বাবা শরীফে যেয়ে হজ্জ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

১। নামায সকল প্রকার ইবাদতের মূল বা মা এবং আনুগত্য প্রকাশের সর্বোত্তম মাধ্যমঃ আর এ জন্যেই যথা সময়ে নামায আদায় করার জন্য, যথাযথভাবে নামাযকে সংরক্ষণ করার জন্য এবং নামাযকে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কুরআন ও হাদীছ থেকে বহু স্পষ্ট দলীল এসেছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

﴿ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الوُسْطَى﴾ (البقرة:٤٣)

অর্থঃ তোমরা যথাযথভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে এবং বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযকে সংরক্ষণ কর। (সূরা বাকরা:২৩৮)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেনঃ

﴿وَأَقِيْمُوْا الصَّلاَةَ وَآتُوْا الزَّكَوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ﴾ (البقرة:٤٣)

অর্থঃ তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত আদায় কর, আর রুকুকারীদের সাথে রুকু কর। (সূরা বাক্বরা:৪৩)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেনঃ

﴿إِلاَّ الْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَائِمُوْنَ﴾ (المعارج: ٢٢-٢٣)

অর্থঃ তবে তারা ব্যতীত, যারা নামায আদায়কারী। যারা তাদের নামাযে সার্বক্ষণিক কায়েম থাকে। (সূরা আল মাআরিজ:২২-২৩)

২। দুনিয়া ছেড়ে সর্বোত্তম বন্ধু মহান আল্লাহ্ তা'আলার ডাকে সাড়া দেওয়ার পূর্ব মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ- সাল্লাম) তাঁর উম্মতের জন্য সর্বশেষ যে অছীয়্যত করে গেছেন, তা হলোঃ

"اَلصَّلاَةُ اَلصَّلاَةُ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ" (ابو داود، وصححه الألباني)

অর্থঃ নামায, নামায এবং তোমাদের অধীনস্ত দাস-দাসীদের অধিকার আদায় করবে। (আবূ দাউদ, আলাবানী উহাকে ছহীহ বলেছেন)

৩। নামাযই হলো সর্বোত্তম আমলঃ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) কে সর্বোত্তম আমল কোনটি? এ প্রশ্ন করা হলে- তিনি উত্তর দিয়েছিলেনঃ

"اَلصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا" অর্থঃ সময়মত নামায পড়া।

৪। নামায হ'ল পবিত্রতা অর্জন করার এবং ক্ষমা পাওয়ার নদীস্বরূপ।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرايتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا" (متفق عليه)

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ- সাল্লাম) বলেছেনঃ যদি তোমাদের মধ্যহতে কারো বাড়ির পার্শ্বে প্রবাহমান নদী থাকে, আর সে যদি ঐ নদীতে দৈনিক পাঁচবার গোছল করে, তাহলে কি তার শরীরে কোন ময়লা বাকী থাকবে? উত্তরে ছাহাবীরা বললেন, তার শরীরে কোন ময়লা বাকী থাকবে না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ- সাল্লাম) বললেনঃ এটা হ'ল পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার দৃষ্টান্ত। যার দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা বান্দার গুনাহ-খাতাহ মিটিয়ে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৫। নামায হ'ল বান্দার গুনাহ-খাতাহ মাফের কাফ্ফারা স্বরূপঃ এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ- সাল্লাম) বলেছেনঃ

"اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَالَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ" (رواه مسلم)

অর্থঃ "(একজন মুমিন বান্দার জন্য) পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং এক জুমু'আ হ'তে অন্য জুমু'আর মধ্যকার ছাগীরাহ গুনাহ

সমূহের কাফ্‌ফারাহ স্বরূপ, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ মুমিন বান্দাহ কাবীরাহ গুনাহের সাথে জড়িত না হবে।"

৬। দুনিয়ায় বান্দার নিরাপত্তা দানকারী এবং সংরক্ষণকারী হলো নামাযঃ এ প্রসঙ্গে জনাব রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেনঃ

"مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِيْ ذِمَّةِ اللهِ" (رواه مسلم)

অর্থঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামায (জামা'আতের সাথে) পড়ল সে সারাদিন আল্লাহর নিরাপত্তায় থাকল। (মুসলিম)

৭। আল্লাহ তা'আলা এই নামাযের বিদিনময় বান্দাহকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর অঙ্গীকার করেছেনঃ এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ- সাল্লাম) বলেছেনঃ

"خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئاً إِسْتِخْفَافاً بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ" ... (رواه أبو داود والنسائي وهو صحيح)

অর্থঃ আল্লাহ তাআলা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে বান্দার উপর ফরয করে দিয়েছেন। অতএব যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্য হতে কো'ন কিছুকে হালকা বা ছোট মনে করে নষ্ট করবে না বা ছেড়ে দিবে না। বরং উহার হুকুম- আহকামগুলি যথাযথভাবে আদায় করবে। তাহলে এর বিনিময়ে আল্লাহর নিকট তার জন্য এই চুক্তি নির্ধারিত হবে যে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (আবূ দা'উদ ও নাসায়ী, হাদীসটি সহীহ)

৮। কিয়ামতের দিন বান্দার তরফ থেকে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হবেঃ এ প্রসঙ্গে জনাব রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেনঃ

"أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ" (رواه الطبراني وهو حسن)

অর্থঃ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথমে মুমিন বান্দার নামাযের হিসাব নেওয়া হবে। কাজেই মুমিন বান্দার নামাযের হিসাব সঠিক হলে তার বাকী আমল সমূহের হিসাব ও সঠিক হবে। আর তার নামাযের হিসাব সঠিক না হলে বাকী সমস্ত আমলের হিসাব সঠিক হবে না। (তাবারানী, হাসান হাদীছ)

৯। মুমিন বান্দার নামায হল জ্যোতি সমতুল্যঃ

এ প্রসঙ্গে জানব রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেনঃ "اَلصَّلَاةُ نُوْرٌ" (رواه مسلم)

অর্থঃ নামায হ'ল বান্দার জন্য জ্যোতি সমতুল্য।

১০। এই নামায হ'ল বান্দাহ এবং রবের মাঝে পরস্পর কথা বলার মাধ্যমঃ এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হাদীসে কুদসীতে বলেছেনঃ

"قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى: حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ".... الحديث (رواه مسلم)

অর্থঃ আমি নামাযকে বান্দাহ্ এবং আমার মাঝে দুইভাগে ভাগ করে নিয়েছি। আমার বান্দার জন্য উহাই যা সে আমার কাছে চায়। অতএব বান্দাহ যখন বলে, সমস্ত প্রসংশা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ আমার বান্দা আমার প্রসংশা করল ---- হাদীসের শেষ পর্যন্ত। (মুসলিম)

১১। নামায বান্দাহকে জাহান্নামের আগুন হ'তে নিরাপত্তা দিয়ে থাকেঃ এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ- সাল্লাম) বলেছেনঃ

"لَنْ يَلِجَ النَّارَ اَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا يَعْنِىْ الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ" (رواه مسلم)

অর্থঃ যে ব্যক্তি সূর্য উঠার আগে এবং সূর্য ডুবার আগে অর্থাৎ ফজর ও আছরের নামায যথাযথভাবে আদায় করল- সে কস্মিনকালেও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না । (মুসলিম)

১২। নামায বান্দাহকে কুফর এবং শির্ক থেকে নিরাপত্তা দিয়ে থাকেঃ এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেনঃ

"اِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ" (رواه مسلم)

অর্থঃ নিশ্চয়ই একজন মুমিন বান্দাহ এবং শিরক ও কুফরের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী হলো এই নামায। (মুসলিম)

১৩। জামা'আমের সাথে ফজর ও ইশার নামায আদায় করলে মুনাফিকী থেকে বাঁচা যায়ঃ এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেনঃ

'لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلُ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا' (متفق عليه)

অর্থঃ ফজর এবং ইশার নামায যথাযথভাবে আদায় করা মুনাফিকদের জন্য সবচেয়ে ভারী ও কষ্টকর ব্যাপার। ঐ দুই ওয়াক্ত নামাযের ভিতর কি মহিমা লুকায়িত আছে, তা যদি ঐ মুনাফিকরা জানত? তাহলে তারা প্রয়োজনে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও ঐ ফজর ও ইশার জামা'আতে শরীক হত। (বুখারী ও মুসলিম)

১৪। জামা'আতের সাথে নামায পড়া রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) এর অভ্যাসঃ

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মুসলমান অবস্থায় পরকালীন জীবনে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত লাভ করে আনন্দিত হ'তে চায়- সে যেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য যখনই মাসজিদে আযান দেওয়া হয় তখনই ঐ সমস্ত নামাযগুলি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে, আদায় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নাবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) কে সুনানুল হুদা অর্থাৎ হিদায়াতের প্রতীক বা হিদায়াতের মাপকাঠি হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। যে সমস্ত মানুষেরা নামাযে জামা'আতে শরীক না

হয়ে নিজেদের বাড়িতে নামায পড়ে, তোমরাও যদি তাদের মত জামা'আতে শরীক না হয়ে তোমাদের ঘরেই নামায পড়! তাহলে তোমরা তোমাদের নাবীর সুন্নাতকে পরিত্যাগ করলে! আর তোমরা যদি তোমাদের নাবীর সুন্নাতকে পরিত্যাগ কর, তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে। আর যে ব্যক্তি খুব সুন্দরভাবে পবিত্রতা অর্জন করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করার জন্য মাসজিদের দিকে অগ্রসর হলো- আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির জন্য প্রতিকদমের বা প্রতিধাপের বিনিময়ে একটা করে নেকী দান করবেন, একটা মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন এবং একটা করে গুনাহ মাফ করে দিবেন। এরপর হাদীছের বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আমি বিশেষভাবে আমাদের মাঝে লক্ষ্য করেছি যে, আমাদের মধ্য হতে যারা মুনাফিক হিসাবে পরিচিত ছিল, শুধুমাত্র তারাই নামাযের জামা'আত হতে পিছিয়ে থাকত।

নামাযের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণঃ (الإستعداد للصلاة)

হে মুসলিম ভাই!

১। আপনি আযান শুনার পরেই দেরী না করে তাড়াতাড়ি মাসজিদে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করুন।

২। আপনি যে সমস্ত কাজে মাশগুল আছেন, আযান শুনার পরেই সে সমস্ত কাজ ছেড়ে দিন। কেননা আল্লাহ মহান সকল প্রকার বস্তু ও কাজ হতে।

৩। আপনি সর্বদা পবিত্র অবস্থায় থেকে আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন।

৪। আপনি খুব সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গভাবে উজু করুন, নামায পড়ার জন্য খুব বেশী বেশী মাসজিদে যাতায়াত করুন এবং এক ওয়াক্তের নামায পড়ার পরে পরবর্তী নামায পড়ার জন্য অপেক্ষায় থাকুন।

৫। বিনয় ও নম্রতা হ'ল নামাযের প্রাণ, কাজেই বিনয় ও নম্রতা সহকারে নামায পড়ুন।

৬। নামায চলা অবস্থায় ইমাম সাহেব কুরআন মাজিদ হ'তে যে সমস্ত আয়াত পাঠ করেন। সে সমস্ত আয়াতের মর্মার্থ বুঝবার ও অনুধাবন করার চেষ্টা করুন।

৭। নামাযে রত অবস্থায় এদিক সেদিক তাকানো হ'তে বিরত থাকুন। যেমন ডানে, বামে, আকাশের দিকে, ঘড়ির দিকে তাকানো ইত্যাদি এবং অনর্থক শরীরের পোশাক-পরিচ্ছদ ঠিকঠাক করা বা নাড়াচাড়া করা হ'তে বিরত থাকুন। কেননা এ সমস্ত কাজ নামাযের খুশু-খুযূ (একাগ্রতা) নষ্ট করে দেয়।

৮। রাতে ইশার নামাযের পরেই বিশেষ কোন প্রয়োজন ছাড়া পবিত্র অবস্থায় তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ুন, যাতে করে অতিসহজেই ফজরের জন্য ঘুম থেকে উঠতে পারেন।

৯। আপনি নফল নামাযগুলি, আর বিশেষ করে বিতরের নামায যথাযথভাবে আদায় করুন। আর অন্তত দুই রাকা'আত করে

হ'লেও রাত্রে তাহাজ্জুদ নামায পড়ুন।

১০। সর্বদা প্রথম কাতারে নামায পড়ার জন্য আপনি সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করুন, আর নামাযের পরে নির্দ্ধারিত যিকির-আযকার, দু'আ-দরূদগুলি ঠিকমত না পড়ে মাসজিদ হ'তে বের হবেন না।

উযূ, গোসল ও নামায (اَلْوُضُوْءُ وَالْغُسْلُ وَالصَّلَاةُ)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

সমস্ত প্রসংশা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক। অতঃপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) এর প্রতি, যিনি সর্বশেষ নাবী, মুত্তাকীনদের ইমাম এবং সমস্ত সৃষ্টিজীবের নেতা। এমনিভাবে দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর সমস্ত পরিবার ও পরিজন এবং সমস্ত ছাহাবীদের প্রতি। আল্লাহর প্রসংশা এবং নাবীর প্রতি দরূদ পাঠ করার পরে আল্লাহ তা'আলার প্রতি মুখাপেক্ষী বান্দা শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছলেহ আল -উছাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, "উযূ,গোসল ও নামায সংক্রান্ত বিষয়ে অতিসংক্ষেপে এই পুস্তিকাটি কুরআন ও হাদীছের আলোকে লিখে পাঠকদের খিদমতে পেশ করা হ'ল।"

উযুর বিবরণ (الوضوء)

উযূ: ইহা অপরিহার্য পবিত্রতা অর্জন করার অন্যতম একটি মাধ্যম। যার দ্বারা ছোট ছোট নাপাকী যেমন- পেশাব, পায়খানা, বায়ূ বের হওয়া, গভীর নিদ্রা যাওয়া ও উটের গোশত খাওয়া ইত্যাদি কাজ থেকে পবিত্রতা অর্জন করা যায়।

উযূর পদ্ধতিঃ (كيفية الوضوء)

১। প্রথমে মনে মনে নিয়্যত করবে। মুখে উচ্চারণ করে নিয়্যত পড়ার কোন প্রয়োজন নেই । কেননা নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উযূ করার প্রথমে, নামায শুরু করার প্রথমে এমনিভাবে অন্যান্য ইবাদত শুরু করার প্রথমে মুখে উচ্চারণ করে কখনোই নিয়্যত পড়েননি। আর মানুষ কোন মুহূর্তে কোন বিষয়ে মনে মনে কি সংকল্প করে, মহান আল্লাহ তা'আলা তা সব কিছুই জানেন। সেহেতু মানুষের অন্তরের ভিতরকার বিষয়সমূহ জোরে জোরে মুখে উচ্চারণ করে আল্লাহকে শুনানোর কোন প্রয়োজন নেই।

২। অতঃপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলে উযূ শুরু করবে।

৩। এরপর দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করবে।

৪। এরপর মুখের ভিতর তিনবার পানি ঢুকিয়ে তিনবার কুলি করবে, এমনিভাবে নাকের দুই ছিদ্রের ভিতর তিনবার পানি ঢুকিয়ে দিয়ে ভাল করে নাক ঝেড়ে ফেলবে।

৫। এরপর পুরো মুখমন্ডল তিনবার ভাল করে ধৌত করবে। মুখমন্ডলের সীমা হলো - প্রস্তে এক কানের লতি হ'তে দ্বিতীয় কানের লতি পর্যন্ত, আর দৈর্ঘে উপরে মাথার চুলের গোড়া হ'তে চিবুকের নিচাংশ পর্যন্ত।

৬। অতঃপর দুই হাতের আঙ্গুল সমূহের মাথা হ'তে দুই কনুই পর্যন্ত তিনবার ভাল করে ধৌত করবে। আর ধৌত করার সময় প্রথমে ডান হাত এবং পরে বাম হাত ধৌত করবে।

৭। এরপর পুরো মাথা মাত্র একবার মাসাহ করবে। মাথা মাসাহ করার নিয়ম হলো - প্রথমে দুই হাত পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিবে, এরপর দুই হাতের আঙ্গুলগুলি মাথার সম্মুখে চুলের গোড়ার উপরে রেখে পরে চুলের উপর ঘেষে নিয়ে একেবারে মাথার পিছন দিকে চুলের গোড়ার উপর রেখে, পরে এমনি ভাবে দুই হাত মাথার পিছন হ'তে পুনরায় চুলের উপর দিয়ে ঘেষে নিয়ে মাথার সম্মুখভাগের চুলের গোড়া পর্যন্ত নিয়ে যাবে।

৮। এরপর দুই কান মাত্র একবার মাসাহ করবে।
কান মাসাহ করার নিয়ম হলোঃ প্রথমে দুই আঙ্গুলি পানি দ্বারা ভিজিয়ে নিবে, এরপর দুই হাতের দুই শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা দুই কানের ভিতরের অংশ এবং দুই হাতের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা কানের বাহিরের অংশ মাসাহ করবে।

৯। এরপর দুই পায়ের আঙ্গুলগুলির মাথা হ'তে টাখনু পর্যন্ত ভাল করে তিনবার ধৌত করবে। প্রথমে ডান পা পরে বাম পা ধৌত করবে।

গোসলের বিবরণ (الْغُسْلُ)

গোসলঃ ইহা অপরিহার্য পবিত্রতা অর্জন করার অন্যতম একটি মাধ্যম। যার দ্বারা হায়েয ও জানাবাত এ ধরনের বড় নাপাকী হ'তে পবিত্রতা অর্জন করা যায়।

গোসল করার পদ্ধতিঃ (كَيْفِيَّةُ الْغُسْلِ)

১। গোসল করার জন্য মনে মনে নিয়্যত করবে। মুখে উচ্চারণ করে নিয়্যত পড়ার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ ইহা বিদ'আত।

২। এরপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে বলবে "বিসমিল্লাহ।"

৩। এরপর পূর্ণভাবে উযূ করবে। তবে দুই পা সর্বশেষে অর্থাৎ গোসলের কাজ সমাধা কারার পরে ধৌত করবে।

৪। এরপর মাথার উপর পানি ঢালবে, অত:পর পুরো মাথা যখন পানিতে ভিজে যাবে, তখন মাথার উপর কমপক্ষে আরো তিনবার পানি ঢালবে।

৫। এরপর সমস্ত শরীর ভাল করে ধৌত করবে।

তায়াম্মুমের বিবরন ঃ (التيمم)

তায়াম্মুমঃ তায়াম্মুম অপরিহার্য পবিত্রতা অর্জনের তৃতীয় মাধ্যম। যা উযূ ও গোসলের পরিবর্তে পবিত্র মাটির দ্বারা সম্পাদন করা হয়। উযূ ও গোসলের জন্য যখন পানি পাওয়া যাবে না অথবা পানি থাকা সত্বেও পানি ব্যবহারে যখন অক্ষম হবে শুধুমাত্র তখনই তায়াম্মুমের দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ হবে।

তায়াম্মুম করার পদ্ধতিঃ (كيفية التيمم)

উযূ অথবা গোসল যখন যার পরিবর্তে তায়াম্মুম করবে তখন সে অনুযায়ী নিয়্যত করবে। অর্থাৎ তায়াম্মুম যদি উযূর পরিবর্তে হয়, তাহলে প্রথমেই তার নিয়ত করবে, আর যদি গোসলের পরিবর্তে হয় তাহলে প্রথমেই তার নিয়্যত করবে।

নামাযে অপছন্দনীয় কার্যাবলী

(اشياء مكروهة في الصلاة)

১। নামাযে মাথা এবং চক্ষুকে এদিক -ওদিক ফিরানো নিষেধ এবং উপরে আকাশের দিকে তাকানো পরিস্কার হারাম।

২। নামাযের ভিতরে বিনা প্রয়োজনে নড়া-চড়া করা এবং অনর্থক কোন কাজ করা নিষেধ।

৩। নামাযের ভিতর অনর্থক কোন ভারী জিনিষ সঙ্গে রাখা, এমন ধরনের কোন রঙ্গীন কাপড়- চোপড় পরিধান করা এবং এমন রঙ্গীন জায়নামায বা নামাযের পাটিতে নামায পড়া, যার ফলে চক্ষু বা দৃষ্টি বার বার ঐ রংবেরঙের কাপড়ের দিকে ধাবিত হয়। নামাযের ভিতর এসবই নিষিদ্ধকাজ।

৪। নামাযের ভিতরে বা বাহিরে উভয় অবস্থায় দই পার্শে কোমারের উপর দুই হাত রেখে দাড়ানো নিষেধ।

নামায ভঙ্গকারী বস্তুসমূহঃ (اشياء مبطلة للصلاة)

১। ইচ্ছাকৃতভাবে নামাযের ভিতর কথা বললে নামায নষ্ট হয়ে যায়, যদিও কথার পরিমাণ কম হোক না কেন।

২। সমস্ত শরীর সহকারে ক্বিবলার দিক থেকে ডানে বামে মুখ ফিরালে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

৩। পিছনের রাস্তা দিয়ে বাতাস বের হলে এবং আর যে সমস্ত কারণ দেখা দিলে উযূ ও গোসল করা ওয়াজিব হয়- সে সমস্ত কারণ দেখা দিলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

৪। বিনা প্রয়োজনে একাধিকবার নড়াচড়া করলে নামায নষ্ট হয়ে যায়।

৫। নামাযের ভিতর হাসলে নামায নষ্ট হযে যায়, যদিও হাসির পরিমান কম হোক না কেন।

৬। নামাযের ভিতর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে রুকু, সিজদা, দাড়ানো ও বসা এ সমস্ত কাজের মধ্য হতে কোন একটি বেশী করা হয়, তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

৭। নামাযের ভিতর ইচ্ছাকৃতভাবে ইমাম সাহেবের আগে আগে রুকু, সিজদা, উঠা-বসা, তাকবীরে তাহরীমা বলা,ও সালাম ফিরানো। এ সমস্ত কাজের মধ্য হতে কোন একটি করলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

নামাযে সাহু সিজদার কতিপয় বিধানঃ

(من أحكام سجود السهو في الصلاة)

১। যখন কোন নামাযী ব্যক্তি তার নামাযের ভিতর ভুল করল, যেমন সে নামাযের ভিতর হয়ত রুকু, সিজদা, দাড়ানো ও বসা এগুলির মধ্য হতে কোন একটি অতিরিক্ত করে ফেলল , তাহলে প্রথমে সে নামাযের জন্য দুই দিকে সালাম ফিরাবে এরপর ভুলের জন্য দুই সিজদা করে পুনরায় দুই দিকে সালাম ফিরাবে। উদাহরণঃ কোন ব্যক্তি যোহরের নামায পড়তে যেয়ে ভুল করে পঞ্চম রাকাআতের জন্য দাড়িয়ে গেল। অতঃপর এ ভুলের কথা তার স্মরণ হ'ল অথবা কেউ স্মরণ করিয়ে দিল, তখন সে তাকবীর ছাড়াই দাড়ানো হ'তে ফিরে যেয়ে বসে পড়বে এবং শেষ বৈঠকের তাশাহ্হুদ, দরূদ শরীফ ও দু'আ মাছুরা এ সমস্ত পড়ে দুই দিকে সালাম ফিরাবে। অতঃপর ভুলের জন্য সিজদা দিয়ে পুনরায় সালাম ফিরাবে। এমনি ভাবে নামায হতে ফারেগ

হওয়ার পরে যদি তার ভুল বুঝতে পারে তাহলে প্রথমে সে তার ভুলের জন্য দুই সিজদা দিয়ে পরে সালাম ফিরাবে।

২। যখন কোন নামাযী তার নামায শেষ করার আগেই ভুল করে সালাম ফিরিয়ে দিবে, অতঃপর অল্প সময়ের ভিতর তার এ ভুলের কথা সে নিজেই স্মরণ করল অথবা অন্য কেউ তাকে স্মরণ করিয়ে দিল, এমতাবস্থায় সে তার আদায়কৃত প্রথম নামাযের উপর হিসাব করে বাকী নামায পূর্ণ করে নিবে। অতঃপর সালাম ফিরাবে। এরপর নামাযে ভুলের জন্য দুই সিজদা দিয়ে পরে সালাম ফিরাবে।

উদাহরণঃ কোন ব্যক্তি যোহরের নামায পড়তে যেয়ে ভুল করে চতুর্থ রাকা'আত না পড়ে তৃতীয় রাকা'আত পড়েই সালাম ফিরিয়ে দিয়েছে। অতঃপর যখন তার এ ভুলের কথা স্মরণ হবে অথবা কেউ তাকে স্মরণ করিয়ে দিলে তখন সে এসে চতুর্থ রাকা'আত পূর্ণ করে দুই দিকে সালাম ফিরাবে। অতঃপর সে ভুলের জন্য দুই সিজদা দিয়ে পুনরায় দুই দিকে সালাম ফিরাবে। আর যদি নামায শেষ করার অনেক পরে তার এ ভূলের কথা স্মরণ হয় , তহলে সে ঐ নামায প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুনরায় পড়ে নিবে।

৩। যদি কোন নামযী ব্যক্তি ভুল করে নামাযে প্রথম তাশাহ্হুদ অথবা নামাযের ওয়াজিব বিষয়াবলীর মধ্য হতে কোন একটি ছেড়ে দেয় তাহলে সে তার ভুলের জন্য সালাম ফিরানোর পূর্বেই দুটি সিজদা দিয়ে দিবে, এ ব্যাপারে তার আর কিছু করতে হবে

না। তবে শর্ত হ'ল ঐ নামাযী ব্যক্তি যদি তার ঐ নামাযের স্থান পরিত্যাগ করার আগেই ঐ ভুলের কথা স্মরণ হয়- তাহলে সে সালাম ফিরানোর আগেই ভুলের জন্য দুই সিজদা করে নিলে হয়ে যাবে। তার আর কিছুই করতে হবে না। আর যদি ঐ নামাযের স্থান পরিত্যাগ করার পরে এবং নিম্ন বর্ণিত অবস্থার পুবেই ঐ নামাযী ব্যক্তির উক্ত ভুলের কথা স্মরণ হয় তাহলে পূর্বের ন্যায় সালাম ফিরানোর আগেই ভুলের জন্য দুটি সিজদা দিতে হবে।

উদাহরণঃ যখন কোন নামাযী ব্যক্তি ভুলবশত: তার নামাযের প্রথম তাশাহ্হুদ ছেড়ে দিয়ে তৃতীয় রাকাআতের জন্য পূর্ণভাবে দাড়িয়ে যাবে- তখন সে তাশাহ্হুদ পড়ার উদ্দেশ্যে দাড়ানো থেকে বসার দিকে ফিরে আসবে না। বরং এজন্য সে সালাম ফিরানোর পূর্বে ভুলের জন্য দুই সিজদা দিবে। আর যদি অবস্থা এমনটি হয় যে ঐ নামাযী ব্যক্তি তাশাহ্হুদ পড়ার জন্য
বসেছিল, কিন্তু সে তাশাহ্হুদ পড়তে ভুলে গিয়েছে।
অতঃপর এই ভুলের কথা তার দাড়ানোর পূর্বেই স্মরণ হয়েছে- তাহলে এমতাবস্থায় সে তাশাহ্হুদ পড়ে নামায পূর্ণ করে নিবে, এ ব্যাপারে তাকে আর কিছু করতে হবে না। এমনিভাবে ঐ নামাযী ব্যক্তি যদি ভুল করে তাশাহ্হুদ ছেড়ে দিয়ে দাড়িয়ে যায় এবং না বসে আর যদি তার পূর্ণভাবে দাঁড়ানোর পূর্বেই এ ভুলের কথা স্মরণ হয়, তাহলে সে দাঁড়ানো হ'তে বসার দিকে ফিরে গিয়ে তাশাহ্হুদ পড়ে নামায পূর্ণ করে নিবে। তবে উলামাগণ উল্লেখ করেছেন যে, ঐ ব্যক্তি ভুলের জন্য দুই সিজদা

দিবে, কেননা সে নামাযের ভিতর অতিরিক্ত কিছু করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিল। সঠিক ব্যাপার একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন।

৪। যখন কোন নামাযী ব্যক্তি তার নামাযের ভিতর রাকা'আতের সংখ্যায় সন্দেহপোষণ করবে- যেমন সে এক রাকা'আত না দুই রাকাআত নামায পড়েছে। অথবা দুই রাকাআত না তিন রাকা'আত নামায পড়েছে? কোনটাই স্থির করতে পারছে না। এমতাবস্তায় সে কমের উপর দৃঢ় বিশ্বাস করে নামায পূর্ণ করে নিবে। এরপর সালাম ফিরানোর পূর্বেই ভুলের জন্য দুইটি সিজদা দিয়ে পরে সালাম ফিরাবে।

উদাহরণঃ কোন নামাযী ব্যক্তি যোহরের নামায পড়তে যেয়ে সন্দেহের ভিতর পড়ে গেল যে, সে কি দ্বিতীয় রাকাআত পড়েছে না তৃতীয় রাকাআত? কোনটাই তার কাছে স্পষ্ট হচ্ছে না। এমতাবস্থায় সে দ্বিতীয় রাকা'আত ধরে নিয়ে তার বাকী নামায পূর্ণ করবে। অতঃপর সালাম ফিরানোর পূর্বেই ভুলের জন্য দুই সিজদা দিয়ে পরে সালাম ফিরাবে।

৫। যখন কোন নামাযী ব্যক্তি তার নামাযের ভিতর সন্দেহ পোষণ করল যে, সে কি দুই রাকা'আত নামায পড়েছে না তিন রাকা'আত? তখন এই দুইটি সংখ্যার মধ্য হতে যে সংখ্যাটি তার নিকট প্রাধান্য লাভ করবে- সেই সংখ্যার উপর ভিত্তি করে বাকী নামায পূর্ণ করে নিবে, চাই ঐ প্রাধান্য প্রাপ্ত সংখ্যাটি কম হোক অথবা বেশী। এরপর দুইদিকে সালাম ফিরানোর পরে ভুলের জন্য দুই সিজদা দিয়ে পুনরায় দুইদিকে সালাম ফিরাবে।

উদাহরণঃ যখন কোন নামাযী ব্যক্তি যোহরের নামায পড়তে যেয়ে দুই রাকাআত পড়ার পর সন্দেহের ভিতর পড়ে গেল যে, এটা কি তার দ্বিতীয় রাকা'আত, না তৃতীয় রাকা'আত নামায? এরপর এটা তার ধারনায় তৃতীয় রাকাআত হিসাবে প্রাধান্য পেল। এমতাবস্থায় সে উহাকে তৃতীয় রাকাআত গন্য করে বাকী নামায পূর্ণ করে দুইদিকে সালাম ফিরাবে। অতঃপর ভুলের জন্য দুই সিজদা দিয়ে পুণরায় দুই দিকে সালাম ফিরাবে।

আর নামাযী ব্যক্তি নামায থেকে ফারিগ হওয়ার পরে যদি এ ধরণের সন্দেহের ভিতর পতিত হয়, তাহলে একান্ত পক্ষে দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া ঐ সন্দেহের দিকে লক্ষ্য করবে না। আর যদি কেহ নামাযের ভিতর এ ধরণের অধিক সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়, তাহলে সে এ সমস্ত সন্দেহের প্রতি লক্ষ্য করবে না। কারণ নামাযের ভিতর অধিকাংশ সন্দেহ শয়তানের প্ররোচনার কারণে হয়ে থাকে।

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

كيفية صلاة النبي ﷺ

لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (رحمه الله)

مفتى عام المملكة العربية السعودية سابقاً

المترجم: الداعية: أبو الكلام أزاد

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسلي

নাবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের

নামায পড়ার পদ্ধতি

রচনায়:

শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ)

সাবেক প্রধান মুফতী, সাউদী আরব।

অনুবাদঃ আবুল কালাম আযাদ

(লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়)

আল-সুলাই ইসলামী দা'ওয়া সেন্টার

بسم الله الرحمن الرحيم

আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি মেহেরবান ও দয়ালূ।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ"

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা সেভাবেই নামায পড়, যেভাবে তোমরা আমাকে নামায পড়তে দেখ। (বুখারী)

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের) এ কথার অনুসরণ করে যে সমস্ত মুসলমান ভাই ও বোনেরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের নামাযের মত নামায পড়তে আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাদের প্রতি শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায রাহিমাহুল্লাহের পক্ষ থেকে আবেদন।

১। প্রথমে উযূ করার জন্য মনে মনে নিয়্যাত বা সংকল্প করতে হবে, এরপর বিসমিল্লাহ বলে পূর্ণাঙ্গভাবে উযূ করতে হবে, যেভাবে উযূ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন।

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (المائدة:٦)

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামায পড়ার ইচ্ছা পোষণ করবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডলকে এবং তোমাদের দু'হাতকে কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে। এরপর মাথা মাসাহ করবে, আর তোমাদের দুপা টাখনুসহ ধৌত করবে। (সূরা মায়িদাঃ৬) আর নাবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম

বলেছেনঃ "لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ"

অর্থঃ পবিত্রতা ব্যতীত নামায কবুল হয় না।

২। এরপর মুছল্লী বা নামাযী ব্যক্তি দুনিয়ার যে কোন প্রান্তে থাকুক না কেন, ক্বিবলার দিকে অর্থাৎ কাবা শরীফের দিকে এমন ভাবে মুখ ফিরিয়ে দাড়াবে,যেন তার সমস্ত শরীরও কাবা শরীফের দিকে ফিরে থাকে । আর নামাযী ব্যক্তি ফরয অথবা নফল যে নামায পড়তে ইচ্ছা করে, সে অনুযায়ী মনে মনে সংকল্প করবে। তবে এই নিয়্যত বা সংকল্প মুখে মুখে উচ্চারণ করতে হবে না। কারণ নিয়্যত মুখে মুখে উচ্চারণ করা শরীয়ত সম্মত নয়। কেননা নাবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম, এমনকি ছাহাবা কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) ও এই নিয়্যত মুখে মুখে উচ্চারণ করেননি । অতএব মুখে মুখে উচ্চারণ করে নিয়্যত পড়া বিদ'আত। আর নামাযী ব্যক্তি ইমাম হোক বা একাকী হোক, নামায পড়ার সময় তার সামনে সুতরা বা আড়াল কায়েম করতে হবে এবং সেদিকে ফিরে তাকে নামায পড়তে হবে। কেননা নাবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম নামাযীর জন্য সুতরা কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৩। এরপর নামাযী ব্যক্তিকে সশব্দে "আল্লাহু আকবার" (অর্থঃ আল্লাহ মহান) তাকবীরে তাহরীমা বলতে হবে। আর নামাযী ব্যক্তির দৃষ্টিকে সব সময় সিজদার স্থানে রাখতে হবে।

৪। তাকবীর বলার সময় দুই হাত দুই কাঁধ বরাবর অথবা দুই কানের লতি বরাবর উঠাতে হবে।

৫। দুই হাতকে সিনা বা বুকের উপর এমনভাবে রাখতে হবে, যেন ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপরে থাকে। ইহা অ-য়িল

ইবনু হুজর এবং কুবায়ছা ইবনু হালব আত্তায়ী (রাযিআল্লাহু আনহুমা) এর বিশুদ্ধ বর্ণিত হাদীছ অনুযায়ী।

৬। এরপর প্রাথমিক দু'আ অর্থাৎ সানা পড়া সুন্নাত। উহা হলোঃ-

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

উচ্চারণঃ "আল্লহুম্মা বা-ইদ বাইনী অ-বায়না খাত্বা-য়া-য়া কামা বাআদতা বায়নাল মাশরিক্বি অল-মাগরিবি। আল্লাহুম্মা নাক্বক্বিনী মিন খাত্বা-য়া-য়া, কামা ইউনাক্ক্বাছ ছাওবুল আবয়াযু মিনাদ-দানাসি। আল্লা-হুম্মাগসিলনী মিন খাত্বা-য়া-য়া বিল-মা-য়ি অছ-ছালজি অল-বারদি।"

অর্থঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমার এবং আমার গুনাহের মাঝে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও, যেমন ভাবে তুমি পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে দুরত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছ। হে আল্লাহ! তুমি আমার পাপসমূহ হ'তে আমাকে এমনভাবে পবিত্র কর, যেমন ভাবে সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিস্কার করা হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহ সমূহকে পানির দ্বারা, বরফের দ্বারা, শিশিরের দ্বারা ধৌত করে দাও।"

উল্লিখিত দু'আর পরিবর্তে এ দু'আও পড়া যেতে পারে।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ

উচ্চারণঃ সুবহা-নাকা আল্লাহুম্মা অ-বিহামদিকা, অ-তাবারা কাস -মুকা, অ-তা'আলা জাদ্দুকা, অ-লা-ইলাহা গায়রুকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রসংশা করার সাথে সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি। তোমার নাম পবিত্র ও বরকতময়। তোমার মর্যাদা সমুন্নত এবং তুমি ছাড়া প্রকৃত পক্ষে ইবাদতের যোগ্য আর কোন উপাস্য নেই।

অতঃপর আউযু বিল্লাহ পড়বে। أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণঃআউযু বিল্লাহি মিনাশ্-শাইত্বানির রাজীম।

অর্থঃ আমি অভিশপ্ত শয়তান হ'তে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এরপর বিসমিল্লাহ পড়বে। بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

অর্থঃ আমি পরম করুনাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। এরপর সূরা ফাতিহা পড়তে হবে, কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেনঃ ঐ ব্যক্তির নামায হবে না , যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পড়বে না। যাহেরী নামাযে অর্থাৎ যে নামাযে স-শব্দে সূরা কেরাআত পড়া হয় যেমন (ফজর, মাগরিব ও এশার নামাযে) সূরা ফাতিহা পড়ার পর স-শব্দে আমীন বলতে হবে। (আর যোহর ও আছরের নামাযে নিরবে-চুপে চুপে আমীন বলতে হবে।) এরপর কুরআন মাজীদ হ'তে সহজ সাধ্য সূরা অথবা কয়েকটি আয়াত পড়তে হবে।

৭। এরপর দুই কাঁধ অথবা দুই কান বরাবর দুই হাত উচু করে আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যেতে হবে। রুকুতে যেয়ে মাথা ও পিঠকে এক বরাবর রাখতে হবে এবং দুই হাত দ্বারা দুই হাটুকে মজবুত করে ধরে রাখতে হবে। এরপর হাতের অঙ্গুলগুলি খোলাভাবে রাখতে হবে এবং রুকুতে স্থিরতা

অবলম্বন করতে হবে। এরপর রুকুতে বলতে হবে।

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণঃ সুবহা-না- রাব্বিয়াল আযীম।

অর্থঃ আমার মহান প্রভূর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

এই দু'আ ৩ বার অথবা তিনের অধিকবার পড়া উত্তম। ইহার সাথে নিচের দু'আ পড়া মুস্তাহাব।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ

উচ্চারণঃ সুবাহা–নাকা আল্লা-হুম্মা রাব্বানা অ-বিহামদিকা আল্লা-হুম্মাগ ফিরলী।

অর্থঃ হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রভূ! তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি এবং তোমার প্রসংশা করি। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

৮। এরপর নামাযী ব্যক্তি যদি ইমাম হন অথবা একাকী হন তাহলে- سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

উচ্চারণঃ সামি আল্লা- হু লিমান হামিদাহ

অর্থঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রসংশা করে , আল্লাহ তা শ্রবণ করেন। এ দু'আ পড়তে পড়তে রুকু হ'তে উঠতে হবে এবং দুই হাত দুই কাঁধ অথবা কান বরাবর করতে হবে, এরপর সোজা হয়ে দাড়ানোর পরে বলতে হবে-

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْداً كَثِيْراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيْهِ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

উচ্চারণঃ রব্বানা অ- লাকাল হামদু , হমদান কাছীরান ত্বইয়্যিবাম মুবা-রাকান ফীহ, মিলআস সামাওয়াতি অ-মিল আল

আরযি অ-মা বাইনাহুমা অ-মিলআমা-শি'তা মিন শাইয়িন বা'আদু।

অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার জন্যেই সমস্ত প্রশংসা। তোমার অসংখ্য প্রশংসা যা পবিত্র ও বরকতময়। সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদ্‌ভয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত স্থান তোমার প্রশংসায় ভর্তি। এর পরেও যে সমস্ত বস্তু তুমি ইচ্ছা পোষণ কর, তা পরিপূর্ণ তোমার প্রশংসা।

এরপরে যদি নিম্নের দু'আটি পড়া হয়, তাহলে আরো ভাল হয়-

أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ. اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

উচ্চারণঃআহ্‌লাছ্-ছানা-য়ি অল-মাজদি আহাক্কু মা-ক্বালাল আবদু, অ-কুল্লুনা লাকা আব্দুন, আল্লা-হুম্মা লা-মা-নি'আ লিমা আ'ত্বাইতা অ-লা মু'ত্বিয়া লিমা-মানা'তা অ-লা য়ানফাউ যাল-জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

অর্থঃ হে প্রশংসা ও প্রশস্তি এবং মাহাত্ম ও বুযুর্গীর অধিকারী আল্লাহ! তোমার প্রশংসার শানে যে কোন বান্দা যা কিছু বলে তুমি তার চাইতেও বেশী উহার হকদার। আমরা প্রত্যেকেই তোমারই বান্দা। হে আল্লাহ! তুমি যাকে যা দান কর, তা কেহই বন্ধ করতে পারে না। আর তুমি যাকে বঞ্চিত কর, তাকে কেহই দান করতে পারে না। আর কোন সম্মানী ও বিত্তশালী ব্যক্তির উচ্চ পদমর্যাদা ও ধন-সম্পদ তোমার শাস্তি হতে তাকে কোনক্রমেই রক্ষা করতে পারে না। এ দু'আ পড়া উত্তম, কেননা ছহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) থেকে

ইহা প্রমাণিত হয়েছে। তবে নামাযী ব্যক্তি যদি মোক্তাদী হন তাহলে রুকু হতে মাথা উঠানোর পর বলবেন।

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْداً كَثِيْراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيْهِ.

উচ্চারণঃ রাব্বানা অ-লাকাল হামদ --- শেষ পর্যন্ত।

আর ইমাম ও মোক্তাদী প্রত্যেককেই রুকু হ'তে উঠার পরে পুনঃরায় বুকের উপরে হাত বাধা ভাল যেমনভাবে ওয়ায়েল ইবনু হুজর, সাহাল ইবনু সা'আদ রাযিআল্লাহু আনহুমা হতে বির্ণত রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) এর হাদীস দ্বারা ইহা প্রমাণিত।

৯। এরপর আল্লাহু আকবার বলে সিজদা করতে হবে।

যদি সহজ সাধ্য হয় তাহলে সিজদায় যাওয়ার সময় দুই হাত মাটিতে রাখার পূর্বে দুই হাটু মাটিতে রাখতে হবে। আর যদি ইহা কষ্টকর হয় তাহলে দুই হাটু মাটিতে রাখার পূর্বে দুই হাত মাটিতে রাখতে পারবে। হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলি সব সময় ক্বিবলামুখী রাখতে হবে এবং হাতের আঙ্গুলগুলি মিলিত ও বিছায়ে রাখতে হবে। সিজদা ৭ অঙ্গের উপরে ভর করে করতে হবে; যেমন কপাল, নাক, দুই হাত, দুই হাটু এবং দুই পায়ের আঙ্গুল সমূহের পেটসমূহ। আর সিজদায় পড়তে হবে-

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى

উচ্চারণঃ সুবহা-না- রাব্বিয়াল আ'লা।

অর্থঃ আমি আমার প্রভূর পবিত্রতা বর্ণনা করি , যিনি উচ্চ মর্যাদাশীল। আর এই দু'আ ৩ বার অথবা তিনের অধিকবার

পাঠ করতে হবে। এই দু'আর সাথে নিম্নের দু'আ পাঠ করাও মুস্তাহাব। سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ
উচ্চারণঃ সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা রাব্বানা অ-বিহামদিকা, আল্লা-হুম মাগফিরলী।
অর্থঃ হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রভূ! আমি তোমার প্রসংশা করার সাথে সাথে তোমার পবিত্রতাও বর্ণনা করি, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আর সিজদায় বেশী বেশী করে দু'আ করা উত্তম। কেননা নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেনঃ রুকুর ভিতর তোমারা আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ত্ব বর্ণনা কর , আর সিজদার ভিতরে খুব বেশী করে দু'আয় মাশগুল হও, কেননা তোমাদের এই দু'আ আল্লাহর দরবারে খূব দ্রুত কবুল হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) আরো বলেছেনঃ বান্দা যখন সিজদায় রত থাকে , তখন সে তার প্রতিপালকের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়। কাজেই তোমরা সিজদায় বেশী বেশী করে দু'আ করবে। (উল্লেখিত হাদীস দুটি ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর ছহীহ মুসলিম গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।) এমনিভাবে নামাযী ব্যক্তি ফরয নামাযের অথবা নফল নামাযের সিজদায় পড়ে তার নিজের জ়ন্য এবং অন্য মুসলমান ভাই বোনের জন্য ইহকাল ও পরকালের সার্বিক কল্যাণের জন্য যথাসাধ্য দু'আ করতে পারবে। সিজদায় রত অবস্থায় দুই হাতের দুই বাহুকে দুই পার্শ্বদেশ হ'তে দুরে রাখতে হবে, পেটকে দুই উরু হ'তে দূরে রাখতে হবে, দুই উরুকে দুই পা বা পিন্ডলী হ'তে দূরে রাখতে হবে এবং দুই হাত বা দুই কনুইকে যমিন হ'তে উপরে রাখতে হবে। কেননা নাবী

কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা সিজদা করা অবস্থায় বরাবর থাকবে। সাবধন! তোমাদের কেহই যেন কুকুরের মত হাত মাটিতে বিছায়ে দিয়ে সিজদা না করে।

১০। এরপর আল্লাহু আকবার বলে সিজদা হ'তে মাথা উঠাতে হবে এবং বাম পা মাটিতে বিছায়ে দিয়ে বাম পায়ের উপরে বসতে হবে, আর ডান পাকে খাড়া করে রাখতে হবে। এরপর দুই হাতকে দুই উরু ও দুই হাটুর উপরে রেখে নিম্নের দুআ পড়তে হবে।

رَبِّ اغْفِرْلِيْ ، رَبِّ اغْفِرْلِيْ، رَبِّ اغْفِرْلِيْ ، اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ، وَارْحَمْنِيْ ، وَارْزُقْنِيْ، وَعَافِنِيْ وَاهْدِنِيْ وَاجْبُرْنِيْ.

উচ্চারণঃ রাব্বিগ ফিরলী, রাব্বিগ ফিরলী, রাব্বিগ ফিরলী, আল্লা -হুম মাগফিরলী, অরহামনী, অরযুকনী,অ-আ-ফিনী, অহদিনী অ-জবুরনী।

অর্থঃ হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, (ইহা ৩বার) হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর, আমাকে জিবীকা দাও, নিরাপত্তা, হিদায়য়েত এবং ক্ষতিপুরণ দান কর। আর (দুই সিজদার মাঝখানে) এই বৈঠকে এমনভাবে স্থিরতা বা শান্তি অবলম্বন করতে হবে যেন (সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গগুলি বিশেষ করে) মেরুদণ্ডের হাড্ডিগুলি নিজ নিজ স্থানে ফিরে যায়, যেমনভাবে নামাযী ব্যক্তি রুকুর পরে ঠিক সোজা হয়ে দাড়ানোর পরে তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গগুলি স্ব-স্ব স্থানে ফিরে যায়। কেননা নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-

সাল্লাম) দুই সিজদার মাঝখানে বসে এবং রুকু করার পরে দাড়িয়ে দীর্ঘসময় স্থিরতা অবলম্বন করতেন।

১১। এরপর আল্লাহু আকবার বলে দ্বিতীয় সিজদায় যেতে হবে। আর দ্বিতীয় সিজদায় যেয়ে ঐ সমস্ত কাজ করতে হবে, যে সমস্ত কাজ প্রথম সিজদায় করা হয়েছিল।

১২। এরপর আল্লাহু আকবার বলে দ্বিতীয় সিজদা হতে মাথা উঠাতে হবে এবং দুই সিজদার মাঝখানে কিছুক্ষণ বসার ন্যায় হালকা ভাবে কিছুক্ষণ বসতে হবে। আর এই বসাকে জালসাতুল এস্তা-রাহাত অর্থাৎ বিরাম গ্রহণের বৈঠক বলা হয়। উলামাদের মতানুযায়ী উহা বিশুদ্ধতর মুস্তাহাব। তবে যদি কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে এই বৈঠক ছেড়ে দেয়, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। এই বৈঠকে আল্লাহর কোন যিকির এবং কোন দু'আ পড়তে হবে না। অতঃপর দ্বিতীয় রাকা'আতে দাড়ানোর জন্য বসা হ'তে উঠতে হবে। যদি সহজ সাধ্য মনে হয় তাহলে উঠার সময় দুই হাটুর উপর ভর দিয়ে উঠতে হবে, আর যদি ইহা কষ্টকর মনে হয়, তাহলে মাটির উপর দুই হাতে ভর দিয়ে উঠতে পারে। এরপর সূরা ফাতিহা পড়তে হবে এবং সূরা ফাতিহা পড়ার পরে কুরআন মাজীদ হ'তে সহজ সাধ্য আর কোন সূরা অথবা কয়েকটি আয়াত পড়তে হবে। এরপর প্রথম রাকা'আতে যে সমস্ত কাজ করা হয়েছিল দ্বিতীয় রাকা'আতেও ঠিক সে সমস্ত কাজ করতে হবে।

বিশেষ লক্ষণীয়: যে, নামাযের মধ্যে রুকু-সিজদা বা কোন কাজে ইমামের অতিক্রম করে মুক্তাদীদের জন্য কোন কিছু

করা কোন প্রকারেই জায়েয নয়। কেননা নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) তাঁর উম্মতদেরকে এ বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয় মুক্তাদীদের জন্য ইমাম সাহেবের সাথে সাথে কোন কাজ করাকেও তিনি অপছন্দ করেছেন। মুক্তাদীদের জন্য ইহাই করণীয় যে, ইমাম সাহেবের তাকবীর বলার শব্দ শেষ হতেই কোন প্রকার দেরী না করে ইমাম সাহেবের সমস্ত কাজ সম্পাদনের পর পরই মুক্তাদীগণ তাদের সমস্ত কাজ সম্পাদন করবেন। কেননা নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেনঃ "নিশ্চয় নামাযের জন্য ইমাম নির্ধারন করা হয়, সেই ইমামের অনুসরণ করার জন্য। কাজেই তোমরা ইমামের অনুসরণ করার ব্যাপারে কোন প্রকার আগে-পিছে করবে না। অতএব, ইমাম সাহেব যখন আল্লাহ আকবার বলবে তখন তোমরাও আল্লাহু আকবার বলবে, যখন রুকু করবে তখন তোমরাও রুকু করবে, যখন বলবে সামিআল্লা-হু লিমান হামিদাহ্ তখন তোমরা বলবে রাব্বানা অলাকাল হামদ। অতঃপর ইমাম সাহেব যখন সিজদা করবে তখন তোমরাও সিজদা করবে।" (বুখারীও মুসলিম)

১৩। আর নামায যখন দুই রাকা'আত বিশিষ্ট হবে, যেমন ফজর, জুমু'আ এবং দুই ঈদের নামায তখন দ্বিতীয় রাকা'আতের দ্বিতীয় সিজদা হ'তে মাথা উঠায়ে এমনভাবে বসতে হবে;যেন ডান পা খাড়া থাকে, আর বাম পা মাটিতে বিছানো থাকে, অর্থাৎ বাম পা মাটিতে বিছায়ে উহার উপরে বসতে হবে। অপর দিকে ডান হাতকে ডান উরুর উপরে রাখতে

হবে, আর ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুলী ব্যতীত বাকী চারটি আঙ্গুলকে বন্ধ করে বা মুষ্টিবদ্ধ করে রেখে শাহাদাত আঙ্গুলী দ্বারা তাওহীদের প্রতি ইঙ্গিত করতে হবে। আর যদি হাতের অনামিকা ও কনিষ্ঠা আঙ্গুলদ্বয় বন্ধ রেখে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় খোলা অবস্থায় রেখে শাহাদাত আঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করা হয় তাহলে ইহা উত্তম। এ দুইটি পদ্ধতি যেহেতু নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) হ'তে প্রমাণিত আছে; সেহেতু সবচেয়ে উত্তম হলো- কোন সময় এটা আর কোন সময় ওটা অর্থাৎ দুইটা পদ্ধতির উপর আমল করা। আর বাম হাতকে বাম উরু ও বাম হাটুর উপরে রাখতে হবে। অতঃপর দুই রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযের শেষ বৈঠকে নিম্নের তাশাহ্হুদ পড়তে হবে।

التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

উচ্চারণঃ আত্তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি অছ্ছালাওয়া-তু অত্তায়্যিবা-তু, আস্সালা-মু আলাইকা আয়্যূহান্ নাবিয়্যূ অরাহমাতুল্লা-হি অ-বারাকা-তুহু। আস্সালা-মু আলাইনা অ-আলা ইবাদিল্লা-হিছ ছা-লেহীন। আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অ-আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু অ-রাসূলুহু।

অর্থঃ মৌখিক ও আন্তরিক সমুদয় প্রসংশা এবং শারীরিক ও আর্থিক যাবতীয় উপাসনা কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই। হে নাবী! (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) আপনার প্রতি আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক। এমনি ভাবে

আমাদের প্রতি এবং সৎলোকদের প্রতিও শান্তি বর্ষিত হোক। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার উপাস্য নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) নিশ্চয়ই আল্লাহর একজন বান্দা ও রাসূল। (বুখারী ও মুসলিম)

অতঃপর নিচের দরূদ শরীফ পড়তে হবে-

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ছাল্লি-আলা মুহাম্মাদিও, অ-আলা আলি মুহাম্মাদিন, কামা ছাল্লাইতা আলা ইব্‌রা-হীমা, অ-আ'লা আ-লি ইব্‌রা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম-মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বা-রিক আলা মুহাম্মাদিও, অ-আলা আলি মুহাম্মাদিন, কামা বা-রাকতা আলা ইব্‌রা-হীমা, অআ'লা আ-লি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর রহমত নাযিল কর,যেমনভাবে তুমি ইব্‌রাহীম (আলাইহিছ ছালাম)এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর রহমত নাযিল করেছিলে। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) এবং তাঁর পরিবার-পজিনদের উপর বরকত নাযিল কর, যেমনভাবে তুমি ইব্‌রাহীম (আলাইহিছ ছালাতু ওয়াস সালাম) এবং তাঁর পরিবার-

পরিজনদের উপর বরকত নাযিল করেছিলে। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মানীত। এরপর আল্লাহ তা'আলার নিকট নিম্নে বর্ণিত ৪টি বস্তু হ'তে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে।

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযাবি জাহান্নাম, অমিন আযা-বিল ক্বাবরি, অ-মিন ফিতনাতিল মাহ্‌য়া অলমামা-তি, অ-মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, জাহান্নামের শাস্তি ও ক্ববরের শাস্তি থেকে। আমি তোমার নিকট আরো সাহায্য চাচ্ছি, জীবন ও মৃত্যুর ক্লেশ হ'তে এবং এক চক্ষু বিশিষ্ট কানা দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে। (বুখারী) এরপর ইহকাল ও পরকালের সার্বিক কল্যাণের জন্য যা ইচ্ছা তাই দু'আ করা যাবে। এরপরেও যদি কেউ তার পিতা-মাতার জন্য এবং অন্য মুসলমান ভাই-বোনদের জন্য দু'আ করে তাহলে কোন অসুবিধা নেই। এ সমস্ত দুআ যে কোন ফরয ও নফল নামাযের ভিতরে করা যাবে।

অতঃপর সালাম ফিরাবে এ বলেঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

উচ্চারণঃ আস্‌সালামু আলাইকুম অ-রাহ্‌-মাতুল্লাহ।

অর্থঃ আপনাদের উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক। বলে ডান দিকে ও বাম দিকে সালাম ফিরাতে হবে।

১৪। আর নামায যদি ৩ রাকা'আত বিশিষ্ট হয়, যেমন মাগরিবের নামায, অথবা যদি ৪ রাকা'আত বিশিষ্ট হয়, যেমন

যোহর, আছর ও এশার নামায। তাহলে এ অবস্থাতেই উপরে উল্লেখিত তাশাহ্হুদ পড়তে হবে এবং এই সাথে দুরূদ শরীফ পড়তে হবে। অতঃপর কোন কষ্ট না হ'লে দুই হাটুর উপর ভর দিয়ে উঠে দাড়াতে হবে। এরপর দুই হাত কাধ অথবা দুই কান বরাবর উচু করে আল্লাহু আকবার বলে দুই হাতকে নিজের বুকের উপর রেখে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। আর যদি কেহ ৩ রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযে এবং ৪ রাকা'আত বিশিষ্ট যোহরের নামাযে কোন সময় সূরা ফাতিহা ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু পড়ে তাহলে কোন অসুবিধা নেই। কেননা আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিআল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) এর হাদীস দ্বারা ইহা প্রমাণিত। অতঃপর মাগরিবের ৩ রাকা'আতের পর এবং যোহর, আছর ও এশার চতুর্থ রাকা'আতের পর শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ ও দরূদ শরীফ অবশ্যই পড়তে হবে। এবং জাহান্নামের শাস্তি হ'তে, ক্ববরের শাস্তি হ'তে, জীবন ও মৃত্যুর কষ্ট হ'তে এবং এক চক্ষু বিশিষ্ট কানা দাজ্জালের সার্বিক অনিষ্ট হ'তে আল্লাহ তা'আল্লার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে। এ ছাড়াও বেশী বেশী যে কোন দু'আ করা যাবে। যেমন-

اللَّهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

উচ্চারণঃ আল্লা- হুম্মা আ-ইন্নী আলা যিকরিকা অ-শুকরিকা অ-হুসনি ইবা-দাতিক। ইহা দুই রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় হলোঃ আবী হুমায়িদ আস্‌সায়িদী (রাযিআল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী ৩ রাকা'আত ও ৪রাকা'আত বিশিষ্ট

নামাযের শেষ বৈঠকে তাঅর্রুক করে বসতে হবে , আর তাঅর্রুক হলোঃ বাম পা ডান পায়ের নিচ দিয়ে বাহির করে মাটিতে বসতে হবে, আর এদিকে ডান পাকে খাড়া করে রাখতে হবে। এরপর আস্সালা-মু আলইকুম অ-রাহমাতুল্লাহ বলে ডান দিকে ও বাম দিকে সালাম ফিরাতে হবে। এরপর ৩বার

أَسْتَغْفِرُ اللهَ،

উচ্চারণঃ আস্তাগফিরুল্লাহ অর্থঃ "আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি" বলতে হবে এরপর নিচের দুআগুলি পড়তে হবে।

اللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আন্তাস সালা-ম, অ-মিনকাস সালাম, তাবারাকতা ইয়া যালজালা-লি অল-একরা-ম।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমিই শান্তি দাতা, তোমার নিকট হতেই শান্তি আসে, হে সম্মানীত ও মর্যাদাবান আল্লাহ! তুমি বরকতময়।

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণঃ লা- ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু, অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর।

অর্থঃ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই । তিনি একক, তার কোন শরীক নেই, তারই জন্য সমস্ত রাজত্ব ও সমস্ত প্রসংশা, আর তিনি সমস্ত বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল।

اللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা লা-মা-নিআ লিমা আত্বায়তা, অ-লা-মুত্বিয়া লিমা মানা'তা, অলা- য়ানফাউ যালজাদ্দি মিনকাল যাদ্দু, লা-হাওলা অলা-কুওঅতা ইল্লা বিল্লাহ।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি যাকে দান কর, তা কেহই বন্ধ করতে পারে না। আর তুমি যাকে বঞ্চিত কর, তাকে কেহই দান করতে পারে না। আর কোন সম্মানী ও বিত্তশালী ব্যক্তির উচ্চ পদ-মর্যাদা ও ধনসম্পদ তোমার শাস্তি হতে তাকে কোনক্রমেই রক্ষা করতে পারে না। আর একমাত্র তোমার অনুগ্রহ ছাড়া কোন ভাল কাজ করার এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার শক্তি বা ক্ষমতা আমাদের নেই। لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ.

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অলা-নাবুদু ইল্লা ইয়্যাহু, লাহুন-নি'মাতু ,অ-লাহুল ফাযলু, অ-লাহুছ ছানাউল হাসানু।

অর্থঃ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার উপাস্য নেই, কাজেই একমাত্র তাঁকে ছাড়া আমারা আর কাউকে ইবাদত করব না। আর তাঁর জন্যেই সমস্ত নি'য়ামত, সমস্ত অনুগ্রহ ও সমস্ত উত্তম প্রশংসা।

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুখলিছীনা লাহুদ্দীন, অ-লাও কারিহাল কা-ফিরূন।

অর্থঃ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার উপাস্য নেই, আমরা তাঁর এই ইসলাম ধর্মের জন্য নিবেদিত ও উৎসর্গীত;

যদিও কাফিররা উহা অপছন্দ করে। এরপর ৩৩ বার سبحان الله। সুবহা-নাল্লাহ অর্থঃ আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি। ৩৩ বার الحمد لله। আলহামদুলিল্লা-হ অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। আর ৩৩বার الله اكبر। আল্লাহু আকবার অর্থঃ আল্লাহ মহান পড়তে হবে। তাহলে ৩৩×৩=৯৯ বার পড়া হ'ল। এরপর নিম্নের দু'আটি পড়ে ১০০ বার পুর্ণ করতে হবে।

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মুলকু অ-লাহুল হামদু, অহুয়া আ'লা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থঃ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোন অংশীদার নেই , তারই জন্য সমস্ত রাজত্ব ও সমস্ত প্রশংসা, আর তিনিই সমস্ত বস্তুর উপরে একমাত্র ক্ষমতাশীল। এছাড়া প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে আয়াতুল কুরসী কুল-হুঅল্লা-হু আহাদ ক্বুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব ও ক্বুল আউযু বিরাব্বিন নাস, এসমস্ত সূরাগুলি পড়তে হবে। আর বিশেষ করে ফজর ও মাগরীবের নামাযের পরে উল্লেখিত ৩টি

সূরা প্রত্যেকটি ৩ বার করে পড়া মুস্তাহাব। ইহা নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) এর বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এমনিভাবে উপরে উল্লিখিত দু'আগুলি ছাড়াও প্রত্যেক ফজর ও মাগরিবের নামাযের পরে নিম্নের দুআটি ১০বার পড়া মুস্তাহাব, ইহা নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মুলকু অ-লাহুল হামদু, ইহয়ী অ-ইউমীতু অ-হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থঃ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, সমস্ত রাজত্ব ও সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্যে, তিনি জীবন ও মৃত্যু দাতা, আর তিনি সমস্ত বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল। আর নামাযী ব্যক্তি যদি ইমাম হন,তাহলে ডানে ও বামে সালাম ফিরায়ে নামায শেষ করে ৩ বার আসতাগফিরুল্লা-হ এবং আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম অ-মিন কাস সালাম তাবা-রাকতা য়া- যাল জালা-লি অল-এশরাম, এ দু'আ একবার পড়ে (মুক্তাদীদের দিকে ফিরে) উপরে বর্ণিত দু'আ সমূহ পড়বেন। এ সমস্ত দু'আগুলি ইমাম

মুসলিমের ছহীহ মুসলিম গ্রন্থে আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে উল্লেখিত দু'আগুলি পড়া সুন্নাত, ফরয নয়। আর প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য মুসাফির না থাকা অবস্থায় বিশেষ করে চার ওয়াক্ত ফরয নামাযের আগে ও পরে মোট ১২ রাকা'আত সুন্নাত নামায পড়া মুস্তাহাব। আর উহা হলোঃ যোহরের পূর্বে ৪ এবং পরে ২, মাগরীবের পরে ২, এশার পরে ২ এবং ফজর নামাযের পূর্বে ২, এই মোট ১২ রাকা'আত সুন্নাত নামায। কেননা নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) সর্বদা এই ১২ রাকা'আত সুন্নাত পড়তেন। আর এই ১২ রাকা'আত সুন্নাত নামাযকে সুন্নাতে রাওয়াতিব বলা হয়।

উম্মে হাবীবা (রাযিআল্লাহু আনহা) হ'তে বর্ণিত, তিনি নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) হ'তে বর্ণনা করেছেনঃ নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি দিনে ও রাতে ১২ রাকাআত নফল নামায পড়বে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করা হবে।" (মুসলিম)

উল্লেখিত হাদীসের বর্ণনার ব্যাপারে ইমাম তিরমিযী (রাহিমাহুল্লাহ) যে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, তার সংক্ষিপ্ত সার হলোঃ নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) মুক্বীম থাকা অবস্থায় ঐ ১২ রাকাআত নামায নিয়মিত পড়তেন, তবে

সফরে থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) যোহর, মাগরিব ও এশার সুন্নাত নামাযগুলি পড়তেন না, ছেড়ে দিতেন। আর সফরে থাকা অবস্থাতেও তিনি ফজর নামাযের পূর্বে ২ রাকা'আত সুন্নাত এবং বিতরের নামায পড়তেন, উহা কোন সময় ছাড়তেন না। আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের জীবন আদর্শই আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.

অর্থঃ নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের জীবন আদর্শের ভিতর তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত আছে, আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম ও আমাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন- "صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ."

অর্থঃ "তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখ, তোমরা ঠিক সেভাবেই নামায পড়।" আল্লাহই একমাত্র ভাল কাজে সাহায্যকারী বন্ধু।

পরিশেষে আমাদের নাবী মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহের প্রতি, তার পরিবার-পরিজনদের প্রতি, এবং তার ছাহাবীদের প্রতি এমনিভাবে কিয়ামত পর্যন্ত তার সকল সৎ কর্মশীল অনুসারীদের প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। আমীন

المسائل المهمة التي تتعلق بالصلاة

المؤلف: الداعية: أبو الكلام أزاد

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسلي

নামায সম্পর্কিত কতিপয়
গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলাহ

প্রণয়নেঃ আবুল কালাম আযাদ
(লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়)

আল-সুলাই ইসলামী দা'ওয়া সেন্টার

১। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের নাম শুনে নখে ও আঙ্গুলে চুমু খাওয়া বিদ'আতঃ

(تقبيل الأصابع والأظفار عند سماع اسم الرسول ﷺ بدعة)

অনেকেই আযান ও একামতের সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের নাম শুনে দুই নখে চুমু খেয়ে তা দুই চোখে স্পর্শ করে। এ ধারণা নিয়ে যে, এর দ্বারা দুচোখ সকল প্রকার রোগ-ব্যাধি হতে মুক্ত থাকবে। এ কাজ নিঃসন্দেহে বিদ'আত, আর এরূপ ধারণা করা মিথ্যা। কারণ ছহীহ্ শুদ্ধ ভাবে এর স্বপক্ষে কোন দলীল নেই।

২। পেশাবের পর কুলুখ নিয়ে চলাফেরা করা বিদ'আতঃ (المشي بأداة الإستنجاء إثر البول بدعة)

পায়খানা করার পর ঢেলা ব্যবহার করে পানি দিয়ে ধোয়ার কথা যয়ীফ হাদীছে পাওয়া যায়। কিন্তু পেশাব করার পর পানি থাকা সত্বেও কুলুখ ব্যবহার করার নির্দেশ কোন হাদীছে নেই। পুরুষাঙ্গের মাথায় কুলুখ ধরে , ১০, ২০, ৪০, ৭০, বা ১০০ কদম হাটা এবং পায়ে কাচি দেওয়া , হেলা-দুলা, ওঠা বসা ও খুব জোরে কাশি দেওয়া ইত্যাদি যা অনেক ভাইয়েরা করে থাকে। এ সব কিছুর কোন প্রমাণ হাদীছে নেই , সেহেতু ইহা বিদ'আত।

এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত আলিম মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন তোমরা

বেহায়ার মত কুলুখ নিয়ে ঘুরাফেরা করো না। (তা'লিমুদ্দীন, বাংলা৫৯পৃষ্ঠা ও ইসতিবরাহ ১ম খণ্ড ১-২ পৃঃ) আর ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেনঃ "পেশাবের পর জোরে জোরে কাশি দেওয়া, উঠা-বসা করা, জননেন্দ্রিয়ের সূরাখ দেখা ও তার মধ্যে পানি দেওয়া এসব মনের সন্দেহ আর শয়তানের ওয়াস্ওয়াসা মাত্র" (ইগাসাতুল লাহফান ১৬৮ পৃঃ, ফতোয়ায়ে শামী ১ম খণ্ড ২৪০ পৃঃ)

৩। উযূতে ঘাড় মাসাহ করা বিদ'আতঃ

(مسح الرقبة في الوضوء بدعة)

উযূতে মাথা ও দুকান মাসাহ করার পর দুই হাতের পিঠ দ্বারা ঘাড় মাসাহ করার কোন প্রমাণ ছহীহ হাদীছে পাওয়া যায় না। ইমাম নভবী (রাহিমাহুল্লাহ) সহ আরো অনেকেই এভাবে গর্দান মাসাহ করাকে সুন্নাতের খেলাফ তথা বিদ'আত বলেছেন।

৪। পায়ের টাখনু বা গিরার নিচে কাপড় পরা হারামঃ (إسبال الإزار محرم)

ইসলামী বিধান মতে পায়ের টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে কাপড়, প্যান্ট ও লম্বা জামা পরিধান করা পুরুষদের জন্য নামাযের বাহিরে ও ভিতরে তথা সর্বাবস্থায় হারাম। এভাবে টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরা ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের অভ্যাস। এটা মুসলমানদের সুন্নাত নয়। অথচ বর্তমান অধিকাংশ মুসলমান ভাইদের যেন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে যে, প্যান্ট পরলেই

টাখনুর নিচে তিন চার আঙ্গুল ঝুলিয়ে পরতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি অহংকারের সাথে পায়ের টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার দিকে দৃষ্টি করবেন না। আল্লাহ আমাদেরকে এহেন পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

৫। তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় দুই কান স্পর্শ করা বিদআতঃ (مسح الأذنين عند تكبيرة الإحرام بدعة)

অধিকাংশ নামাযী ভাইয়েরা তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় দুই কান স্পর্শ করে থাকেন। আর অনেকেই দুই হাত দিয়ে দুই কান কিছু সময় ধরে রেখে প্রচলিত নিয়্যত পড়তে থাকেন, এরপর তাকবীরে তাহরীমা বলেন। এই দুইটি পদ্ধতি সুন্নাতের বরখেলাফ তথা বিদ'আত। বরং দু হাত দুই কান অথবা দুই কাধ বরাবর উঠায়ে তাকবীরে তাহরীমা বলা সুন্নাত।

৬। "জায়- নামায" পাক করার দোয়া ও "নামাযের নিয়্যত" পড়া বিদ'আতঃ

(تطهير المصلى بذكر من الأذكار والتلفظ بنية الصلاة بدعة)

অনেক নামাযী ভাইয়েরা নামায শুরু করার আগে নামাযের পাটিতে দাড়িয়ে নামাযের পাটি পাক করার জন্য (ইন্নী অ-জ্জাহতু..) এ আয়াত পড়ে থাকেন। এরপর বিভিন্ন ওয়াক্তে

বিভিন্ন প্রকার নামাযের জন্য "মাকছুদুল মুমিনীন" নূরানী ক্বায়িদাহ সহ অন্যান্য বহু নামায ও দু'আ শিক্ষা বইগুলিতে বর্ণিত নামাযে কয়েক ডজন প্রচলিত নিয়্যত পড়ার পরে যেমন (নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা...) নামায শুরু করে থাকেন। (এখানে নিয়্যত শব্দটি আরবী) যার অর্থ হল সংকল্প করা। আর সংকল্প করা মানুষের অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত, মুখের সাথে স্পৃক্ত নয়। কাজেই একজন নামাযী ব্যক্তি যখন নামায পড়ার ইচ্ছা করবে, তখন সে সেই নামাযের নিয়্যত বা সংকল্প মনে মনে করে নিবে, তাকে বানাওয়াটি নিয়্যত আর মুখে মুখে উচ্চারণ করতে হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম), তাঁর ছাহাবা কেরাম (রাযিআল্লাহু আনহুম) এবং পরবর্তী সালাফে সালেহিন হতে এভাবে নামাযের পাটি পাক করা এবং মুখে উচ্চারণ করে নামাযের নিয়্যত পড়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সেহেতু ইহা পরিস্কার বিদ'আত ও নাজায়েয।

৭। তাহ্ইয়াতুল মাসজিদের দু' রাকা'আত নামায পড়া সুন্নাতঃ (تحية المسجد سنة)

অনেকেই মাসজিদে প্রবেশ করেই বসে পড়েন এবং কিছুক্ষণ বসে থাকার পরে উঠে নামায পড়াকে সুন্নাত মনে করেন। আর অনেকেই মাসজিদে প্রবেশ করে তাহ্ইয়াতুল মাসজিদ অর্থাৎ মাসজিদের সম্মানার্থে দুরাকাআত নামায

পড়াকে কোন গুরুত্ব না দিয়ে এমনি বসে পড়েন। এ দুটাই সুন্নাতের খেলাফ। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেনঃ "যখন তোমাদের কেউ মাসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সে যেন বসার আগে (মাসজিদের সম্মানার্থে) দু'রাকা'আত নামায পড়ে নেয়।" (বুখারী ও মুসলিম) এমনকি জুম'আর দিন খুৎবাহ চলা অবস্থায় মাসজিদে প্রবেশ করে প্রথমে দু'রাকা'আত নামায পড়ে পরে বসতে হবে, এটাই সুন্নাত। (বুখারী ও মুসলিম)

৮। জামা'আতের নামাযে পায়ে পা মিলিয়ে দাড়ানো সুন্নাতঃ (إلصاق القدم بالقدم في صلاة الجماعة سنة)

অধিকাংশ নামাযী ভাইয়েরা জামা'আতের কাতারে একে অপরের সাথে পায়ে পা মিলানোকে বে আদবী মনে করেন। সেহেতু তারা পরস্পর ৪/৬ আঙ্গুল ফাক রেখে কাতারে দাড়ান। ইহা হাদীছের সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ- সাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেন, "তোমরা নামাযে কাতারকে খুব সোজা কর এবং কাঁধ এক বরাবর করে মিলাও এবং প্রতি দুইজনের মধ্যবর্তী ফাক বন্ধ কর, যাতে শয়তান ফাকা জায়গায় দাড়িয়ে তোমাদের নামাযে কোন প্রকার অসওয়াসা দিতে না পারে। আর যে ব্যক্তি নামাযের কাতারে পা মিলায়, আল্লাহ তাকে কাছে টানেন, আর যে ব্যক্তি পা মিলায় না, আল্লাহ তাকে দূরে রাখেন।" (আবূ দাঊদ ও হাকেম)

৯। নামাযে বুকের উপর হাত বাধায় নারী ও পুরুষের মাঝে কোন পার্থক্য নেইঃ

(لا فرق بين الرجال والنساء في وضع اليدين على الصدر في الصلاة)

নামাযে বুকের উপর হাত বাধা সম্পর্কে অ-য়িল ইবনু হুজর থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) এর বিশুদ্ধ হাদীছ অনুযায়ী সারা বিশ্বের শাফিঈ, হাম্বলী, মালিকী মাযহাবের অনুসারী ভাইয়েরা এবং সমস্ত আহলে হাদীছ ভাইয়েরা (তাদের নারী ও পুরুষ উভয়েই) নামাযে বুকের উপর হাত বাধেন। অপর দিকে নামাযে নাভীর নিচে হাত বাধা কয়েকটি যয়ীফ হাদীছ যা দলীলের অযোগ্য, এর উপর ভিত্তি করে হানাফী মাযহাবের ভাইয়েরা নামাযে নাভীর নিচে হাত বাধেন। অথচ হানাফী ভাইদের মা ও ভগ্নীগণ তারা সবাই ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী বুকের উপর হাত বাধেন। (এ ব্যাপারে কিছু কিছু হানাফী ভাইদের মনগড়া যুক্তি হলোঃ পুরুষদের লজ্জাস্থান যেহেতু নাভীর নিচে, সেহেতু পুরুষরা নাভীর নিচে হাত বেধে তাদের লজ্জাস্থানকে হিফাযত করার চেষ্টা করবে। এমনিভাবে মহিলাদের এক বিশেষ লজ্জাস্থান যেহেতু তাদের নাভীর উপরাংশে সেহেতু তারা তাদের নাভীর উপরে অর্থাৎ বুকের উপরে হাত বেধে তাদের লজ্জাস্থানকে হিফাযত করার চেষ্টা করবে।) শুধু নামাযে বুকে হাত বাধার বিষয় নয় বরং ইসলামী শরীয়তের প্রত্যেকটা বিষয়ে যেখানে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) হ'তে স্পষ্টভাবে নির্দেশনা দেওয়া আছে সেখানে রাসূলের ঐ সুন্নাতের অনুসরণ না করে বরং তার

মোকাবিলায় এ ধরণের বানাওয়াটি, মনগড়া যুক্তি খাড়া করা এবং সেই অনুযায়ী আমল করা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) এর বিরুদ্ধাচরণেরই শামিল। যা পরিস্কার হারাম। ইসলামী শরীয়তে এ ধরনের মনগড়া যুক্তি অবতারণা করা হতে আল্লাহ আমাদেরকে হিফাযত করুন। আমীন।

১০। নামাযে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়া-জিবঃ (قراءة الفاتحة خلف الإمام واجب)

একাকী যে কোন ধরনের নামায পড়ার সময় সূরা ফাতিহা তো পড়তেই হবে। এছাড়া জামাআত বদ্ধ যেমন ফজর, যোহর, আছর, মাগরিব ,ইশা, জুমুআ ও দুই ঈদ ইত্যাদি যে কোন নামাযে ইমামের পিছনে মুক্তাদীগণকে সূরা ফাতিহা অবশ্যই পড়তে হবে। কেননা সূরা ফাতিহা না পড়লে নামায হবে না। ইহা বহু ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। যেমন (বুখারী, মুসলিম. আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী...)। এমনকি জানাযার নামায যাতে রুকু, সিজদা ও তাশাহ্হুদ কিছুই নেই, তাতেও সূরা ফাতিহা পড়তে হবে।

১১। যাহিরী নামাযসমূহে আমীন জোরে বলা সুন্নাতঃ (التأمين بالجهر في الصلوات الجهرية سنة)

যাহেরী নামাযে অর্থাৎ ফজর, মাগরিব, ইশা , জুমআ ও দুই ঈদে ইমাম সাহেবের সূরা ফাতিহা পড়ার পরে ইমাম ও মুক্তাদী সকলকেই জোরে বা সশব্দে আমীন অবশ্য অব্যশই বলতে হবে। কারণ ইহা বহু ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। যেমন (বুখারী,মুসলিম, তিরমিযী ...) কাজেই যারা জোরে আমীন বলেন না, তারা অবশ্য অব্যশই রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) এর এ সুন্নাতকে পরিত্যাগকারী হিসাবে গণ্য হবেন।

১২। নামাযে রাফউল ইয়াদায়েন করা সুন্নাতঃ

(رفع اليدين في الصلاة سنة)

নামায শুরু করার সময়, রুকুতে যাওয়ার সময়, রুকু হতে উঠার সময় এবং তৃতীয় রাকাআত শুরু করার সময় নামাযে এই চার অবস্থায় (আল্লাহু আকবার বলার সাথে) দুই হাতকে ক্বিবলামুখী করে দুই কান অথবা দুই কাধ বরাবর উচু করাকে রাফউল ইয়াদায়েন বলা হয়।

নামাযে উল্লিখিত চার অবস্থায় রাফউল ইয়াদায়েন করা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) এর এমন একটি সুন্নাত; যার স্বপক্ষে ছহীহ্ সনদে প্রায় চারশত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অথচ অধিকাংশ নামাযী ভাইয়েরা শুধুমাত্র নামায শুরু করার সময় দুই হাত উচু করেন। আর বাকী তিন অবস্থায় দুই হাত উচু করেন না বা রাফউল ইয়াদায়েন করেন না। এটা কোন

ধরনের সুন্নাত বিরোধী কাজ! একবার ভেবে দেখবেন কি? আরও দুঃখজনক ব্যাপার হলো রফউল ইয়াদায়েন তথা হস্তদ্বয় উত্তোলন করার হাদীছগুলির বিরুদ্ধে মনগড়া ও মিথ্যা যুক্তি পেশ করা হয়ে থাকে যে, ছাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) ইসলামের প্রথম যুগে বগলে মুর্তি রেখে নামাযে দাড়াতেন ফলে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) তাদেরকে নামাযের ভিতর এভাবে হাত উত্তোলন করে তাদের বগলের মূর্তিগুলি ফেলে দেয়ার নির্দেশ দেন। (নাউযুবিল্লাহ) বলাবাহুল্য এধরনের কথা বলা ছাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)দের চরিত্রে অপবাদ দেয়ার শামিল। যাতে ঈমান ও আমল ধ্বংস হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

১৩। রুকু, সিজদা ঠিকমত করা ফরযঃ

(الاعتدال في الركوع والسجود فرض)

নামাযে রুকু করার সময় বিশেষ করে মাথা , পিঠ ও কোমর কোন প্রকার উচু-নিচু না করে এমনভাবে সমান করে রাখতে হবে ,যেন পিঠের উপর একটি পানি ভর্তি বাটি রাখলে উহা কোন দিকে গড়িয়ে না পড়ে। উহা বহু ছহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত। (বুখারী, মুসলিম,তিরমিযী...) অথচ বহু নামাযী ভাইয়েরা রুকু করার সময় তাদের মাথা, পিঠ ও কোমর সমান ভাবে না রেখে শুধুমাত্র উটের মত একটু মাথা ঝুকিয়ে তাড়াতাড়ি রুকুর কাজ শেষ করেন। এরপর রুকু হ'তে সোজা

হয়ে না দাড়িয়ে বরং মাথা দিয়ে উপরের দিকে একটু ইশারা করেই সিজদায় চলে যান। এরপর অনেকেই তাড়াতাড়ি সিজদা করতে যেয়ে সিজদার দুআগুলি ভাল করে পড়েন না এবং দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসেন না, আর দুআও পড়েন না। বরং তারা মুরগীর আধার খাওয়া ও কাকের পানি পান করার মত প্রথম সিজদা হতে মাথা একটু উঁচু করেই একেবারে দ্বিতীয় সিজদা দিয়ে সোজা হয়ে বসেন। এভাবে রুকু-সিজদা করে নামায পড়া ব্যক্তিকে হাদীছে নামায চোর হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর এ কারণেই তার পুরা নামাযটাই বাতিল হয়ে যাবে। (বুখারী, আবূ দাউদ, তিরমিযী ...)

১৪। নামাযে এদিক ওদিক তাকানো হারামঃ

(الإلتفات في الصلاة محرم)

অনেক নামাযী ভাইয়েরা নামাযের ভিতরে ডানে, বামে, সামনে ও উপরের দিকে তাকিয়ে থাকেন, এভাবে তাকানো মোটেই ঠিক নয়। নামাযের মধ্যে মুছল্লীর দৃষ্টি সব সময় সিজদার জায়গায় রাখতে হবে, নামাযের পাটির বাইরে তাকানো যাবে না। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেনঃ "যারা নামাযে আসমানের দিকে তাকায়, এ কারণে আল্লাহ তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিতে পারেন।" (মুসলিম) তবে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) নামাযে কখনো কখনো প্রয়োজন বোধে ডানে ও বামে আড়চোখে দেখতেন, কিন্তু ঘাড় ঘুরাতেন না। (তিরমিযী, নাসায়ী ও মিশকাত)

১৫। নামাযে হাই তোলাঃ (التثاؤب في الصلاة)

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেনঃ "নামাযে হাই ওঠা শয়তানী কাজ। যদি তোমাদের কারো নামাযে হাই ওঠে, তাহলে সেটাকে সাধ্যমত চেপে রাখার চেষ্টা করবে এবং মুখে যেন হাত রাখে।" (তিরমিযী) "কারণ শয়াতন তার মুখে ঢুকে যায়।" (মুসলিম) "আর সে যেন গাল হা করে হাঃ হাঃ না করে। কারণ এটা শয়তানী কাজ। তাকে এরূপ করতে দেখে শয়তান হাসতে থাকে।" (বুখারী ও মিশকাত)।

১৬। নামাযে সালাম ফিরানোর পরে ইমামের মুছল্লীদের দিকে ফিরে বসা সুন্নাতঃ (مواجهة الإمام للمصلين بعد التسليم سنة)

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযে সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদীদের দিকে ফিরে বসতেন।(অর্থাৎ কখনো পূর্ণভাবে, কখনো ডান দিকে, আবার কখনো বাম দিকে ঘুরে বসতেন।) ইহা বিভিন্ন ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত (বুখারী ও মুসলিম...)। অথচ আমাদের দেশের অধিকাংশ ইমাম সাহেবগণ বিশেষ করে যোহর, মাগরিব ও ইশার নামাযে সালাম ফিরানোর পরে একেতো মুক্তাদীদের দিকে ঘুরে বসেন না, আবার সঙ্গে সঙ্গে মুনাজাত করে দেন। ইহা নিঃসন্দেহে সুন্নাতের খেলাপ ও বিদ'আত কাজ।

১৭। ফরয নামাযসমূহের পরে সম্মিলিত ভাবে হাত তুলে মুনাজাত করা বিদআতঃ

(الدعاء الإجتماعي برفع اليدين بعد الصلوات المفروضة بدعة)

আমাদের দেশের অধিকাংশ ইমাম সাহেবেরা ফরয নামাযের পরেই দুহাত তুলে, জোরে জোরে দু'আ পড়ে মুনাজাত করেন। আর মুছল্লীরা সেই সাথে আমীন আমীন বলতে থাকেন। এভাবে সম্মিলিতভাবে নামাযের পরে হাত তুলে দু'আ করা নিঃসন্দেহে বিদ'আত। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের) এবং ছাহাবা কেরামদের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) যুগে এভাবে দু'আ করার প্রচলণ ছিল না। আর বর্তমানে সাউদী আরব ,কুয়েত, কাতার, বাহরাইন তথা বিশেষ করে আরব দেশগুলিতে এভাবে দু'আ করতে কোথাও দেখা যায় না। কারণ ইহা পরিস্কার বিদ'আত। আর প্রচলিত মুনাজাত তথা বিদ'আত সমাজে চালু থাকার কারণে সালাম ফিরানোর পরে অধীক ছওয়াব সম্বলিত যে সমস্ত দু'আ পড়া রাসূলের সুন্নাত ছিল, সে সুন্নাত পরিত্যাগ করা হচ্ছে। ফলে মুছল্লীগণ বহু ছওয়াব থেকে মাহরুম হচ্ছে। এজন্য দায়ী কারা? আল্লাহ আমাদেরকে বিদ'আত ছেড়ে দিয়ে তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের সুন্নাতের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

১৮। ইকামত হয়ে গেলে একমাত্র ফরয ছাড়া আর কোন নামায হবে না, এমনকি ফজরের দুরাকা'আত সুন্নাতও হবে নাঃ (لا صلاة بعد إقامة سوى المكتوبة ولو كانت سنة الفجر)

এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত কথা হ'লঃ যে কোন ফরয নামায শুরু হয়ে গেলে আর কোন সুন্নাত ও নফল নামায পড়া ঠিক হবে না। শেষ রা'কাতের রুকূ হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি শেষ করে অথবা ঐ সুন্নাত নামায ও নফল নামায ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি জামা'আতে শরীক হওয়াটাই হাদীছের বিধান। কাজেই ফজরের জামা'আত শুরু হয়ে গেলে ফজরের ঐ দুই রাকা'আত সুন্নাত কোন রকমেই আর শুরু করা যাবে না-একথা বলার অবকাশ রাখেনা।

অতএব কেউ যদি দেখে যে, ফজরের জামা'আত শুরু হয়ে গেছে, তাহলে সে তখনই জামাআতে শামিল হবে এবং ফরয পড়ার পর সুন্নাত পড়ে নিবে। ঐ সুন্নাত পড়ার জন্য তাকে আর বেলা উঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

১৯। প্রত্যেক ফরয নামাযের প্রথমে ইকামত দেওয়া সুন্নাতঃ (الإقامة للصلاة الفريضة سنة)

প্রত্যেক ফরয নামায ইকামত দিয়ে শুরু করতে হবে। কেননা এটাই সুন্নাত। অথচ অনেক মুছুল্লী ভাইয়েরা প্রথম জামাআত শেষ হওয়ার পরে একাকী নামায পড়ার সময় এবং

দ্বিতীয় ও তৃতীয় জামা'আত শুরু করার সময় নামাযের ইকামত দেন না। নিঃসন্দেহে এটা সুন্নাতের খেলাফ কাজ।

২০। একই মাসজিদে দ্বিতীয় জামাআতের প্রমাণঃ

(ثبوت إقامة جماعة ثانية في مسجد واحد)

দুনিয়ার যে কোন মাসজিদে প্রথম জামা'আতের পর প্রয়োজনে একাধিক জামা'আত করে নামায পড়া নিঃসন্দেহে জায়েয। কারণ ইহা বুখারী ও তিরমিযী শরীফে বর্ণিত দুটি ছহীহ্ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। উক্ত হাদীছদ্বয়ের আলোকে বিশেষ করে আরব দেশগুলির প্রায় প্রত্যেকটি মাসজিদে প্রয়োজনে একাধিকবার জামা'আত হয়ে থাকে। আর বিশেষ করে মক্কা ও মদীনা শরীফে প্রথম জামা'আতের পর আরো কতবার জামাআত হয় তা হিসাব করে বলা সম্ভব নয়। আমাদের দেশের সকল আহলে হাদীছ মাসজিদে প্রয়োজনে একাধিকবার জামা'আত হয়ে থাকে, তবে দেশের অধিকাংশ হানাফী মাসজিদে প্রথম জামা'আত শেষ হওয়ার পরে দ্বিতীয়বার জামা'আত করে নামায পড়ার প্রচলন নেই। যার ফলে মুছল্লীরা বিক্ষিপ্তভাবে একা একা নামায পড়ে একদিকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের বিশুদ্ধ হাদীস পরিত্যাগকারী হিসাবে গণ্য হচ্ছে। অপরদিকে জামা'আতবদ্ধ নামায পড়ার ২৭গুণ ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এজন্য দায়ী কারা, একবার ভেবে দেখবেন কি?

২১। মাতৃভাষায় জুমু'আর খুৎবাহ প্রদানঃ

(إلقاء خطبة الجمعة بلغة القوم)

এ ব্যাপরে সংক্ষিপ্ত কথা হলোঃ কুরআন, হাদীছ ও ফিকাহ্‌বিদদের আলোচনার আলোকে জুমু'আর খুৎবাহ মুছুল্লীদের মাতৃভাষায় হওয়াটাই বাঞ্চনীয়। (এব্যাপারে কুরআন, হাদীছ ও ফিকাহের কিতাব সমূহে যথেষ্ট দলীল ও প্রামণ আছে। এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে ঐ সমস্ত দলীল উল্লেখ করা সম্ভব হল না।) আর এ কারণেই সাঊদী আরবের রিয়ায ও জিদ্দা সহ অন্যান্য শহরের বহু কোম্পানীতে যেখানে উর্দুভাষী মুছুল্লীদের সংখ্যা বেশী সেখানে উর্দুতে, আর যেখানে বাংলাভাষী মুছুল্লীদের সংখ্যা বেশী সেখানে বাংলায় এমনিভাবে অন্য ভাষাতেও জুমু'আর খুৎবাহ দেওয়ার সু-ব্যবস্থা আছে।

পক্ষান্তরে যে সমস্ত মৌলবিরা বলেন যে, "আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় জুমুআর খুৎবাহ দেওয়া জায়েয নেই," একথার স্বপক্ষে তাদের মনগড়া যুক্তি ছাড়া কুরআন ও হাদীস থেকে নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ নেই । এছাড়া আমাদের দেশে অধিকাংশ মাসজিদে ঐ সমস্ত মৌলবিদের মনগড়া ফতোয়া অনুযায়ী আরবীতে খুৎবাহ দেওয়াতে মুছুল্লীরা সময় উপযোগী সাপ্তাহিক ওয়ায, নছীহত শোনার উপকারীতা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। অপরদিকে খুৎবাহ শুরু করার আগে মিম্বারে বসে বসে বাংলায় কিছু ওয়ায নছীহত করার প্রচলন ঘটিয়ে আর এক বিদ'আতের সৃষ্টি করা হয়েছে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) জুমু'আর দিন খুৎবাহ শুরু করার আগে

মিম্বারে বসে জীবনে কোন দিন এভাবে তো খুৎবাহ দেননি। বিষয়টা একবার ভেবে দেখবেন কি? মহান আল্লাহ আমাদেরকে সর্বক্ষেত্রে বিদআত পরিত্যাগ করে তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের সুন্নাতের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

২২। জুমু'আর নামাযের পরে সতর্কতামূলক আখেরী যোহর হিসাবে নামায পড়া বিদ'আতঃ

(صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة إحتياطاً بدعة)

অনেক নামাযী ভাইয়েরা মনে করেন যে, শহর ব্যতীত গ্রাম্য এলাকায় জুমু'আর নামায পড়া জায়েয নেই। এ হিসাবে অনেকেই গ্রামে জুমু'আর নামায পড়েন না। এ ছাড়া অধিকাংশ ভাইয়েরা উক্ত ধারণা পোষণ করা সত্ত্বেও গ্রামে জুমু'আর নামায আদায় করার পরে সন্দেহবশতঃ পুনরায় যোহরের চার রাকাআত নামায আখেরী যোহর হিসাবে পড়ে থাকেন। আব্বাসীয় খলীফাদের আমলে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ভ্রান্ত ফির্কা মু'তাযিলাগণ এ বিদ'আত সর্ব প্রথম চালু করে। যা আজও অনেকের মধ্যে চালু আছে।

অতএব যারা জেনে বুঝে আখেরী যোহর এখনও পড়ে থাকেন, তাদের এক্ষুনি এ বিদ'আত হতে তাওবাহ করা উচিত এবং শুধুমাত্র জুমু'আর নামায আদায় করা কর্তব্য। অনুরূপভাবে অনেকে মনে করেন ইসলামী হুকুমত কায়েম না থাকলে সে দেশে জুমু'আর নামায হয় না ইত্যাদি, যার ফলে তারা জুমু'আর

নামায মোটেই পড়ে না এসব ধারণা একান্তই ভ্রান্ত ধারণা। সুতরাং অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

২৩। উমরী কাযা বলে ইসলামী শরীয়তে কোন নামায নেইঃ لا صلاة في الشريعة الإسلامية باسم القضاء العمري

মুসলিম সমাজের কোন কোন ভাইয়েরা তাদের উপর নামায ফরয হওয়ার পরও অবহেলা করে নামায পড়ে না। অতঃপর বেশ কয়েক বছর পর (হয়ত বিবাহ করার পর, ছেলে-মেয়ে হওয়ার পর অথবা পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও ছেলে-মেয়ের মধ্য হতে কারো মৃত্যুর পর) সুমতি হলে তারা নাযায পড়া শুরু করে। এনুরূপ নামাযী ভাইদেরকে কোন কোন আলেম প্রত্যেক ওয়াক্তে তাদের জীবনের বাদ যাওয়া (হয়ত ১০,১৫,২০ বা ৩০ বছরের) নামাযগুলো কিছু কিছু পড়ে আদায় করে দিতে বলেন। আর এটাকেই ঐ সব আলেমদের পরিভাষায় কাযায়ে উমরী বা উমরী কাযা বলা হয়ে থাকে। এই উমরী কাযা পড়ার প্রমাণ কুরআন ও হাদীছের কোথাও নেই। এটা মনগড়া ফাতওয়া। কাজেই এটা পরিস্কার বিদ'আত এতে কোন সন্দেহ নেই।

অতএব ঐ বাদ যাওয়া নামাযগুলোর জন্য আল্লাহর দরবারে কাঁন্নাকাটি ও খাঁটি তাওবাহ করাই যথেষ্ট। কেননা একজন কাফির বা মুশরিক যখন খাঁটি তাওবাহ করে ইসলাম গ্রহণ করে, তখন এ ইসলাম গ্রহণের ফলে আল্লাহ তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ্-খাতাহ মাফ করে দেন। তাহলে একজন মুসলমান

তার সকল প্রকার পাপ পঙ্কিলতা হতে যখন খাঁটি তাওবাহ করবে, তখন এ তাওবাহের বিনিময়ে আল্লাহ তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ-খাতাহ মাফ করে দিবেন, একথা বলার অবকাশ রাখে না। ইহা কুরআন ও হাদীছ থেকে প্রমাণিত।

২৪। মৃত্যুর পরে কঠিন রোগ-ব্যাধির কারণে ছুটে যাওয়া নামাযের জন্য কাফ্‌ফারা আদায় করা সম্পূর্ণ বিদ'আত। কারণ এর স্বপক্ষে কুরআন ও হাদীস থেকে কোনই প্রমাণ নেই।

নামায সংক্রান্ত্র বিষয়ে বহু মাসআলা-মাসায়িল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বিস্তারিত জানার জন্য নিম্ন লিখিত বইগুলি পড়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

১। "রাসূলুল্লাহর ছালাত পদ্ধতী" আল্লামা শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবাণী।

২। "ছালাতুর রাসূল" (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) (ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল গালিব।(হাফিযাহুল্লাহ)

৩। "সহীহ নামায ও দু'আ শিক্ষা" আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে ফজল (রাহিমাহুল্লাহ)

৪। "আইনী তোহ্‌ফা সালাতে মোস্তফা" হাফিয মাওলানা আইনুল বারী আলিয়াবী (হাফিযাহুল্লাহ)

৫। "রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এর সালাত এবং আকীদাহ ও যরুরী সহীহ মাস'আলাহ।" আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন নদীয়াভী (রাহিমাহুল্লাহ)

৬। "নামাযের মাসায়েল" মুহাম্মাদ ইকবাল কায়লানী (হাফিযাহুল্লাহ)

حكم تارك الصلاة

لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)

المترجم: الداعية: أبو الكلام أزاد

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسلي

নামায পরিত্যাগকারীর বিধান

রচনায়ঃ

শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছা-লেহ আল উছাইমীন।

অনুবাদঃ আবুল কালাম আযাদ

(লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়)

আল-সুলাই ইসলামী দা'ওয়া সেন্টার

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد و على آله وصحبه وسلم أما بعد

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য অতঃপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের প্রতি এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সঙ্গী-সাথীদের প্রতি। অতঃপর ধর্মপ্রাণ মুসলামান ভাইদের প্রতি এই ছোট লিফলেটখানা পেশ করা হলো – যাতে সাউদী আরবের উচ্চ উলামা পরিষদের মাননীয় সভাপতি মায়খ মুহাম্মাদ বিন ছা-লিহ আল- উছাইমীনের নিকটে এক বেনামাযী পরিবার সম্পর্কে যে প্রশ্ন করা হয়েছিল, সেই প্রশ্ন এবং সেই প্রশ্নের উত্তর নিম্নে প্রদত্ত হলো।

প্রশ্নঃ একজন ব্যক্তি যখন তার পরিবারের লোক-জনের নামায পড়ার জন্য নির্দেশ দিল, তখন তাদের কেহই তার নির্দেশ মানলনা অর্থাৎ নামায পড়ল না। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি তার পরিবারের লোক-জনদের সাথে বসবাস করবে? এবং তাদের সাথে মিলেমিশে থাকবে? না সে নিজ পরিবার ছেড়ে, বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবে?

উত্তরঃ যদি ঐ পরিবারের লোকজন কখনোই নামায না পড়ে তাহলে তারা সকলেই কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে, ফলে ইসলাম ধর্মের গণ্ডি হ'তে তারা বেরিয়ে যাবে। কাজেই এ ব্যক্তির পক্ষে তার পরিবারের সাথে বসবাস করা জায়িয হবে না। তবে ঐ ব্যক্তির উপর এটাই ওয়াজিব হবে যে, তিনি বার

বার তাদেরকে নামায পড়ার জন্য, কল্যাণের পথে আসার জন্য আহবান জানাবেন। যাতে করে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে হিদায়েত করেন।

নামায পরিত্যাগকারী কাফের (এই বড় পাপ কাজ হ'তে আল্লাহ্ আমাদেরকে রক্ষা করুন) আমীন। যা কুরআন ও হাদীসের দলীল দ্বারা প্রমাণিত, তাছাড়া ছাহাবায়ে কিরামদের কথা এবং সুস্থ বিবেক দ্বারাও প্রমাণিত।

কুরআন হ'তে দলীলঃ মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوْا الصَّلَاةَ وَآتُوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِيْ الدِّيْنِ﴾ (التوبة:١١)

অর্থঃ অবশ্য ঐ সমস্ত মুশরিকরা যদি তাওবাহ্ করে, নামায কায়েম করে আর যকাত আদায় করে, তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই হিসাবে গণ্য হবে। (তাওবাঃ ১১)

উক্ত আয়াতের মর্মার্থ হলোঃ ঐ সমস্ত মুশরিকরা যতক্ষণ পর্যন্ত উল্লেখিত কাজগুলি যথাযথভাবে পালন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মুসলমানদের ভাই হিসাবে গণ্য হবে না। এ ছাড়া নামায পরিত্যাগ করা এটা এতবড় পাপ কাজ - যার ফলে ধর্মীয় বন্ধনও কোন কাজে আসবে না।

হাদীছ হতে দলীলঃ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ. (رواه مسلم)

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন, একজন মু'মিন বান্দা এবং কুফর ও শিরকের মাঝে পার্থক্য হ'ল নামায পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ যারা নামায পড়েন তারা ঈমানদার আর যারা নামায পড়ে না তারা কাফির ও মুশরিক। (মুসলিম)

وَقَالَ أَيْضاً: "اَلْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ". (رواه أصحاب السنن).

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) আরো বলেছেন, আমাদের এবং ঐ সমস্ত মুনাফিক ও কাফিরদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী বস্তু হ'ল নামায। অতএব যে নামায পরিত্যাগ করল , সে আল্লাহর সাথে কুফরী করল। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

ছাহাবায়ে কিরামদের (রাযিআল্লাহু আনহুম) মুখনিঃসৃত বাণী হ'তে দলীলঃ

আমীরুল মু'মিনীন উমার ফারুন (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি নামায পরিত্যাগ করল, তার জন্যে ইসলাম ধর্মে সামান্য পরিমাণ কোন অংশ বা অধিকার নেই।"

আব্দুল্লাহ বিন শাক্বীক (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেনঃ "নাবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এর ছাহাবীরা একমাত্র নামায পরিত্যাগ করা ছাড়া ইসলামী অন্য কোন কাজ পরিত্যাগ করলে মানুষ যে কাফির হয় এটা তারা জানতেন না।"

সুস্থ বিবেকের দ্বারা দলীলঃ

সুস্থ বিবেক কি এটাই সমর্থন করবে যে- একজন মানুষ যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে, আর যিনি নামাযের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ব সম্পর্কে এবং ঐ নামাযের মাধ্যমে যে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও অনুগ্রহ লাভ করা যায় এ সমস্ত বিয়য়ে যিনি অবগত আছেন। এর পরেও তিনি একাধারে নামায পরিত্যাগ করেই চলবেন? এটা কোন রকমেই সম্ভব নয়।

শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছা-লিহ আল উসাইমীন বলেছেনঃ নামায পরিত্যাগকারী ব্যক্তি কাফির নয় এ মর্মে যে সমস্ত ভাইয়েরা যে সমস্ত দলীল পেশ করেন, সে সমস্ত দলীলগুলি আমি খুব চিন্তা-ভাবনা করে ও গবেষণা করে দেখেছি যে- ঐ সমস্ত দলীলগুলি নিম্ন চারটি অবস্থার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত।

১। ঐ সমস্ত দলীলগুলি হয়ত প্রকৃতপক্ষে বেনামাযী ব্যক্তি কাফির কি না এ বিষয়ের দলীল নয়।

২। অথবা ঐ সমস্ত দলীলগুলিকে এমন গুণের সাথে শর্ত লাগানো হয়েছে যে, যে গুণের সাথে ঐ দলীলগুলি নামায পরিত্যাগ করাকে অস্বীকার করে।

৩। অথবা ঐ সমস্ত দলীলকে এমন অবস্থার সাথে শর্ত লাগানো হয়েছে যে, যে অবস্থার ভিতর এই নামায পরিত্যাগ করাকে ক্ষমার চোখে দেখা হয়েছে।

৪। অথবা ঐ সমস্ত দলীলগুলি সাধারণ বা অনির্দিষ্ট। অতঃপর "নামায পরিত্যাগকারী ব্যক্তি কাফির।" এ সমস্ত হাদীছের দ্বারা উক্ত দলীলগুলিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

"নামায পরিত্যাগকারী ব্যক্তি কাফির" অনেকেই এ হাদীসের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, "নামায পরিত্যাগকারী ব্যক্তি কাফির" অর্থাৎ সে আল্লাহর নি'আমতকে অস্বীকার করেছে, কাজেই সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে না।

এখানে আমাদের কথা হলো- হাদীছ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, নামায পরিত্যাগকারী ব্যক্তি কাফির। এছাড়া কুরআন ও হাদীছের কোথায়ও এমন কথা লেখা নেই যে বেনামাযী ব্যক্তি মু'মিন অথবা সে জান্নাতে প্রবেশ করবে অথবা সে জাহান্নামের আগুন হ'তে মুক্তি পাবে। তাহলে আমরা কোন দলীলের ভিত্তিতে অন্যান্যদের মতো (নামায পরিত্যাগকরী ব্যক্তি সত্যিকারার্থে কাফির নয় বরং সে আল্লাহর নি'য়ামতের অস্বীকারকারী) এই ব্যাখ্যার প্রতি ধাবিত হব। অতএব উপরোল্লিখিত আলোচনার দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নিশ্চয়ই "নামায পরিত্যাগকারী ব্যক্তি কাফির" তাহলে ঐ বেনামাযী ব্যক্তির উপর মুরতাদের বিধান সমূহ প্রয়োগ করা যাবে।

নামায পরিত্যাগকারী মুর্তাদের বিধানসমূহঃ

ঐ বেনামাযী ব্যক্তির সাথে কোন মহিলার বিবাহ ঠিক হবে না, কেননা ঐ ব্যক্তিকে যদি বিবাহ করিয়ে দেয়া হয় আর এমতাবস্থায় সে যদি নামায না পড়ে তাহলে ঐ বিবাহ বাতিল

হয়ে যাবে, ফলে ঐ স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না। কেননা মুহাজির মহিলাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ

﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ...﴾ (الممتحنة:١٠)

অর্থঃ যদি তোমরা জানতে পার যে, ঐ সমস্ত মুহাজির মহিলারা ঈমানদার, তাহলে তোমরা তাদেরকে আর কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠাইও না। কেননা ঐ সমস্ত ঈমানদার মহিলারা কাফেরদের জন্য হালাল নয়। (সূরা মুমতাহিনাঃ ১০)

২। একজন মুসলমান ব্যক্তি তাকে (মুসলিম রমণীর সাথে) বিবাহ করিয়ে দেয়ার পরে যদি সে নামায একেবারেই ছেড়ে দেয়, তাহলে তার বিবাহ ভেঙ্গে যাবে। ফলে ঐ স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না, উপরে বর্ণিত আয়াতের বিধান অনুযায়ী।

৩। ঐ বেনামাযী ব্যক্তি যদি কোন জানোয়ার জবেহ করে, তাহলে ঐ জবেহকৃত জানোয়ারের গোশ্‌ত খাওয়া যাবে না। কেননা উহা হারাম। তবে জানোয়ার বেনামাযী মুসলমান জবেহ না করে যদি কোন ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান জবেহ করে তাহলে তাদের জবেহকৃত জানোয়ারের গোশ্‌ত খাওয়া আমাদের জন্য হালাল হবে। (নামায পরিত্যাগ করার মত এতবড় পাপকাজ হ'তে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি)। কেননা একজন বেনামাযী মুসলমানের জবেহকৃত জানোয়ার ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের জবেহকৃত জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট।

৪। আর ঐ বেনামাযী ব্যক্তির জন্য মক্কা শরীফে এবং মদীনা শরীফের নির্ধারিত সীমানার ভিতর প্রবেশ করা বৈধ নয়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের সম্পর্কে বলেছেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوْا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا....﴾ (التوبة:٢٨)

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মুশরিকরা তো অপবিত্র। কাজেই তারা যেন এ বছরের পর হ'তে মাসজিদুল হারামের নিকটে আর না আসে। (তাওবাঃ ২৮)

৫। যদি ঐ বেনামাযী ব্যক্তির কোন নিকটাত্মীয় মারা যায় তাহলে ঐ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদে বা মিরাছে তার কোন হক বা অধিকার থাকেবেনা। এমনিভাবে যদি কোন মুসলমান নামাযী ব্যক্তি একদিকে তার বেনামাযী ছেলেকে অপরদিকে তার নামাযী চাচাত ভাইকে রেখে মারা যায়- তাহলে সম্পর্কের দিক দিয়ে অতি নিকটে হওয়া সত্ত্বেও বেনামাযী হওয়ার কারণে তার ছেলে তার মিরাছ পাবেনা। আর সম্পর্কের দিক দিয়ে দূরবর্তী হওয়া সত্ত্বেও নামাযী হওয়ার কারণে তার চাচাত ভাই তার মিরাছ বা পরিত্যক্ত সম্পদ হ'তে অংশ পাবে। কেননা উসামা (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেনঃ

"لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ".

অর্থঃ কোন মুসলমান কোন কাফিরের পরিত্যক্ত সম্পদ হ'তে কোন অংশ পাবেনা। এমনিভাবে কোন কাফির কোন মুসলামানের পরিত্যক্ত সম্পদ হতে কোন অংশ পাবে না।

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) আরো বলেছেনঃ

" اَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ " (متفق عليه)

অর্থঃ তোমরা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদকে যথাযথভাবে তার প্রাপ্যদারদেরকে পৌঁছিয়ে দাও। প্রাপ্যদারদের হক পৌছিয়ে দেওয়ার পরে যা অতিরিক্ত থাকবে তা আছাবা হিসাবে শুধু পুরুষদের জন্য নির্ধারিত। (বুখারী ও মুসলিম)

৬। ঐ বেনামাযী ব্যক্তি মৃত্যবরণ করলে তাকে গোছল করানো, কাফন পরানো এবং তার জানাযার নামায পড়ানোর কোন প্রয়োজন নেই। এমনিভাবে তাকে মুসলমানদের কবরস্থানে কবর দেওয়া ঠিক হবে না। বরং ঐ বেনামাযীর লাশকে গোসল না দিয়ে, কাফন না পরিয়ে, তার পরনের কাপড়-চোপড়সহ মাঠে ময়দানের কোন সুবিধামত স্থানে গর্ত করে তাকে মাটি চাপা দিতে হবে। কেননা ইসলামী শরীয়তে কোন বেনামাযীর জন্য এবং কোন বেনামাযী লাশের জন্য সম্মান বলতে কিছুই নেই। আর এজন্যেই কোন একজন মুসলমানের সামনে যদি অন্য বেনামাযী লোক মৃত্যুবরণ করে -তাহলে ঐ বেনামাযী ব্যক্তির জানাযার নামাযের জন্য অন্য মুসলমানদেরকে আহ্বান জানানো ঐ মুসলমান ব্যক্তির পক্ষে বৈধ হবে না।

৭। ক্বিয়ামতের দিন ঐ বেনামাযী ব্যক্তিকে কাফেরদের বড় বড় নেতা যেমন ফিরআউন, হামান, ক্বারুন এবং উবাই বিন খালফদের সাথে একত্রিত করা হবে। (এই জঘন্য পরিণতি হ'তে আমরা আল্লাহর আশ্রায় প্রার্থনা করি।) এ ছাড়া ঐ বেনামাযী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। ঐ ব্যক্তির পরিবার-পরিজনের মধ্য হ'তে কারো পক্ষে ঐ বেনামাযী ব্যক্তির প্রতি রহমতের জন্য এবং তার ক্ষমার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করা হালাল নহে। কেননা সে কাফির , সে তার পরিবার-পরিজনের পক্ষ থেকে দু'আ পাওয়ার হকদার নহে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا أُوْلِى قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيْمِ﴾ (التوبة:١١٣)

অর্থঃ কোন নাবী ও ঈমানদারদের জন্য এটা উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, যদিও তারা তাদের নিকটাত্নীয় হোক না কেন। এ বিষয় স্পষ্ট হওয়ার পর যে নিশ্চয়ই ঐ সমস্ত মুশরিকরা জাহান্নামী। (তাওবা:১১৩)

প্রিয় পাঠক ভাইয়েরা! এই নামায পরিত্যাগ করা বিষয়টা বড়ই বিপদজনক হওয়া সত্বেও বড় দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই যে- বহু মুসলামান ভাইয়েরা নামায পরিত্যাগ করা এতবড় পাপকাজকে একেবারে তুচ্ছ মনে করে। এ ব্যাপারে যেন তাদের কোন অনুভুতি নেই। আর এজন্যেই তারা যে কোন

বেনামাযীকে নিজ বাড়ীতে দ্বিধাহীন চিত্তে অবস্থান করার সুযোগ দিয়ে থাকে। উল্লিখিত কাজগুলি সব নাজায়েয।

নামায পরিত্যাগকারী পুরুষ বা মহিলা যেই হোক না কেন- এটাই নামায পরিত্যাগ করার ইসলামী বিধান। কাজেই ওহে নামায পরিত্যাগকারী! অথবা যথাযথভাবে নামায পড়ার ব্যাপারে অলসতাকারী! তুমি সাবধান হও, তুমি আল্লাহকে ভয় কর। তুমি তোমার বাকী জীবনটাকে পুন্যময় কাজের দ্বারা পূর্ণ করার চেষ্টা কর। কেননা তুমিতো জানো না তোমার মৃত্যু ঘন্টা বাজতে, তোমার জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে, তোমার মৃত্যু সংঘটিত হতে আর কত বৎসর বা কত ঘন্টা বাকী আছে? তোমার মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার সময় একমাত্র আল্লাহরই জানা আছে, অন্য কারো জানা নেই। অতএব তুমি সদা-সর্বদা নিম্ন লিখিত আল্লাহর এ বাণী স্মরণ কর।

﴿إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لاَ يَمُوْتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيَى﴾

(طه:٧٤)

অর্থঃ নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি (বিভিন্ন রকম অন্যায় অপকর্ম করে) তার প্রতিপালকের কাছে অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে, তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে জাহান্নাম। আর ঐ জাহান্নামে সে মরবেও না এবং বাঁচবেও না। (ত্বোয়া-হাঃ ৭৪) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেনঃ

﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى ، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ، فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوَى﴾

(النازعات:٣٧-٣٩)

অর্থঃ অতঃপর যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, নিশ্চয়ই তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। (সূরা আন্ নাযিআত:৩৭-৩৯)

পরিশেষে হে পাঠকমন্ডলী! আল্লাহ আপনাদের প্রত্যেককেই প্রতিটি ভাল ও কল্যাণময় কাজ করার পূর্ণ তাওফীক দান করুন। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে তাঁর বিধান মুতাবিক জ্ঞান অর্জন করার , আমল করার এবং আল্লাহর পথে মানুষদেরকে আহবান করার পূর্ণ তাওফীক দান করুন। এবং সেই সাথে আপনাদের জীবনের বাকী দিনগুলিকে সৌভাগ্যময় ও আনন্দময় করে গড়ে তুলুন। আমীন। সর্ব বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) এর প্রতি, তাঁর পরিবার ও পরিজনের প্রতি এবং তাঁর সমস্ত সঙ্গী-সাথীদের প্রতি আল্লাহ রহমত নাযিল করুন। আমীন।

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح بن عثيمين (رحمه الله)

বিনীত নিবেদক
ফাযীলাতুশ্ শাইখ, মুহাম্মাদ বিন ছা-লিহ বিন উছাইমীন
(রাহিমাহুল্লাহ)

এক বেনামাযী মৃত ছেলের জন্য তার মায়ের ফাতওয়া তলব

সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহর জন্য, এরপর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক সেই নাবীর প্রতি যে নাবীর পরে আর কোন নাবী আসবে না। অতঃপর এক মহিলা তার এক বেনামাযী ছেলে সম্পর্কে তদানিন্তন সাউদী আরবের প্রধান মুফতি মহামান্য শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ)এর নিকট এক ফাতওয়া তলব করেছিলেন। পরে শাইখ বিন বায ঐ ফাতওয়া সাউদী আরবের "উচ্চ উলামা পরিষদের" নিকট হস্তান্তর করেছিলেন। এরপর ১৪/১/১৪১৯হিজরী তারিখে (৪১৫) নম্বরে উচ্চ উলামা পরিষদ উক্ত ফাতওয়াকে সাউদী আরবের সরকারী ফাতওয়া ও ইসলামী গবেষণার স্থায়ী কমিটির নিকট পাঠিয়েছিলেন। অতঃপর ঐ কমিটি উক্ত ফাতওয়ার যে সমাধান দিয়েছিল সেটাই নিচে উল্লেখ করা হলোঃ। ঐ মহিলা যে প্রশ্ন করেছিল তা নিম্নরূপঃ

১৭ বৎসর বয়সের আমার এক ছেলে ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজ থেকে ২ মাস পূর্বে হঠাৎ গাড়ি এক্সিডেন্টে মারা যায়। ছেলেটি নামায পড়ত না এবং রামাযান মাসে রোযাও রাখত না। তবে আমার জানা মতে এই দুটি পাপ কাজ ছাড়া আর কোন পাপ কাজ তার দ্বারা সংঘটিত হয় নাই। এমতাবস্থায় ঐ ছেলের পক্ষ হ'তে তার রামযান মাসের রোযাগুলি পূর্ণ করা, তার মাতা হিসাবে আমার জন্য এবং তার ভাইদের জন্য জায়েয হবে কি? এমনিভাবে ঐ ছেলের পক্ষ হ'তে আশুরার রোযা, আরাফা দিনের রোযা এবং সপ্তাহের সোমাবার ও বৃহস্তিবারের রোযা এ সমস্ত নফল রোযাগুলি যদি রাখা হয়, তাহলে কি এর

ছাওয়াব আমার ঐ ছেলেকে দেওয়া হবে? এমনিভাবে আমি যদি তার পক্ষ থেকে যোহর নামাযের প্রথমে চার রাকা'আত, যোহর নামাযের পরে দুই রাকা'আত এবং আছর, মাগরিব, ইশা ও ফজর নামাযের প্রথমে দুই দুই রাকা'আত করে নামায যদি পড়ি তাহলে কি এ সমস্ত নামাযের ছাওয়াব আমার ঐ ছেলেকে দেওয়া হবে? ফতওয়া কমিটি উক্ত বিষয়ে গবেষণা করার পর যে ফাতওয়া বা জবাব দিয়েছিল তা নিম্নরূপঃ

যে ব্যক্তি কোন রোযা না রেখে এবং বেনামাযী অবস্থায় মারা গেল তাকে মুসলমান হিসাবে গণ্য করা যাবে না, কেননা যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায পরিত্যাগ করল সে কাফির। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেনঃ

"بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة"

অর্থঃ একজন মু'মিন বান্দা এবং একজন কাফির ও মুশরিকের মাঝে পার্থক্য হ'ল নামায পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ যারা মু'মিন তারা নামায পড়ে, আর যারা কাফির ও মুশরিক তারা নামায পড়েনা। অতএব যারা বেনামাযী অবস্থায় জীবন কাটালো এরপর তারা মৃত্যুর আগে আল্লাহ তা'আলার নিকট অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করার সুযোগ নিলনা। এ ধরনের ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং দু'আ করা জায়েয হবে না। অতএব ঐ ছেলের মা ঐ ছেলের মাগফিরাতের জন্য যতই নফল নামায, রোযা ও দু'আ করুক না কেন ঐ ছেলের কোন উপকারে আসবে না। কেননা নামায এমন একটি ইবাদত যা অন্যের পক্ষ থেকে আদায় করার কোন প্রমাণ ইসলামী শরীয়তে নেই। একমাত্র আল্লাহই সকল প্রকার ভাল কাজের তাওফীক দাতা।

পরিশেষে আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সকল ছাহাবীদের প্রতি আল্লাহ রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন, আমীন।

পক্ষেঃ

ফাতওয়া ও ইসলামী গবেষণার স্থায়ী কমিটি

সভাপতিঃ শাইখ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ)

সহ-সভাপতিঃ শাইখ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ আলুশ-শাইখ।

সদস্যঃ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল- গুদাইয়ান।

সদস্যঃ বাকার বিন আব্দুল্লাহ আবূ যাইদ।

সদস্যঃ ছা-লিহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান।

নির্ধারিত সময় হতে দেরী করে নামায পড়ার বিধানঃ

(حكم تأخير الصلاة عن وقتها)

একমাত্র শারয়ী ওযর এবং বিশেষ কোন অসুবিধা ছাড়া দেরী করে নামায পড়া হারাম ও নাজায়েয। কেননা নামায আদায় করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেহেতু যথা সময়ে নামায আদায় করা ওয়াজিব। অতএব যদি কেহ্ কোন ওযর ছাড়াই ইচ্ছাকৃতভাবে বা অলসতা করে নামাযের নির্ধারিত সময় চলে যাওয়ার পরে নামায আদায় করে, তাহলে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে, ফলে ঐ নামায আল্লহর দরবারে গৃহীত হবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেনঃ

﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ (النساء:١٠٣)

অর্থঃ নিশ্চয়ই নামাযকে নির্ধারিত সময়ে আদায় করার জন্য মুমিন বান্দাদের উপর ফরয করা হয়েছে। (সূরা আন্ নিসা:১০৩)

অতএব যথাসময়ে নামায আদায় না করার কারণে বান্দার নামায যখন নষ্ট হয়ে যাবে, তখন এর কারণে ঐ নামাযী ব্যক্তি কুফরী করল এবং সে নামায পরিত্যাগকারী হিসাবে গণ্য হবে। শুধু তাই নয় নামায দেরী করে পড়া হারাম একং এটা কুফরী কাজ। আর এ কুফরী কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কঠিন শাস্তি প্রদানের শতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেনঃ

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوْا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوْا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَياً ﴾ (مريم:٥٩)

অর্থঃ (পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত) আল্লাহর নেককার বান্দাদের পরে এমন অপদার্থ ও ঘৃণিত লোকজন দুনিয়ায় আসল, যারা নামাযকে ধ্বংস করে দিল এবং তারা কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করল, কাজেই তারা অচিরেই কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। (সূরা মারইয়াম:৫৯)

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহুমা) সহ আরো অনেকেই উল্লেখিত আয়াতের (أَضَاعُوْا) অর্থ নষ্ট করা) শব্দের অর্থ করতে গিয়ে বলেন যে এখানে (أَضَاعُوْا)এর অর্থ এটা নয় যে, তারা নামাযকে একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিল; বরং তারা নামাযের নির্ধারিত সময় হ'তে দেরী করে নামায পড়ত। যেমন তারা ফজরের নামায সূর্য উদয়ের পরে পড়ত, এমনিভাবে তারা আছরের নামায সূর্য ডুবার পরে পড়ত।

আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযাম বলেনঃ উমার বিন খাত্তাব (রায়িআল্লাহু আনহু) আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাযিআল্লাহু আনহু), মুয়ায বিন জাবাল (রাযিআল্লাহু আনহু) এবং আবু হুরাইরাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) সহ আরো অন্যান্য ছাহাবী রাযিআল্লাহু আনহুম হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে,

أَنَّ مَنْ تَرَكَ صَلاَةً وَاحِدَةً مُتَعَمِّداً حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ

অর্থঃ নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে এক ওয়াক্ত নামায ছেড়ে দিল, এমতাবস্থায় ঐ নামাযের নির্ধারিত সময় ও পার হয়ে গেল তাহলে ইচ্ছাকৃতভাবে এই নামায পরিত্যাগ করার কারণে ঐ ব্যক্তি কাফির ও মুর্তাদ হিসাবে গণ্য হবে। পরিশেষে উল্লিখিত বক্তব্যের বর্ণনাকারী আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযাম বলেনঃ উপরোল্লিখিত প্রখ্যাত চারজন ছাহাবীর মধ্য হ'তে কেহই উক্ত হাদীছ সম্পর্কে কোন মতানৈক্য করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। নামায দেরী করে পড়ার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ﴾ (الماعون:٤-٥)

অর্থঃ অতঃপর ঐ সমস্ত নামাযীদের জন্য মহা দুর্ভোগ, মহাবিপদ রয়েছে যারা নিজেদের নামায সম্পর্কে উদাসীন ও গাফেল থাকে। (সূরা আল- মাউন:৪-৫)

উল্লিখিত আয়াতেঃ তারা নিজেদের নামায সম্পর্কে উদাসীন থাকে এর অর্থ এটা নয় যে, তারা একেবারেই নামায ছেড়ে দিয়েছিল বরং তারা (মুনাফিকরা) নামাযের নির্ধারিত সময় পার হয়ে যাওয়ার পরে নামায আদায় করত। এখানে কেবলমাত্র নামায দেরী করে পড়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা ঐ সমস্ত মুনাফিকদেরকে "অ-য়িল" নামক জাহান্নাম বা ভয়াবহ শাস্তি প্রদানের ওয়াদা করেছেন। এ প্রসঙ্গে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الَّذِيْنَ يَنَامُوْنَ عَنْ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ تُرْضَخُ رُؤُوْسُهُمْ بِالْحِجَارَةِ فِيْ قُبُوْرِهِمْ كُلَّمَا رُضِخَتْ عَادَتْ كَمَا كَانَتْ لاَ يَفْتُرُ عَنْهُمْ ذٰلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" (رواه البخاري)

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন, নিশ্চয়ই যে সমস্ত ব্যক্তিরা ফরয নামায না পড়ে ঘুমিয়ে গেল এর শাস্তি হিসাবে মৃত্যুর পরে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের কবরে তাদের মাথাগুলোকে পাথর দিয়ে গুড়িয়ে দেয়া হবে। তাদের মাথাগুলি পাথর দিয়ে চূর্ণবিচুর্ণ করে দেওয়ার পরে ঐ মাথাগুলি পূর্বে যে রুপছিল ঠিক সেরুপ হয়ে যাবে। কিয়ামত পর্যন্ত পালাক্রমে তাদের কবরে এইরুপ শাস্তি চলতেই থাকবে, কোন রকমেই তাদের থেকে এ শাস্তি শীথিল করা হবে না। (বুখারী)।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সকলকে যথা সময়ে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আতের সাথে আদায় কারর পূর্ণ তাওফীক দান কর এবং উল্লিখিত ভয়াবহ সকল প্রকার পরকালীন শাস্তি ও আযাব হ'তে আমাদেরকে রক্ষা করিও আমীন।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام الصيام

إعداد:

المترجم والداعية: أبو الكلام أزاد
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسلي

রোযার বিধানসমূহ

প্রণয়নেঃ আবুল কালাম আযাদ
(লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়)

আল-সুলাই ইসলামী দা'ওয়া সেন্টার
রিয়ায, সৌদী আরব

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য অতঃপর দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হোক আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের প্রতি যিনি সমস্থ নাবী ও রাছূলগণের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন । এমনিভাবে দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সমস্ত ছাহাবীদের উপর ।

রোযার বিধানসমূহ (أحكام الصيام)

*রোযার সংগাঃ রোযার আভিধানিক অর্থ হলোঃ বিরত থাকা, আর পারিভাষিক অর্থ হলোঃ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত বা নৈকট্য লাভের জন্য ছুবহি ছাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযা ভঙ্গকারী সকল প্রকার কার্যক্রম (যেমন-আহার ,পানাহার, স্ত্রী সম্ভোগ ইত্যাদি) হতে বিরত থাকা ।

* রামাযান মাষের রোযা পালন করা ইসলামের মূল পাঁচটি স্তম্ভের মধ্য হতে একটি অন্যতম স্তম্ভ (বুখারী ও মুসলিম)

১ – বাড়ীতে অবস্থানকারী, সামর্থবান, জ্ঞান সম্পন্ন ও প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেক মুসলমান নারী ও পুরুষের উপর রোযা রাখা ফরয । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴾ (البقرة:١٨٣)

অর্থঃ হে ঈমানদার গণ। তোমাদের উপর রোযাকে ফরয করে দেয়া হয়েছে, যেমন ভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর ফরয করে দেয়া হয়েছিল, যার ফলে তোমরা আল্লাহ্ ভীতি অর্জন করতে পার । (বাক্বারাহঃ ১৮৩)

২ – কোন স্থায়ী অসুবিধার কারনে রোযা রাখতে অক্ষম ব্যক্তিঃ যেমন বৃদ্ধ মানুষ এবং এমন রোগগ্রস্থ ব্যক্তি যে তার রোগ হতে আরোগ্য লাভের আশা রাখেনা, এ ধরনের ব্যক্তিরা তাদের রোযা রাখতে অক্ষমতার কারনে প্রতিদিন একজন মিসকিনকে যথা উপযুক্ত খানা যেমন সাহরী, ইফতার, ও রাতের খানা খাওয়াবে ।

৩ – হায়েযঅলী এবং নেফাসঅলী মেয়েরাঃ এই দুই শ্রেনীর মেয়েরা তাদের হায়েয ও নেফাস অবস্থায় রোযা রাখবে না, বরং তাদের হায়েয ও নেফাস শেষ হয়ে গেলে তারা তাদের ছুটে যাওয়া রোযাগুলি আদায় করবে।

৪ – গর্ভবতী এবং দুগ্ধ দানকারিনী মহিলারাঃ এই দুই শ্রেনীর মহিলারা তাদের গর্ভ ধারণ করার এবং সন্তানদেরকে দুগ্ধ পান করানোর কারণে তারা যদি রোযা রাখা কষ্ট মনে করে অথবা তাদের রোযা রাখার ফলে তাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি হবে এই ভয় করে , তাহলে তারা রোযা ভেঙ্গে ফেলবে এবং পরবর্তীতে যখন তাদের এই ভয় দুর হবে এবং তারা রোযা রাখা সহজ সাধ্য মনে করবে, তখন তারা তাদের ছুটে যাওয়া রোযাগুলি আদায় করবে।

৫ – মুসাফির (ভ্রমণকারী) ব্যক্তিঃ তিনি ইচ্ছা করলে রোযা রাখতে পারেন ,আর ইচ্ছা করলে রোযা ছাড়তেও পারেন । তবে ভ্রমণজনিত কারনে কষ্টে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়লে রোযা ভেঙ্গে ফেলাটাই উত্তম। কেননা এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন , আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তিনি তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না। (বাক্বারাহঃ১৮৫)

৬ – অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুঃ যাদের উপর রোযা রাখা ফরয হয় নাই। রোযা রাখার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য তাদেরকে রোযা রাখার নির্দেশ দিতে হবে।

রামাযান মসের বৈশিষ্ঠ (خصائص شهر رمضان)

১– রামাযান মাসে কুরআন মাজীদ অবতীর্ন করা হয়েছেঃ

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ﴾(البقرة:١٨٥)

অর্থঃ "রামাযান সেই মহিমান্বিত মাস যে মাসে দুনিয়ার সমস্থ মানুষদেরকে হিদায়েতের জন্য কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ করা হয়েছে। যে কুরআন সত্য পথ-যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশকারী, আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। (বাক্বারাহঃ ১৮৫)

২– রামাযান মাসে লাইলাতুল ক্বদর নামে এমন একটি সম্মানিত রাত আছে যার মর্যাদা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এক হাজার মাসের চেয়েও বেশীঃ এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَ مَآ أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ (القدر: ١–٣)

অর্থ: "নিশ্চয় আমি কুরআন মাজীদকে রামাযান মাসের এক মহিমান্বিত রজনীতে অবতীর্ণ করেছি। (হে মুহাম্মাদ! (ছাঃ)) সেই মহিমান্বিত রাত সম্বন্ধে আপনি কি জানেন? সেই মহিমান্বিত একটি রাতের মর্যাদা এক হাজার মাসের মর্যাদার চেয়েও বেশী। (ক্বদর ১,২,৩)

৩– রামাযান মাসে শয়তানদেরকে শৃংখলাবদ্ধ করা হয়, জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ রাখা হয়। এ প্রসঙ্গে রাছূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

" إِذَا كَانَـــتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَ مَرَدَةُ الْجِـــنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَـــنَّةِ ،فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَنَادَى مُنَادٍ : يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ . وَ يَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ . وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ "

(رواه ابن ماجه)

অর্থঃ রামাযান মাসের প্রথম রাত্র থেকেই শয়তান এবং দুষ্ট জ্বিনদেরকে বন্দি করে রাখা হয়। জাহান্নামের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়, একটি দরজাও তার খোলা থাকে না। আর

বেহেশতের সমস্থ দরজা খুলে দেয়া হয়, তার একটি দরজাও বন্ধ রাখা হয় না । আর এক ঘোষনাকারী ফেরেশতা ঘোষনা দিতে থাকেন, "হে পুণ্য অনুসন্ধানকারী ! অগ্রসর হও ,আর হে পাপ অনুসন্ধানকারী ! পিছে হঠো। আর রামাযানের প্রত্যেক রাত্রে আল্লাহপাক লোকদিগকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন । (ইবনে মাযাহ)

৪- রামাযান মাসে রোযা রাখার ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন ,

" مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه" (متفق عليه)

অর্থঃ "যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে ছাওয়াবের উদ্দেশ্যে রামাযান মাসে রোযা রাখবে , এর বিনিময়ে তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ্-খাতাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৫- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেছেন , "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছাওয়াবের নিয়তে রামাযান মাসে তারাবীর নামায পড়বে ,এর বিনিময়ে তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে। (বুখারী)

রোযার ফযীলত সমূহ (فضائل الصوم)

১– রোযাদারগণকে বেহিসাব পারিশ্রমিক দেয়া হবেঃ এ প্রসঙ্গে জনাব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)বলেছেন,

" إِنَّ رَبَّكُمْ يَقُوْلُ : كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَ الصَّوْمُ لِيْ وَ أَنَا أَجْزِيْ بِهِ"

অর্থ: " নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক মহান আল্লাহ একথা বলেছেন যে, আদম সন্তানের প্রত্যেক ভাল কাজের বিনিময় দশ থেকে সাতশত গুন বৃদ্ধি করা হয় । তবে রোযা এর ব্যতিক্রম, কেননা বান্দা একমাত্র আমার নৈকট্য লাভের জন্যেই রোযা রেখেছে– কাযেই আমি আল্লাহ তাদের রোযার পারিশ্রমিক নিজ হাতেই দান করব । (তিরমিযী)

২– রোযা পরহেযগারী ও ধর্মভীরুতা অর্জনের অন্যতম মাধ্যমঃ এ প্রসঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই বলেছেন:

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ﴾ (البقرة:١٨٣)

অর্থঃ " হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযাকে ফরয করে দেয়া হয়েছে, যেমনভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করে দেয়া হয়েছিল, যেন তোমরা পরহেযগারী হতে পার। (বাক্বারাহঃ১৮৩)

৩– রোযাদারের দু'আ অবশ্যই কবুল করা হয়ঃ এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন , ৩ শ্রেনীর মানুষের দু'আ অবশ্যই

কবূল করা হয়। রোযাদারের দু'আ , অত্যাচারিত ব্যক্তির দু'ও
এবং মুসাফিরের দু'আ । (বায়হাকী..)

৪– রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মিশ
আম্বারের চেয়েও অধিক সুগন্ধময় ।

৫– রোযা রোযাদারের জন্য এবং কুরআন মাজীদ কুরআ
অধ্যায়নকারীর জন্য কাল ক্বিয়ামতের দিন সুফারিশ করবে
(আমাদ ও হাকেম)

৬– আল্লাহ্ তা'আলা "আর-রাইয়ান" নামক জান্নাতের এর্ক
দরজাকে শুধুমাত্র রোযাদারদের প্রবেশের জন্য নির্ধারণ ক
রেখেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৭– জনাব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রা
বা আল্লাহ্‌কে খুশী করার জন্য একদিন রোযা রাখবে, এ
বিনিময়ে আল্লাহ্‌পাক তাকে জাহান্নাম থেকে ৭০ বছরের রা
বরাবর দুরে সরিয়ে রাখবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৮– জনাব রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেছেন , যে ব্যক্তি রামাযান মা
৩০ টি ফরয রোযা রাখার পরে শাওয়াল মাসে ৬টি নফল রো
রাখবে, এর বিনিময়ে সে সারা বছর রোযা রাখার ছাওয়
পাবে। (মুসলিম,আবূদাউদ...)

আমরা রামাযান মাসকে কিভাবে অভ্যর্থনা জানাব ?

(كيف نستقبل شهر رمضان)

১– রামাযান মাস শুরু হওয়ার আগেই আত্মশুদ্ধির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা ঃ সকল প্রকার পাপ পঙ্কিলতা হতে তাওবা করে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমেই এই আত্মশুদ্ধি গ্রহণ করা যেতে পারে । এমনি ভাবে আল্লাহর ঐ সমস্ত নাফরমানী কাজ পরিত্যাগ করার মাধ্যমেও আত্মশুদ্ধি করা যেতে পারে – যে সমস্ত নাফরমানী কাজ মানুষের দ্বারা সচারাচার সংঘটিত হয়ে থাকে, যেমন যিনি তার পিতা-মাতার সাথে অবাধ্য আচরণ করেছেন , তিনি তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করবেন। যিনি কারো সাথে তার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, তিনি তা পুনরুদ্ধার করবেন । যিনি গান বাজনা শ্রবণে অভ্যস্ত তিনি তা বর্জন করবেন, এবং কুরআন তিলাওয়াতে আত্ম নিয়োগ করবেন । আর যিনি সুদি কারবারের সাথে জড়িত আছেন, তিনি উহা বর্জন করবেন, এবং এরপর থেকে আর কোন হারাম উপার্জনের নিকটবর্তী হবেন না, আর সর্বদা হালাল উপার্জন করা ও হালাল খাওয়ার চেষ্টা করবেন । এমনি ভাবে রামাযান মাস শুরু হওয়ার আগেই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য উচিত হবে যে– তার পূর্বের কৃত আমলসমূহ পর্যালোচনা করে সকল প্রকার গুনাহ-খাতাহ হতে তওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসা ।

২– রামাযান মাসব্যাপী এমন ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করা , যাতে মানুষ তার ইচ্ছা মুতাবিক মাসের পূরা সময়টাকে কাজে লাগাতে পারে । যেমন একজন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী তিনি তার ব্যাবসায়ে লাভের মৌসুমে পূর্ণমাত্রায় লাভের উদ্দেশ্যে সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন । ঠিক এমনিভাবে একজন সচেতন মুসলমানের জন্য উচিৎ হবে যে, তিনি পবিত্র রামাযান মাসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পূর্ন আনুগত্য করার জন্য এবং সমস্ত ভাল কাজ করার জন্য এমন একটি পূর্নাঙ্গ কর্মসূচী নির্ধারণ করবেন,যে কর্মসূচী অনুযায়ী তিনি পূরা রামাযান মাস ইবাদাত বন্দেগী করে কাটিয়ে দিতে পারেন।

৩– পবিত্র রামাযান মাসে রোযা রেখে আল্লাহর নিকট অধিক পরিমানে কাকুতি-মিনতি সহকারে দু'আ করা, কুরআন তেলাওয়াত করা ,নফল নামায পড়া ও দান খায়রাত করা– যার ফলে আল্লাহ তা'আলা রোযাদারগণকে তাঁর মর্জি মুতাবিক রামাযান মাসের রোযা, নফল নামায, এছাড়া অন্য সৎকাজ করাকে সহজ সাধ্য করে দিবেন। এবং রোযা নষ্টকারী সম্ভাব্য সকল বস্তু অথবা রোযার ছাওয়াব কমিয়ে দেয় এধরণের সকল কাজ রোযাদারগণ হতে দূরে রাখবেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, "দু'আই হলো ইবাদত"

রোযা নষ্টকারী বস্তু সমূহ (مفسدات الصوم)

১– স্ত্রী সহবাসঃ যখনই কোন রোযাদার ব্যক্তি রামাযান মাসে দিনের বেলায় তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে তখনই তার রোযা ভেঙ্গে যাবে, আর তার জন্য পুনরায় ঐ রোযা অবশ্যই আদায় করতে হবে এবং সেই সাথে বড় ধরনের কাফফারাও আদায় করতে হবে । কাফ্ফারা হলোঃ একজন মু'মিন গোলামকে আজাদ করা, এই মুসলমান গোলাম যদি না পাওয়া যায়-তাহলে সে একাধারে দুই মাস রোযা রাখবে,এই রোযা রাখা তার পক্ষে যদি সম্ভব না হয়– তাহলে সে ৬০ জন মিসকিনকে খাওয়াবে।

২– আহার ও পানাহার করাঃ তা যে কোন ধরনের খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য হউক না কেন ।

৩– খাদ্যযুক্ত সিলাইন শরীরে প্রবেশ করানো।

৪– মেয়েদের হায়েয অথবা নেফাসের রক্ত বের হওয়া।

৫– সিঙ্গা এবং এ ধরনের অন্য কিছুর সাহায্যে দুষিত রক্ত বের করে দেওয়া। তবে কোন মাধ্যম ছাড়া আপন গতিতে যদি রোযাদারের শরীর হতে রক্ত বের হয়– তাহলে রোযা নষ্ট হবে না। যেমন নাকদিয়ে রক্ত বের হওয়া রুগী।

৬– ইচ্ছাকৃত ভাবে বমি করাঃ যদি অনিচ্ছাকৃত ভাবে কেউ বেশী বমিও করে-তাহলে তার রোযা নষ্ট হবেনা ।

৭- জাগ্রত অবস্থায় হস্ত মৈথুন অথবা স্ত্রী সহবাস অথবা স্ত্রীকে স্পর্শ ও চুম্বন করার কারনে বীর্যপাত ঘটলে অথবা এছাড়া অন্য কোন কারনে বীর্যপাত ঘটলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে ।

যে সমস্ত কাজের দ্বারা রোযা নষ্ট হয়না

(الأفعال التي لا تفسد الصوم)

১- শরীরে রক্ত পুশ করা এবং ঐ ইনজেক্শন ব্যবহার করা যা খাদ্যের কাজ করেনা ,এ সমস্ত কাজ রোযা নষ্টকারীর মধ্যে গণ্য নহে।

২- খাদ্যের স্বাদ (পরীক্ষার জন্যে) গ্রহণে রোযা নষ্ট হয় না। তবে শর্ত হলো- উহা যেন কণ্ঠনালীতে বা পেটে প্রবেশ না করে।

৩- রোযা থাকা অবস্থায় চোখে সুরমা ব্যবহার করা এবং চোখে বা কানে কোন ঔষধের ফোঁটা ফেলা, এ ধরনের আরো অন্য কোন জিনিষ ব্যবহার করা জায়েয, ইহাতে রোযার কোন ক্ষতি হবে না ।

৪- রোযা রাখা অবস্থায় অত্যধিক গরমের কারনে মাথায় ঠান্ডা পানি ঢেলে দেয়া এবং ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করা জায়েয । (আবূ দাউদ, আহমাদ উহার সনদ ছহীহ)

৫– কোন ব্যক্তি রোযা রেখে ছুবহি ছাদিকের পরেও অপবিত্র থাকলে তার রোযা নষ্ট হবেনা। কেননা জনাব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন কোন সময় স্ত্রী সহবাসের কারণে ছুবহি ছাদিকের পূর্বে তিনি অপবিত্র হয়ে পড়তেন- অতঃপর তিনি ছুবহি ছাদিকের পরে গোসল করতেন,নামায পড়তেন এবং রোযাও রাখতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৬– রোযা রাখা অবস্থায় ভুলে কোন কিছু খেলে অথবা পান করলে রোযা ভাঙ্গেও না এবং মাকরূহও হয়না । (বুখারী)

৭– রোযা অবস্থায় "মজী"বের হলে অথবা স্বপ্নদোষ হলে রোযা ভাঙ্গে না এবং মাকরূহও হয় না (বুখারী

৮– রোযা অবস্থায় নিজের স্ত্রীকে চুম্বন করা এবং জড়িয়ে ধরা জায়েয। তবে শর্ত হলো নিজ প্রবৃত্তিকে কন্ট্রোল করার পূর্ণ ক্ষমতা থাকতে হবে । (বুখারী)

৯– রোযা থাকা অবস্থায় অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি হয়ে গেলে তাতে রোযা ভাঙ্গে না। (ইবনে মাজাহ)

রোযার সাথে সম্পৃক্ত কয়েকটি গুত্বপূর্ণ মাস'আলাহ (المسائل المهمة التي تتعلق بالصيام)

১- রামাযান মাসে ফজরের আযানের পূর্বে সাহরীর জন্য আযান দেয়া সুন্নাত । (বুখারী)

২- ইফতার তাড়াতাড়ী করা এবং সাহরী দেরীতে খাওয়া নাবীগণের সুন্নাত (ত্বাবারানী)

৩- সাহরী খেতে খেতে আযান হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে খানা ছেড়ে না দিয়ে বরং প্রয়োজনে তাড়াতাড়ি খানা খেয়ে নিবে । (আবূদাউদ)

৪- রোযা খোলার সময় বা ইফতার করার সময় নিম্নোও দুয়া পড়া সুন্নাত। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ইফতার করতেন, তখন তিনি এই দূ'আ পড়তেন।

" ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الأَجْرُإن شَاءَ اللّٰهُ " (رواه أبو داود)

উচ্চারণঃ "যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূকু ওয়া সাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ" অর্থঃ তৃষ্ণা দূর হল, শিরা-উপশিরা সিক্ত হল, এবং আল্লাহর ইচ্ছায় ছাওয়াবও নির্ধারিত হ'ল । (আবূদাউদ)

৫-যদি কোন ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করায়,তাহলে সে রোযাদারের সমান ছাওয়াব পাবে। (তিরমিযী)

৬– রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ইমানের সাথে ছাওয়াবের নিয়তে রামাযান মাসে তারাবীর নামায পড়বে, এর বিনিময়ে তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। (বুখারী)

৭– রোযা থেকে অন্যের গীবত করা, মিথ্যা কথা বলা, গালি-গালাজ করা, ঝগড়া-বিবাদ করা, বেহুদা কথা বলা, অশ্লীল কাজ-কর্ম করা সবই হারাম ও নাজায়েয। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি রোযা থাকা অবস্থায় মিথ্যা কথা এবং মিথ্যা কার্যক্রম থেকে বিরত থাকল না, সে ব্যক্তি খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য হতে বিরত থেকে (অর্থাৎ নামকি ওয়াস্তে রোযা থেকে) আল্লাহর নিকট কোন ছাওয়াবই পাবেনা।" (বুখারী)

৮– জনাব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ইমামের সাথে অর্থাৎ জামা'আত বদ্ধভাবে তারাবীর নামায পড়তে শুরু করল এবং ইমাম সাহেব নামায শেষ না করা পর্যন্ত সে জামা'আতের সাথে তারাবীর নামায পড়ল – এর বিনিময়ে তার জন্যে সারা রাত নফল ইবাদতের ছাওয়াব লেখা হবে।" (তিরমিযী)

৯– জনাব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে ওমরা আদায় করার ফযীলত বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন, "যে ব্যক্তি রামাযান মাসে ওমরা করবে–সে আমার সাথে থেকে হজ্জ করার সমপরিমাণ ছাওয়াব পাবে।" (বুখারী)

১০- ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন রোযা রাখা নিষেধ, আর শুধু জুমু'আর দিন রোযা রাখা মাকরূহ। (বুখারী ও মুসলিম)

১১- জনাব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরে ঈমানের সাথে ও ছাওয়াবের নিয়তে ইবাদাত করবে তার পূর্বের গুনাহ সমুহ মাফ করে দেয়া হবে।" (বুখারী)

১২- জনাব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, "তোমরা রামাযানের শেষ ১০ তারিখের বেযোড় রাত সমূহে লাইলাতুল কদরকে তালাশ কর।" (বুখারী)

১৩- জনাব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে খুব বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত করতেন এবং আল্লাহর রাস্তায় খুব বেশী বেশী দান-খায়রাত করতেন । (বুখারী ও মুসলিম) অতএব আমাদেরও উচিত হবে, পবিত্র রামাযান মাসে বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত করা এবং বেশী বেশী দান-খায়রাত করা ।

১৪- জনাব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকল মুসলমানের তরফ থেকে, চাই সে গোলাম হোক বা আযাদ,পুরুষ হোক বা মহিলা, ছোট হোক বা বড়, রোযাদার হোক বা গায়ের রোযাদার,নেছাবের মালিক হোক বা না হোক, ১ ছাঁ করে ছাদকাতুল ফিতর আদায় করা ফরয করে দিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম) ছাদকায়ে ফিতরের পরিমাণ ১ ছাঁ, যা ৩ সেরের কিছু কম অথবা আনুমানিক আড়াই কেজির সমান ।

১৫–ছাদকায়ে ফিতর ঈদের নামাযের পূর্বে আদায় করতে হবে অন্যথায় উহা সাধারণ ছদকাহ্ হিসাবে গণ্য হবে। (আহমাদ ও ইবনে মাযাহ্)

১৬–ঈদুল ফিতরের নামাযের জন্য ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে কোন মিষ্টি বস্তু খাওয়া সুন্নাত। (বুখারী) আর ঈদুল আযহায় নামাযের পর কোন কিছু খাওয়া সুন্নাত। (তিরমিযী)

১৭– ঈদের নামাযের জন্য ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং ঈদের নামায শেষে পায়ে হেঁটে ফিরে আসা সুন্নাত । (ইবনে মাযাহ্) এ ছাড়া এক রাস্তা দিয়ে ঈদগাহে যাওয়া এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ঈদগাহ হতে ফিরে আসা সুন্নাত । (বুখারী)

১৮– ঈদের নামাযের জন্য মহিলাদেরকেও ঈদগা[illegible] যাওয়া উচিত । (বুখারী ও মুসলিম)

১৯– দুই ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ১২টি তাকবীর দেওয়া সুন্নাত। প্রথম রাকা'আতে কিরা'তের পূর্বে ৭ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে কিরা'আতের পূর্বে ৫ তাকবীর । (তিরমিযী)

২০–নামাযের জন্য ঈদগাহে যাওয়ার সময় এবং নামায শেষে ঈদগাহ্ হতে ফিরে আসার সময় বেশী বেশী তাকবীর বলা সুন্নাত । (শাফেয়ী) ঈদের নামাযের পরে সবাই মিলে একে অপরের সাথে কুলাকুলি করা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়।

২১– যদি কেউ ঈদের নামায না পায়, অথবা কোন অসুবিধার কারণে ঈদগাহে যদি আসতে না পারে,তাহলে সে একা দুই রাকা'আত নামায পড়ে নিবে । (বুখারী)

২২– জনাব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, "সর্ব উত্তম ছাদকাহ হলো রামাযান মাসে ছাদকাহ করা।" (তিরমিযী)

২৩– রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর বহু হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, তারাবীহ, জুম'আ, দুই ঈদ ও জানাযার নামায মেয়েরা মাসজিদে ও ঈদগাহে যেয়ে জামা'আত বদ্ধভাবে আদায় করতে পারবে।

২৪– জনাব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে রাতে ৮ রাকা'আত তারাবীহ এবং ৩ রাকা'আত বিতর আর অন্যান্য মাসে রাতে ৮ রাকা'আত তাহাজ্জুদ এবং ৩ রাকা'আত বিতর এভাবে তিনি রাতে মোট ১১ রাকা'আত নামায পড়তেন। (বুখারী)

حكم التوسل بالأولياء والصالحين

إعداد:

الداعية: أبو الكلام أزاد

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسلي

পীর-মুর্শিদ ও অলী-আওলীয়াদের

অসীলা ধরার বিধান

প্রণয়নেঃ আবুল কালাম আযাদ
(লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়)

মাল-সুলাই ইসলামী দা'ওয়া সেন্টার

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى مَنْ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি একক এবং দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সেই মহানাবীর প্রতি-যার পরে আর কোন নাবী আসবে না। অতঃপর বর্তমান যুগে অধিকাংশ মুসলমান তাদের প্রতিপালক মহান আল্লাহ্ সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞান ও সঠিক ধারণা না থাকার কারণে এবং ইসলামী শরীয়াত সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে মুসলমানদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের শিরক, বিদ'আত ও খুরাফাত অর্থাৎ ধর্মীয় ব্যাপারে বাজে গল্প-গুজব, বাজে চিন্তা ধারনার সয়লাব বয়ে গেছে। অপরদিকে অধিকাংশ সরলমতি মানুষেরা মুসলিম সমাজে পীর-মুর্শিদ, অলী-আওলীয়া নামধারী বেশ কিছু সংখ্যক আলেমদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে যেয়ে খুব বাড়াবাড়ি করে চলেছে। আর এটাই বর্তমান মুসলিম সমাজে বহুল প্রচলিত বড় শিরকের মাধ্যম হিসাবে গণ্য। কেননা অধিকাংশ মানুষ এই ধারণা পোষণ করে যে, ঐ সমস্ত পীর-মুর্শিদ ওলী-আওলিয়ারা মানুষের ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখে। আর এজন্যেই অধিকাংশ মানুষ বিপদে-আপদে পড়ে মহান আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা ও আবেদন না জানিয়ে ঐ সমস্ত পীর-মুর্শিদ, ওলী-আওলিয়াদের নিকট ছুটে যায় এবং তাদের কাছে প্রার্থনা ও আবেদন-নিবেদন জানিয়ে থাকে। এছাড়া তাদের জীবদ্দশায় তাদেরকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে, আর তাদের মৃত্যুর পর তাদের কবর সমূহের চারি পার্শে তওয়াফ করে, এই ধারণা

নিয়ে যে- ঐ সমস্ত পীর-মুর্শিদ, ওলী-আওলিয়াদের মাধ্যমে তারা একদিকে সকল প্রকার বিপদ-আপদ ও দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত হবে এবং তাদের সকল প্রকার প্রয়োজন পূর্ণ হবে। আর অপর দিকে তারা ঐ সমস্ত পীর-মুর্শিদ, ওলী-আওলিয়াদের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাছিল করবে।

পক্ষান্তরে আল্লাহ্ এবং ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে ঐ সমস্ত জাহেল ও মূর্খ মানুষেরা যদি আল্লাহ্র কুরআন এবং রাসূলের সুন্নাতের দিকে ফিরে আসত! এবং দু'আ ও অসীলা সম্পর্কে কুরআন ও রাসূলের সুন্নাতে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সে সম্পর্কে একটু নন্তা-ভাবনা করত! তাহলে অবশ্যই তারা শরীয়ত সম্মত সঠিক বা প্রকৃত অসীলার তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত হতে পারত।

শরীয়তসম্মত সঠিক অসীলার বিবরণঃ

১। শরীয়তসম্মত প্রকৃত অসীলা উহাই, যা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সালামের পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে অর্জিত হয়। যেমন- আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আদেশগুলি যথাযথ ভাবে পালন করার মাধ্যমে এবং তাঁদের নিষেধকৃত সকল প্রকার হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে।

২। সৎ কাজের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাছিল করা যায়।

৩। এ ছাড়া আল্লাহ্ তা'আলার যে সমস্ত সুন্দরতম ও গুণবাচক নাম আছে, সে সমস্ত নাম উল্লেখ করে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করা।

উল্লিখিত তিনটি বিষয় আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য, রহমত ও সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম ও পন্থা।

অপরদিকে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজন মিটানোর জন্য এবং বিভিন্ন প্রকার বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মৃত ব্যক্তিদের কবরে গিলাফ চড়ানো, শামিয়ানা টাঙ্গানো, আলোকসজ্জা করা, আগরবাতি, মোমবাতি জ্বালানো, কবরের উপরে আতর, গোলাপ ও ফুল ছিটানো, ফ্যান চালানো; এছাড়া কবরবাসীর জন্য নযর-নিয়ায প্রদান করা, কবরে তাওয়াফ করা, কুরআন শরীফ পাঠ করা, ভীত-সন্ত্রস্ত ও নমনীয়ভাবে নামাযের কায়দায় কবরের পাশে বসা বা কবরকে সামনে নিয়ে সিজদা করা এবং কবরবাসীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে তা (আল্লাহর নৈকট্য) হাছিলের চেষ্টা করা কোন রকমেই শরীয়ত সম্মত নয় বরং হারাম। কেননা ইহা বিদ'আতী ও শিরকী কাজ। এ সমস্ত কাজ থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করি।

হযরত উমার ফারূক (রাযিআল্লাহু আনহু) তাঁর সময়ে একদা "ছালাতুল এসতেসকাতে" অর্থাৎ পানি প্রার্থনার দু'আতে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের চাচা হযরত আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু)-কে অসীলা করে আল্লাহ্র কাছে পানির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। "মানুষের দ্বারা অসীলা গ্রহণ করা জায়েয"-এর স্বপক্ষে অনেকেই হযরত উমার ফারূক (রাযিআল্লাহু আনহু) হযরত আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর দ্বারা পানীর জন্য যে অসীলা গ্রহণ করেছিলেন তাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে থাকেন। তবে কথা হলো-হযরত উমার

ফারূক (রাযিআল্লাহু আনহু) হযরত আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর দু'আর মাধ্যমে অসীলা গ্রহণ করেছিলেন, তিনি হযরত আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর ব্যক্তি সত্তার মাধ্যমে অসীলা গ্রহণ করেন নাই।

প্রকাশ থাকে যে, কোন মানুষের দু'আর মাধ্যমে অসীলা গ্রহণ করা আর কোন মানুষের ব্যক্তি সত্তার মাধ্যমে অসীলা গ্রহণ করা এক বস্তু নয়। কারণ কোন জীবিত ও নেক্কার মানুষের দু'আর মাধ্যমে অসীলা তলব করা জায়েয ও শরীয়তসম্মত। কাজেই হযরত উমার ফারূক (রাযিআল্লাহু আনহু) শরীয়তসম্মত পন্থায় অসীলা তলব করেছিলেন। অপরদিকে কোন জীবিত বা মৃত নেককার মানুষের শুধু ব্যক্তি সত্তার দ্বারা অসীলা তলব করা শরীয়তে জায়েয নাই।

আর সুস্থ বিবেক ও জ্ঞান সম্পন্ন কোন মানুষের পক্ষে একথা স্বীকার করা আদৌ সম্ভব নয় যে, একজন মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার সমস্ত শরীরের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়, তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি অকেজো হয়ে যায়- এসব কিছুর পরেও ঐ মৃত ব্যক্তি তার নিজ নফসের জন্য কোন উপকার করতে পারে। আর ঐ মৃত ব্যক্তির পক্ষে অন্যলোকের কোন উপকার করা এটাতো বলার অবকাশই রাখেনা।

মৃত্যুর পর মানুষ কোন প্রকার কাজ করার ক্ষমতা রাখেনা, এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সালাম বলেছেনঃ

(إِذَا مَـــاتَ إِنْـــسَانُ آدَمَ إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ ...)

অর্থঃ যখন কোন আদম সন্তান মৃত্যুবরণ করে, তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিন প্রকার আমল যা কোন সময় বন্ধ হয় না। (১) ছাদকায়ে জারিয়াহ্ যেমন- মাসজিদ, মাদ্‌রাসা তৈরী করা, হাসপাতাল তৈরী করা ইত্যাদি। (২) অথবা এমন এলেম বা জ্ঞান রেখে যাওয়া যার দ্বারা মৃত ব্যক্তি উপকৃত হতে পারে। (৩) অথবা এমন সু-সন্তান রেখে যাওয়া, যে তার মৃত পিতার জন্য দু'আ করে। উক্ত হাদীছের দ্বারা এটাই প্রমাণিত হলো যে, কবরে শুয়ে থাকা মৃত ব্যক্তিরা দুনিয়ায় যারা বেচে আছেন তাদের প্রতি চরমভাবে মুখাপেক্ষী, এই জন্য যে, দুনিয়ার জীবিত মানুষেরা মৃত মানুষদের সমস্ত পাপের ক্ষমার জন্য, জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির জন্য এবং তাদের জান্নাত লাভের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করবে। অপর দিকে দুনিয়ার জীবিত মানুষেরা কবরে শুয়ে থাকা মৃত মানুষদের দু'আর প্রতি কোন প্রকারেই মুখাপেক্ষী নয়। কেননা উক্ত হাদীছই স্বীকৃতি প্রদান করছে যে-আদম সন্তানের মৃত্যুর সাথে সাথে তার সকল আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

অতএব, জীবিত মানুষেরা যেভাবেই অনুনয় ও বিনয় করে দীর্ঘ সময় ধরে মৃত ব্যক্তিদেরকে ডাকুক না কেন- মৃত ব্যক্তিদের পক্ষে তাদের ডাকে সাড়া দেয়া আদৌ সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

﴿وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مَايَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ * اِنْ تَدْعُوْهُمْ لاَيَسْمَعُوا دُعَائَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوْا مَااسْتَجَابُوالَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ.﴾ (فاطر: ١٣،١٤)

অর্থঃ আর তোমরা সেই মহান আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদেরকে (উপাস্য মনে করে) ডাক, তারা তো তুচ্ছ-সামান্য একটা খেজুরের আঁটির ও মালিক নয়। তোমরা যাদেরকে তোমাদের সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী মনে করে ডাক, তারা তোমাদের সে ডাক শুনে না। আর যদি তোমাদের ডাক তারা শুনতেও পায়, তবে তারা তোমাদের সে ডাকে সাড়া দিতে পারে না। (সূরা ফাতির ঃ ১৩-১৪) আর এটা জানা কথা যে, যিনি কোন কিছুর মালিক নন তিনি অপরকে কিছু দিতে পারেন না। আর যিনি কোন কিছুই শুনতে পাননা, তিনি কোন কিছুরই জবাব দিতে পারেন না এবং কোন কিছুরই খবর ও রাখেন না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

﴿وَلاَ تَدْعُ مِنْ دوْنِ اللهِ مَالاَ يَنْفَعُكَ وَلاَيَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظَّالِمِيْنَ * وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ (يونس: ١٠٦، ١٠٧)

অর্থঃ (হে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সালাম) আপনি আল্লাহ্ ব্যতীত এমন আর কাউকে ডাকবেন না, যিনি আপনার কোন প্রকার ভাল ও মন্দ করার কোন ক্ষমতা রাখেন না। কাজেই হে নবী! আপনি যদি এমন কাজ করেন? তাহলে আপনিও জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। (শুধু তাই নয় হে নবী!) আল্লাহ্ যদি আপনার উপর কোন কষ্ট ও বিপদ-আপদ আরোপ করেন ; তাহলে একমাত্র সেই আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহই ঐ বিপদ-আপদ দূর করতে পারবে না। এমনিভাবে আল্লাহ্ যদি

আপনার কিছু কল্যাণ দান করেন, তবে আল্লাহ্‌র মেহেরবানীকে বন্ধ করার মত আর কেহই নেই। (সূরা ইউনুস ঃ ১০৬-১০৭)

তাহলে উক্ত আয়াত দুটি দ্বারা এটাই প্রমাণিত হলো যে- একমাত্র আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ায় আর যে সমস্ত নামধারি (পীর-মুর্শিদ, গাউস-কুতুব, খাজাবাবা, দয়ালবাবা, ওলী-আওলীয়া, যেমন বর্তমান বাংলাদেশের সাঈদাবাদী, দেওয়ানবাগী, চরমোনাই, আটরশি, চন্দ্রপুরী, শাহ্‌জালাল, খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী এবং বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী ইত্যাদি যারা আছেন তাদের কেহই মানুষের সামান্যতম ভাল ও মন্দ করার ক্ষমতা রাখেন না।

পীর, কবর ও মাযার পূজারীদের অনেকেই বলে থাকে যে- আমরা যে সমস্ত উদ্দেশ্য নিয়ে পীর-ফকীর, ওলী-আওলীয়াদের নামে বিভিন্ন ধরনের মান্নত ও হাদীয়া দিয়েছি এবং তাদের কাছে আবেদন-নিবেদন ও প্রার্থনা করেছি, সেই সমস্ত উদ্দেশ্য হাছিল হয়েছে-ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আর যদি ধরে নেওয়া যায় যে-সত্যিই তাদের উদ্দেশ্য হাছিল হয়েছে, তাহলে এ ব্যাপারটা দুটি বিষয়ের মধ্য হতে যে কোন একটি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। বিষয় দুটি নিম্নরূপঃ

১। উল্লিখিত মানুষদের উদ্দেশ্য হাছিলের বিষয়টা হয়ত এমন হবে যে- যে বিষয়ের উপর সৃষ্টজীব মানুষ স্বভাবগত ভাবে ক্ষমতা রাখে। কাজেই মানুষেরা এ ধরনের বস্তু শয়তানদের সহযোগীতায় হাছিল করতে পারে।কেননা শয়তানেরা সর্বদা কবরসমূহের নিকট উপস্থিত থাকে, এরপর মানুষেরা যখন আল্লাহ্‌র ইবাদত ছেড়ে দিয়ে ঐ সমস্ত পীর-মুর্শীদ, ওলী-

আওলীয়াদের কবরে, মাযারে গিয়ে এবং বিভিন্ন প্রকার দেব-দেবী তথা মূর্তীদের সামনে গিয়ে ইবাদত বন্দেগী ও পূজা-পার্বন করতে থাকে- তখন শয়তানেরা সে সমস্ত জায়গায় গিয়ে সরলমতি মানুষদের স্বাভাবিক তাওহীদবাদী চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণাকে নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করে। আর পরিশেষে তাদেরকে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট করে ফেলে। যেমনভাবে শয়তানেরা প্রাচীন যুগে হযরত নূহ (আঃ)-এর কওমকে প্ররোচনা দিয়ে তাওহীদ তথা ইসলামের পথ থেকে পথভ্রষ্ট করে মূর্তি পূজারীতে পরিণত করেছিল। প্রথমে শয়তানেরা হযরত নূহ (আঃ)-এর কওমের শ্রদ্ধাভাজন পূর্ববর্তী ওলী-আওলিয়াদের ছুরত বা আকৃতি ধারণ করে তাদের সামনে এসে বিভিন্ন ধরনের অলৌকিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়াদির খবর দিয়ে তাদেরকে আকৃষ্ট করে। এরপর শয়তানেরা তাদেরকে পরামর্শ দেয় যে, দেখো! তোমাদের পূর্ব পুরুষেরা ওলী-আওলিয়া, পীর, মুর্শিদ ছিল। তোমরা যদি তাদের ছবি অংকন করে মাসজিদের ভিতরে পিছনের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখ ; আর মাঝে মাঝে তাদের ছবিগুলি দেখ, তাহলে তাদের আকৃতি এবং তাদের অধিক ইবাদত বন্দেগীর কথা স্মরণ করে তোমরাও বেশি বেশি ইবাদত বন্দেগী করতে পারবে। শয়তানের এই পরামর্শ পেয়ে খুব খুশী হয়ে তারা তাদের পূর্ব পুরুষদের ছবি অংকন করে মাসজিদের ভিতর পিছনের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখে। এরপর মাঝে মাঝে ঐ সমস্ত ছবি দেখে, তাদের কথা স্মরণ করে, ইবাদত বন্দেগী করতে থাকে।

এই অবস্থা বহুদিন চলার পর শয়তানেরা পুনঃরায় তাদেরকে পরামর্শ দেয় যে, তোমরা এই ছবিগুলিকে পিছনে না রেখে বরং সামনে দেয়ালের সাথে ঝুলিয়ে রাখ। তাহলে তোমরা নামায পড়ার সময় ঐ ছবিগুলি অতি সহজে তোমাদের সামনে দেখতে পাবে, আর তাদের কথা স্মরণ করে ইবাদতে মনোনিবেশ করতে পারবে। তারা তাই করলো। এই অবস্থা বহুদিন চলার পরে শয়তানেরা তাদেরকে পুনঃরায় পরামর্শ দেয় যে, তোমরা যদি এই ছবিগুলিকে সুন্দরভাবে বড় আকারের মূর্তি বানিয়ে দেয়ালের পার্শ্বে খাড়া করিয়ে রেখে ইবাদত কর ; তাহলে তোমাদের ইবাদত খুবই ভাল হবে।

মোটকথা শয়তানেরা এভাবেই হযরত নূহ (আঃ)-এর কওমকে তাওহীদ তথা ইসলামের পথ থেকে পথভ্রষ্ট করে শিরক তথা মূর্তি পূজারীতে, হিন্দুতে পরিণত করেছিল। আর এটাই হলো মূর্তিপূজা তথা হিন্দু ধর্ম সৃষ্টির গোড়ার কথা।

এমনিভাবে শয়তানেরা গণক ও যাদুকরদের নিকট দুনিয়ায় বর্তমান ঘটমান বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে খবর পরিবেশন করে থাকে, আর এই সুযোগে ঐ সমস্ত গণক, যাদুকর এবং ভন্ড পীর-মুর্শিদরা দুষ্ট শয়তানদের সহযোগীতায় মানুষের কিছু কিছু প্রয়োজন মিটাতে পারে, আর কিছু কিছু সমস্যা ও দূর করতে পারে, যেটা মানুষের পক্ষে সম্ভব। এমনিভাবে দুষ্ট শয়তানেরা মূর্তিসমূহের ভিতরে প্রবেশ করে মূর্তি পূজারীদের সাথে কথা বলে এবং তাদের বিভিন্ন প্রয়োজন ও মিটিয়ে থাকে।

২। অথবা মানুষদের উদ্দেশ্য হাছিলের বিষয়টা এমন হবে যে, যে বিষয়ের উপর একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহই ক্ষমতা

রাখেনা। যেমন জীবন-মরণ, সুস্থতা, ধনাঢ্যতা ও দারিদ্রতা ইত্যাদি। এসমস্ত জিনিস দান করা একমাত্র আল্লাহ্‌র কাজ। আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহই এ সমস্ত বিষয়ের সামান্যতম কোন ক্ষমতা রাখেনা। আসমান-যমীন তথা এই পৃথিবী সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জীবন, মরণ, রিযিক, ধনাঢ্যতা, দারিদ্রতা এ সমস্ত জিনিস নির্ধারণ করে রেখেছেন। কাজেই এই সমস্ত জিনিস জীবিত বা মৃত পীর-মুর্শিদ, গাউস-কুতুব, ওলী-আওলিয়াদের কিরামতিতে বা তাদের দু'আর বরকতে পাওয়া যায় না।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও বই-পুস্তকে দেখতে পাওয়া যায় যে, বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রাহেঃ), খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী দয়াল বাবা, খাজা বাবা, আটরশী, সাঈদাবাদী ও দেওয়ানবাগী ইত্যাদি এই সমস্ত পীর-আওলিয়াদের দু'আর বরকতে বহু মানুষ তাদের বিবাহ করার দীর্ঘ ১০, ১৫, ২০ বছর পরে সন্তান লাভ করেছে। তাদের দু'আর বরকতে নদীতে নৌকা, লঞ্চ, ও জাহাজ ডুবির হাত থেকে বেঁচে গেছে এবং রাস্তায় যান-বাহনের দুর্ঘটনা হতে রক্ষা পেয়েছে ইত্যাদি। মানুষের এ ধরনের বিশ্বাস করা শিরকী কাজ। কারণ কাউকে ছেলে-মেয়ে দান করা, বিভিন্ন প্রকার বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করা, একমাত্র আল্লাহ্‌র পক্ষেই সম্ভব- কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

অতএব, জ্ঞানবান মানুষদের উচিত হবে যে, তারা যেন এ সমস্ত ধর্মীয় বিষয়ে কোন প্রকার গাল-গল্প, গুজব এবং ভিত্তিহীন চিন্তা-ভাবনাকে বিশ্বাস না করে, কারণ এগুলি মানুষকে

বিপথগামী করার, মূর্খতায় নিমজ্জিত করার অন্যতম কারণ ও উৎস। আর এগুলি চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের জন্য অন্ধত্বের সমতুল্য আর হৃদয়বান ব্যক্তিদের জন্য মৃত্যুর সমতুল্য। কাজেই তারা যেন সর্বাবস্থায়ই তাদের অন্তকরণকে আল্লাহ্‌র দিকেই নিবিষ্ট করে। তারা যেন তাদের সকল প্রকার প্রয়োজন মিটানোর জন্য একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করে। কোন প্রকারেই যেন কোন মানুষ বা সৃষ্টি জীবের উপর ভরসা না করে। কেননা প্রত্যেক মানুষ বা সৃষ্টজীব আল্লাহ্‌র ক্ষমতার মোকাবেলায় দূর্বল, মিসকীন, তাদের ভিতরে মূর্খতা ও অপরাকতায় ভরপুর। আর ঐ কবরবাসীরা এমন দূর্বল ও অপারগ যে, তারা কবরে তাদের দেহের উপর চাপা দেয়া মাটিগুলিকেও সরিয়ে ফেলার ক্ষমতা রাখে না।

ধারণাকৃত কারামত সমূহ (الكرامات المزعومة)

আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার মানুষদেরকে হিদায়েত করার জন্য যুগে যুগে অগণিত, অসংখ্য নাবী ও রাসূলগণকে প্রেরণ করেছিলেন। আর এই উদ্দেশ্যকে পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মাঝে মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী নাবী ও রাসূলগণকে "মু'জিযাহ" দান করে তাদেরকে সাহায্য ও শক্তিশালী করেছিলেন সাধারণ মানুষের মোকাবিলায়। এমনিভাবে আল্লাহ্ তাঁর কিছু কিছু নেক্‌কার বান্দাদেরকে ও "কারামত" অর্থাৎ মর্যাদা ও অলৌকিক ঘটনা দিয়ে সম্মানিত করেন। অপরদিকে ভন্ড পীর-মূর্শিদ, ওলী-আওলিয়ারা ধর্মের নামে বাজে গল্প-গুজব, ভিত্তিহীন চিন্তা-ধারণা, আজগুবি ও মিথ্যা ঘটনাবলী তৈরী করে এগুলিকে "মু'জিযা" ও "কারামত" নাম দিয়েছে। পরবর্তীতে এই বানাওয়াটি "মু'জিযা" ও "কারামত" গুলি বিভিন্ন প্রকারে (যেমন হারমনি, তবলা, দোতারা, তেতারা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র সহকারে শরীয়তী, মারফতী ও মাইজ ভান্ডারী গান, আজগুবি গল্প-গুজব, অসাধু লেখকদের অলৌকিক কিস্‌সা-কাহিনী সম্বলিত লিখিত পুথী ও বই পুস্তক, ধর্ম ব্যবসায়ী পীর-ফকীর ও মুর্শিদদের ভিত্তিহীন, বানাওয়াটি ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমে) সাধারণ মানুষের মাঝে বিস্তার লাভ করেছে। উল্লিখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একদিকে আল্লাহ্ প্রদত্ত "মু'জিযা" ও "কারামত" এবং অপরদিকে ঐ সমস্ত ভন্ডপীর, মুর্শিদ, ওলী-আওলিয়াদের বানাওয়াটি "মু'জিযা" ও "কারামত"। ধর্মীয় ব্যাপারে স্বল্প জ্ঞান থাকার কারণে সরলমতি

সাধারণ মানুষেরা এই দুই শ্রেণীর "মু'জিযা" ও "কারামতের" মাঝে কোন পার্থক্য বুঝতে পারে না।

পরিশেষে আমরা একথাই বলব যে, ঐ সমস্ত ভন্ড পীর-ফকীর, ও ওলী-আওলিয়াদের বানাওয়াটি "মু'জিযা" ও "কারামত" সবই শয়তানী কার্যক্রম অথবা ঐগুলি তাদের সুপরিকল্পিতভাবে সাজানো কৌশলগত ঘটনা। আর ঐগুলিকেই তারা পীর-মুর্শিদ, ওলী-আওলিয়াদের "মু'জিযা" "কারামত" ও "বরকত" হিসাবে মানুষের নিকট প্রকাশ করে থাকে।

অতঃপর সাধারণ জনগণ ঐ সমস্ত ভন্ড ও মিথ্যুক পীর-ফকীরদের প্ররোচনায় পড়ে ঐ সমস্ত পীর-মুর্শিদ, দয়াল বাবা, খাজাবাবা ও ওলি-আওলিয়াদের দরবারে এবং তাদের কবরে ও মাযারে আগরবাতি, মোমবাতি, ফুল, আতর, গোলাপ জল, হাস-মুরগী, গরু-ছাগল, টাকা-পয়সা, তথা বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র হাদীয়া ও মানত হিসাবে দান করতে থাকে। অপর দিকে বহুলোক কবর, মাযার ও পীর পূজার সাথে জড়িত থেকে এবং ঐ সমস্ত কবর-মাযার ও পীর সাহেবদের খাদেম ও খলীফা সেজে মিথ্যা, ভন্ডামী ও ধোকাবাজীর মাধ্যমে সরল প্রাণ মানুষদের ধন-সম্পদ বিভিন্ন কৌশলে লুটে পুটে খাচ্ছে। এটা যে, পরিস্কার হারাম, এতে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমান দেশের এক শ্রেণীর নিকৃষ্টতম, ঘৃণিত, স্বার্থান্বেষী, নামধারী আলেম সমাজ এই "নিপূজীর পীর প্রথা ব্যবসাকে" খুব জাঁকজমক করে তুলেছে।

পরিশেষে আমরা সুস্থ বিবেক সম্পন্ন, জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত ভাইদের কাছে এটাই দাবী রাখব যে, আপনারা

একবার আপনাদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করুন যে, একজন "মানুষ" মৃত্যুর কারণে যখন তার শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেছে। তাকে দাফন করার কিছুদিন পরেই তার শরীরের মাংসগুলি সব পোকা-মাকড়ে খেয়ে ফেলেছে। দু'চার বছর পরে তার হাড্ডিগুলি সব মাটির সাথে মিশে গেছে।

এর পরেও আল্লাহ্ প্রদত্ব সবচেয়ে বড় নি'য়ামত আপনার ঐ 'সুস্থ বিবেক' কি একথাই বিশ্বাস করবে! যে ঐ মৃত ব্যক্তি (কবরে যার হাড়-হাড্ডির কোন চিহ্ন নাই) সে আপনার দু'আ শ্রবণ করে, আপনার জন্য ভাল মন্দ করার ক্ষমতা রাখে, আপনাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে, নদীতে ও সমুদ্রে লঞ্চ ও জাহাজ ডুবি হতে রক্ষা করে, আপনাকে বা আপনার ছেলেকে পরীক্ষায় পাশ করা বা ভাল রিজাল্ট করার জন্য সাহায্য করে, আপনার বিয়ে করার পর ১০/১৫ বছর যাবত নিঃসন্তান থাকার পরে তারা আপনাকে সন্তান দান করে, পরকালে আল্লাহ্‌র নিকট তারা আপনার জন্য সুপারিশ করবে-ইত্যাদি। প্রকৃত পক্ষে এ সমস্ত বিষয়গুলি যদি আপনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস নাই করেন, তাহলে ঐ সমস্ত ভন্ডপীর-ফকীর, দয়াল বাবা, খাজা বাবা, ওলী-আওলিয়াদের কবরে-মাযারে এবং তাদের দরবারে বিভিন্ন প্রকার হাদীয়া ও মান্নত কি উদ্দেশ্যে দেন ? একবার ভেবে দেখবেন কি?

আর যদি আপনি মনে-প্রাণে এ বিশ্বাস করেন যে, ঐ সমস্ত ভন্ড পীর, ফকীর, মুর্শিদ, দয়াল বাবা, খাজা বাবা তাদের কবরে, মাযারে ও দরবারে বিভিন্ন প্রকার হাদীয়া- তোহফা ও মান্নত দিয়ে তাদেরকে খুশী করতে পারলে তারা আপনার সকল প্রকার আশা-আকাঙ্খা, কামনা-বাসনা পূর্ণ করে দিবে। সকল

প্রকার বিপদ-আপদ হতে তারা আপনাকে রক্ষা করবে। এমনকি তারা পরকালে আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করে আপনাকে জান্নাতে পৌছে দিবে। তাহলে নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর সাথে ঐ সমস্ত পীর-ফকীরদেরকে অংশী স্থাপন করলেন। আপনি দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্তে কমপক্ষে ৩০ রাক'আত নামাযে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহার ভিতরে-

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ.﴾

অর্থঃ (হে আল্লাহ্!) "আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।" এই যে অঙ্গীকার করলেন, তাহলে এই অঙ্গীকারের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করে আপনি পাক্কা মুশরিক হয়ে গেলেন। যার ফলে জান্নাত আপনার জন্য চিরতরে হারাম হয়ে গেল, আপনাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকতে হবে, আর পরকালে আপনার জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবে না। আর দুনিয়ার জীবনে "আপনি একজন গরু খাওয়া মুসলমান মুশরিক" অপরদিকে "একজন শূকর খাওয়া হিন্দু মুশরিক" এদু'য়ের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকল না। এমনিভাবে কোন পীর সাহেবের নামে মান্নত করা ও জবেহ্ করা আপনার হাস-মুরগী, গরু-ছাগল ; অপরদিকে হিন্দুদের মা-কালী, মা-দুর্গা ও রামের নামে হাস-মুরগী ও পাঠা বলি দেয়ার মাঝে কোন পার্থক্য থাকল না। দুনিয়ার মানুষের নিকট এই দুই শ্রেণীর মুশরিকদের ভিতর কিছুটা পার্থক্য থাকলেও প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্র নিকট কোন পার্থক্য নেই। আর এজন্যেই মুসলিম বঙ্গের বিশ্বকবি, জাতীয় কবি **"কাজী নজরুল ইসলাম"** মুসলমানদের এই সমস্ত শিরকী কার্যক্রম দেখে বড় আফসোস করে বলেছিলেনঃ

তাওহীদের হায় এ চির সেবক, ভুলিয়া গিয়েছে সে তাকবীর,
দূর্গা নামের কাছাকাছি প্রায়, দরগায় গিয়া লুটায় শির।
ওদের যেমন রাম-নারায়ণ, এদের তেমন মানিক পীর,
ওদের চাল ও কলার সঙ্গে, মিশিয়া গিয়াছে এদের ক্ষীর।।

এমনিভাবে মুসলমানদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের শিরকী কাজের সয়লাব দেখে বিশ্ব বিখ্যাত উর্দূ কবি "ডঃ আল্লামা ইকবাল" বড় আফসোস করে "মূর্তি পূজারী হিন্দু" এবং "পীর ও কবর পূজারী মুসলমানদের" মাঝে তুলনামূলক বিচার বিবেচনা করে বলেছিলেনঃ

বাংলা মায়ের দুটি সন্তান, একটি হিন্দু আর একটি মুসলমান।

হিন্দুরা" নিজের হাতে মাটির মূর্তি তৈরী করে তা মাটির উপরে রেখে তার সামনে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য, জিনিসপত্র ভোগ দেয় এবং তার পূজা করে। অপরদিকে "মুসলমানরা" যারা তাদের পীর-মুর্শিদ, ফকীর, দয়ালবাবা, খাজা বাবা, ওলী-আওলিয়াদের মৃতদেহ- মৃত লাশকে মাটির তলায় লুকিয়ে রাখে, মাটির নিচে কবর দেয়। এরপর ঐ সমস্ত কবরগুলিকে বিভিন্নভাবে চাকচিক্য ও সৌন্দর্য মন্ডিত করে এবং সেখানে বিভিন্ন প্রকারের হাদীয়া ও মান্নত প্রদান করে। এরপর ঐ কবরবাসীর ভক্ত অনুরক্ত ও মুরীদানরা কবরের চার পার্শ্বে খুব নমনীয় ভাবে নামাযের কায়দায় বসে তাদের জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্খা পূরণের জন্য কবর বাসীর কাছে আবেদন-

নিবেদন ও ফরিয়াদ করতে থাকে। আর অনেকেই কবরের চার পার্শ্বে তওয়াফ করে এবং সিজদাও করে।

অতএব প্রমাণিত হ'ল যে, বাংলা মায়ের এই দুই সন্তান একজন হিন্দু আর একজন মুসলমান- যাদের মধ্যে বাহ্যিকভাবে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও আকীদা বা বিশ্বাসগত দিক দিয়ে কোনই পার্থক্য নেই। কারণ যে "হিন্দু" সে তো জন্মগত ভাবেই মুশরিক, আর যে "মুসলমান" সে তো ঐ সমস্ত শিরকী কাজ করার কারণেই মুশরিক হয়ে গেল। বর্তমান বাংলাদেশে নামধারী পীর-ফকীরদেও ধর্মে নামে শিরকী ও বিদ'ধাতী কার্যক্রমের বাস্তবচিত্র তুলে ধরার উদ্দেশ্যে কবি **"শফীউল আলম"** বলেন:

পীর মুর্শিদের পারিয়েছে দোহাই কত আযাযীল শয়তান।
কত কবরে জ্বলেরে প্রদীপ মাসজিদে নেই বাতি।।
খানকাহ মাযারে শিন্নী লয়ে উঠেছে সবাই মাতি।
লুটেদের দল লুটলো সবি আর কিছু নেই বাকী।।
কত রমণী করছে ধর্ষণ ধর্মের নামে ডাকি।
সাধুর বেশে শয়তান এসে দিচ্ছে কুমন্ত্রণা।।
তাই না দেখে বিপথগামী হচ্ছে কতজনা।
উড়াও গগণে তাওহিদী নিশান ... জাগরে ... ।।

এই সমস্ত শিরকী কাজ থেকে আল্লাহ্ আমাদেরকে হিফাযত করুন। আমীন।

অতীত ও বর্তমান যুগের মুশরিকদের মাঝে পার্থক্যঃ

(المشركون قديمًا وحديثًا)

কবর ও মাযার পূজারীদের অধিকাংশই একথা বলে থাকে যে, জাহেলী যুগের মুশরিকগণ তারা মূর্তি সমূহের পূজা করত। আর আমাদের নিকট এমন কোন মূর্তি নেই, যাদেরকে আমরা পূজা করে থাকি। বরং আমাদের নিকট কিছু সংখ্যক নিক্কার পীর-মূর্শিদ ও ওলী-আওলীয়াদের কবর ও মাযার আছে, অবশ্য সে সমস্ত কবরে ও মাযারে গিয়ে আমরা তাদের ইবাদত করিনা। আমরা তো আল্লাহর কাছে শুধু এই প্রাথনা করি যে, " হে আল্লাহ তুমি ঐ সমস্ত পীর-মুর্শিদ, বুজুর্গ ও ওলী-আওলিয়াদের অসীলায়, তাদের সম্মানের খ্যাতিরে, আমাদের প্রয়োজনগুলি পূর্ণ করে দাও।" আর কবর ও মাযার পূজারীদের ধারণা হল, ঐ সমস্ত পীর-মুর্শিদদের কাছে প্রার্থনা করা, আবেদন-নিবেদন করা, এগুলি ইবাদতের ভিতর গণ্য নয়।

ঐ সমস্ত কবর ও মাযার পূজারীদের কথার উত্তরে একথা বলব যে, নিশ্চয়ই কোন মৃত ব্যক্তির নিকট কোন প্রকার সাহায্য ও বরকত তলব করাই হল দু'আ ও প্রার্থনা। আর এ দু'আই হল ইবাদত। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম বলেছেনঃ

"الدعاء هو العبادة"

অর্থঃ "দু'আ বা প্রার্থনা করাটাই হ'ল ইবাদত,"

অতীত যুগের মুশরিকদিগকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, তোমরা তোমাদের মূর্তিগুলোকে কেন ডাক এবং তাদের মাধ্যমে কেন অসীলা তলব কর? তারা এ প্রশ্নের উত্তরে যে কথা বলেছিল, সেটাই আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মাজিদে বর্ণনা করেছেনঃ

﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى.﴾ (الزمر: ٣)

অর্থঃ (মক্কার মুশরিকরা বলেছিল যে) আমরা ঐ সমস্ত মূর্তিগুলোর ইবাদত এজন্যেই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করে দেয়। (সূরা যুমারঃ ৩)

"ভালবাসার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সাথে শিরক" (شرك المحبة)

অত্যধিক ভালবাসা ও সম্মানের সাথে পূর্ণ অনুভূতিকে এবং অন্তরের পূর্ণ একাগ্রতাকে কোন সৃষ্টি জীবের প্রতি নিবদ্ধ করা, পেশ করা কোনক্রমেই জায়েয নয়। কারণ ইহা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যেই প্রযোজ্য। আর এই অত্যধিক ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করাকে আল্লাহ্‌র ইবাদত বলে গণ্য করা হয়। ইসলামী শরীয়তের সীমা অতিক্রম করে যে সমস্ত ভক্ত-অনুরক্ত ও মুরীদানরা তাদের পীর-মুর্শিদ, ওলী-আওলিয়াদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে যেয়ে অনেক বাড়াবাড়ি করে এবং তাদেরকে নিষ্পাপ, নিষ্কলুস ও পবিত্র বলে বিশ্বাস করে। প্রকৃতপক্ষে ঐ সমস্ত ভক্ত-অনুরক্ত ও মুরীদানরা তাদের পীর-মুর্শিদদের পূজা করে থাকে।

মোটকথাঃ ঐ সমস্ত মুরীদানরা তাদের পীর-মুর্শিদদের পবিত্রতা বর্ণনার ব্যাপারে যদি বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জিত না করত; তাহলে তারা তাদের পীর-মুর্শিদদের মৃত্যু অবস্থায় কবরে শায়ীত থাকার কারণে শরীয়ত বিরোধী এই সমস্ত হারাম কাজ কখনোই করত না।

ঐ সমস্ত মুরীদানরা তাদের পীর-মুর্শিদদের নামে সত্য কসম করতে উদগ্রীব হয়ে উঠে। অপর দিকে তারা হাসি ঠাট্টা করে মহান আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা কসম করতেও দ্বিধাবোধ করে না। এমনকি এই সমস্ত মুরীদানদের সামনে যদি কোন মানুষ স্বয়ং মহান আল্লাহ্‌কে গালি দেয়-তাহলে এ বিষয়ে তারা রাগান্বিত হয় না এবং এ বিষয়ে তাদের ভিতরে তেমন কোন

প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি হয় না। অথচ যদি কোন ব্যক্তি তাদের পীর-মুর্শিদদেরকে গালি-গালাজ করে, তাহলে এজন্য তারা অত্যধিক রাগান্বিত হয় এবং এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে তারা খড়গ হস্ত হয়ে ওঠে। তাহলে এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, তারা আল্লাহ্‌কে যে পরিমাণ সম্মান ও মহব্বত করে, তার চেয়ে তারা তাদের পীর-মুর্শিদদেরকে অধিকগুণ বেশি সম্মান ও মহব্বত করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরীকদেরকে লক্ষ্য করে বলেনঃ

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّوْنَهُم كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ.﴾ (البقرة : ١٦٥)

অর্থঃ আর মানুষের মধ্য হতে অনেকেই তারা তাদের উপাস্যগুলিকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ মনে করে, আর তারা আল্লাহ্‌কে যেমন ভালবাসে ঠিক তেমন তাদের উপাস্যগুলিকেও ভালবাসে। তবে যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছে, তারা ঐ সমস্ত মুশরিকদের তুলনায় আল্লাহ্‌কে অনেক বেশি ভালবাসে। (বাক্বারাঃ ১৬৫) তাহলে এই আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে উপাস্য মনে করে ভালবাসাটাই "ভালবাসার ক্ষেত্রে শিরক" বলে গণ্য।

আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের অতি নিকটেই বিদ্যমান।

(الله قريب من عباده)

নিশ্চয়ই "আল্লাহ্ তা'আলা" (অর্থাৎ আল্লাহ্র জ্ঞান, দর্শন শক্তি ও শ্রবণ শক্তি) তাঁর বান্দাদের অতি নিকটেই বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوالِي وَلْيُؤْمِنُوابِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ﴾ (البقرة: ١٨٦)

অর্থঃ (হে নাবী!) আমার বান্দারা যখন আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তখন আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, "নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্ বান্দার অতি নিকটেই রয়েছি। কাজেই যখন কোন বান্দা আমাকে ডাকে বা আমার কাছে প্রার্থনা করে, তখন আমি তার প্রার্থনা কবূল করি। অতএব তারা যেন যথাযথ ভাবে আমার হুকুম মেনে চলে এবং আমার প্রতি নিঃসংকোচে ঈমান আনে, তাহলে তারা সৎপথে আসতে পারবে। (বাকারা: ১৮৬)

অতএব বিশেষ করে মুসলমানদের উচিত হবে যে, তারা যেন বিপদে-আপদে পড়ে তথা যেকোন মুহূর্তে তাদের সকল প্রকার আশা-আকাঙ্খা ও প্রয়োজন মিটানোর জন্য সরাসরি আল্লাহ্র কাছে আবেদন-নিবেদন করবে, প্রার্থনা করবে, আশ্রয় চাইবে, এ ব্যাপারে আল্লাহ্ এবং বান্দার মাঝে কোন রকমের পর্দা বা প্রতি বন্ধকতা নেই। শুধু তাই নয় তিনি মানুষের জীবনের সর্ব বিষয়ের পরিচালক, আর মানুষের ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা একমাত্র তাঁর হাতেই সীমাবদ্ধ। কাজেই আল্লাহ্র সম্মতি

ছাড়া কোন নাবী-রাসূল পীর-মুর্শিদ, ওলী-আওলিয়া তিনি যেই হোন না কেন মানুষের কোন বিষয়ে কোনরূপ ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা তাঁদের নেই। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সালাম হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) কে লক্ষ্য করে বলেছিলেনঃ

(واعلم أن الأمة لواجتمعت على أن ينفعوك بشئ لم ينفعوك بشئ إلا بشئ قد كتبه الله لك، ولواجتمعوا على أن يضروك بشئ لم يضروك إلا بشئ قد كتبه الله عليك.)

অর্থঃ তুমি ভাল করেই জেনে রাখ যে, মহান আল্লাহ্ তা'আলা (দুনিয়া সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে) তোমার জন্য যে কল্যাণ নির্ধারণ করে রেখেছেন, তার অতিরিক্ত দুনিয়ার সমস্ত মানুষ যদি সম্মিলিতভাবে কোন বিষয়ে তোমার কোন কল্যাণ করতে চায়? তাহলে তারা তোমার জন্য সামান্যতম কোন কল্যাণ বা উপকার করতে পারবে না। এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য যে অকল্যাণ নির্ধারণ করে রেখেছেন, তার অতিরিক্ত দুনিয়ার সমস্ত মানুষ সম্মিলিতভাবে যদি তোমার কোন বিষয়ে কোন ক্ষতি করতে চায়, তাহলে তারা তোমার সামান্য পরিমাণ ও কোন ক্ষতি করতে পারবে না। শিরকের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ (المائدة : ٧٢)

অর্থঃ নিশ্চয়ই যিনি আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে অংশীদার বানায়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন, তার চিরস্থায়ী বাসস্থান হবে জাহান্নাম। আর এই সমস্ত যালেম তথা মুশরিকদের জন্য ক্বিয়ামতের দিন কোন সাহায্যকারী থাকবে না। (সূরা মায়িদাহ্ঃ ৭২)

অতএব কোন মুসলমান যখন ইসলাম ধর্মকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে, তখন তার উচিত হবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্ব ইবাদতে একনিষ্ঠভাবে সেই আল্লাহ্র ইবাদত করা- যিনি একক, যার কোন অংশীদার নেই। আর যে সমস্ত বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ কোন প্রকার ক্ষমতা রাখেনা-সেই সমস্ত বিষয় হাছিলের জন্য দুনিয়ার কোন পীর-মুর্শিদ, গাউস-কুতুব, ওলী-আওলিয়াদের নিকট প্রার্থনা করবে না, তাদের কাছে কোন সাহায্য চাইবে না। কেননা মানুষের সকল প্রকার আশা-আকাঙ্খা, আবেদন-নিবেদন, প্রার্থনা ও সাহায্য সবকিছুই একমাত্র আল্লাহ্র কাছেই জানাতে হবে। এ প্রসঙ্গে কুরআন ও হাদীছ থেকে বহু দলীল প্রমাণিত আছে। আর জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ আকড়ে ধরা একান্ত কর্তব্য। কোন প্রকারেই আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থাপনকারীদের সাথে এবং বিদ'আতীদের সাথে মিলিত হওয়া বা তাদের সাথে কোন বিষয়ে আপোষ করা এবং তাদের অন্ধ অনুকরণ করা, কোন প্রকারেই ঠিক হবে না। কেননা কোন মুসলমান যদি শিরককারী ও বিদ'আতীদের সাথে কোন বিষয়ে আপোষ করে, তাদের অন্ধ অনুকরণ করে, তাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় তাহলে ঐ মুসলমানের আমল ও আক্বীদা সব নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে তাদের সাথে ধ্বংস হয়ে যাবে। এমনকি তার দুনিয়া ও

আখিরাত সব বরবাদ হয়ে যাবে। (সর্ব বিষয়ে আল্লাহই ভাল জানেন)। পরিশেষে আমাদের নাবী হযরত মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সালামের প্রতি তাঁর পরিবার পরিজনের প্রতি এবং তাঁর সাথীদের প্রতি আল্লাহ্ রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। আমীন।

পীর-মুর্শিদ, অলী-আওলিয়াদের সম্পর্কে কতিপয় ভুল ধারণা

১। অনেকেই মনে করেন যে, পীর-মুর্শিদ, ওলী-আওলিয়ারা গায়েবের খবর রাখেন, কবরে শুয়ে থেকে মানুষের আবেদন-নিবেদন শুনতে পান, মানুষের ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখেন, দুনিয়া পরিচালনার ব্যাপারে তাদের হাত আছে। এই সমস্ত ধারণা সবই ভিত্তিহীন। ঐ সমস্ত পীর-মুর্শিদ তো দূরের কথা এমনকি আল্লাহ্‌র প্রেরিত নাবী রাসূলগণও এই সমস্ত বিষয়ে কোন ক্ষমতা রাখতেন না।

২। পীর-মুর্শিদ, গাউস-কুতুব, যামানার মুজাদ্দিদ, ওলিয়ে কামেল, পীরে কামেল ইত্যাদি এই সমস্ত শব্দ প্রয়োগ করে কাউকে উপাধি দেওয়া বা নিজে উপাধি গ্রহণ করা জায়েয নাই।

৩। অনেকে মনে করেন যে- ঐ সমস্ত নেংটা ফকীর, মাথায় জট ওয়ালা ফকীর, ১০-২০ কেজি ওজনের লোহার শিকল গলায় ঝুলানো ফকীর ইত্যাদি ওদের কাছে অনেক কিছু আছে। এসমস্ত ধারণা করা কোন ধরনের বোকামী? শিক্ষিত ভাইরা একটু ভেবে দেখবেন কি? হ্যাঁ ঐ সমস্ত ফকীরদের কাছে যা কিছু আছে তাহলো ঃ চরম বেহায়াপনা ও শয়তানী, আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানী, চরম দুর্গন্ধ ও বৈরাগ্যপনা। এসবগুলিই হারাম কাজ।

৪। যে কোন কবরে, মাযারে, পীর-মুর্শিদ ও ফকীরদের দরবারে এবং দয়াল বাবা ও খাজা-বাবাদের নামে ডেক চড়িয়ে ঐ সমস্ত জায়গায় আগরবাতি, মোমবাতি ও ধুপ জ্বালানো, আতর ও গোলাপ জল ছিটানো, ফুল দেয়া, হাঁস-মুরগী, গরু-

ছাগল, টাকা-পয়সা ইত্যাদি জিনিসপত্র হাদিয়া ও মানত দেয়া সবই হারাম। এমনিভাবে তাদের নিকট কোন কিছু চাওয়া, প্রার্থনা করা, যে কোন বিপদ থেকে মুক্তির জন্য আবেদন-নিবেদন করা, ঐ সমস্ত কবরে মাযারে সিজদা করা এগুলি পরিস্কার শিরক ও হারাম। এছাড়া ঐ সমস্ত কবরে-মাযারে ও দরবারে এবং অন্য যেকোন স্থানে তবলা, হারমনিয়াম, দোতারা, এসমস্ত বাদ্যযন্ত্র বাজানো এবং বিভিন্ন ধরনের গান বাজনা করা হারাম- এতে কোন সন্দেহ নেই।

৫। অনেকেই মনে করেন যে, বিনা অযূতে বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানীর নাম উচ্চারণ করলে মাথা কাটা যায়। আবার কেউ কেউ বলেন যে, আড়াইটা পশম উঠে যায়। অনেকেই ধারণা করেন যে, বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানীর অসীলায় বাগদাদে কবরের আযাব মাফ- সেখানে কবরের আযাব হয় না। আব্দুল কাদের জিলানী গায়েবের খবর রাখেন, মানুষদেরকে কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন ইত্যাদি। এ সমস্ত কথা ও ধারণা সবই ভিত্তিহীন ও মিথ্যা, শুধু তাই নয়-যিনি এ সমস্ত কথা বিশ্বাস করবেন, তিনি খাঁটি মুশরিক হিসাবে গণ্য হবেন।

৬। অনেকেই কোন কোন পীরকে হক্কানী পীর বলে সনদ দিয়ে থাকে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা, কারণ কোন হক্কানী আলেম নিজেকে কোন দিনও পীর বলে দাবী করেননি।

পরিশেষে আল্লাহ্ আমাদেরকে সকল প্রকার শিরকী ও বিদ'আতী কার্যক্রম এবং ভ্রান্ত অ-সীলা ধরা হতে মুক্ত হয়ে খাঁটি তাওহীদ ও সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ তাওফিক দান করুন। আমীন।

حكم الاحتفال بالمولد النبوي

إعداد:

المترجم والداعية: أبو الكلام أزاد

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسلي

মীলাদুন্নাবী ﷺ পালনের বিধান

প্রণয়নেঃ আবুল কালাম আযাদ
(লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়)

আল্-সুলাই ইসলামী দা'ওয়া সেন্টার
রিয়াদ - সৌদী আরব

মীলাদুন্নাবী ﷺ পালনের বিধান

১। **মীলাদের অর্থঃ** জন্মের সময়কালকে আরবীতে "মীলাদ" বা "মাওলিদ" বলা হয়। এই হিসেবে "মীলাদুন্নবীর" অর্থ হলো "নবীর জন্ম মুহূর্ত"। আর এটাই ইসলামী সমাজে "মীলাদ" হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

২। **মীলাদ ও ক্বিয়ামের সূচনাঃ** প্রখ্যাত আলিম ও ঐতিহাসিকদের মতে; ইরাকের "এরবল" এলাকার গভর্ণর আবূ সাঈদ মুযাফ্ফারুদ্দীন কুকুবুরী ৬০০ হিজরীর পরে কিছু সংখ্যক ভাড়াটিয়া কবি, গায়ক ও বক্তাদের দ্বারা মীলাদের প্রচলন ঘটান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল; মিথ্যা নবী প্রেমের মহড়া দেখিয়ে জনসাধারণের মন জয় করা। ৭০০ হিজরীর পরে "মীলাদ মাহ্ফিলে" "ক্বিয়াম" প্রথা চালু হয় বলে গবেষকরা ধারণা করেন।

৩। **মীলাদের আনুষ্ঠানিকতাঃ** সাধারণত মীলাদ অনুষ্ঠানে আগরবাতি, মোমবাতি ও ধূপকাঠি জ্বালানো হয় এবং আতর লাগানো ও ছিটানো হয়। এছাড়া কোন কোন এলাকার মীলাদ অনুষ্ঠানে নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ ও গান-বাজনার প্রচলন দেখা যায়। অপরদিকে বিদ'আতী আলেমগণ রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর প্রতি দুরুদ পাঠ, প্রশংসা ও গুনাগুন বর্ণনা করার নামে আরবী, ফার্সী, উর্দু ও বাংলা ভাষায় বানাওয়াটী কবিতা ও ছন্দ আওড়িয়ে অনুষ্ঠানে অংশ

গ্রহণকারীদের মাতিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। এরপর সম্মিলিত কণ্ঠে সুর ও তাল মিলিয়ে "ইয়া নাবী ছালামু আলাইকা" পড়তে থাকেন। এরপর মীলাদ শেষে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। দেখা গেছে মীলাদ পাঠকারী মাওলানা সাহেবেরা একই রাত্রে বহু বাড়ীতে মীলাদ পড়ে বেড়াচ্ছেন, অথচ নিজেদের বাড়ীতে বছরে একদিনও মীলাদ পড়ার ফুরসত পান না, এবং মীলাদ পড়ার প্রয়োজনও মনে করেন না। বিষয়টা ভেবে দেখার নয় কী?

লক্ষণীয় যে, মীলাদ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ভাইদের অনেকেই বাৎসরিক দুই ঈদ, শবে-বরাতের রাত, এবং ১২ই রবিউল আওয়ালের মীলাদ-মাহ্ফিলের মাধ্যমে সারা বৎসরের ইবাদত বন্দেগীর ঝামেলা এই ৪ দিনেই চুকিয়ে ফেলতে চান, এটা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত ? **আরো লক্ষ্যণীয়** যে, একদিকে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এর জন্ম মুহূর্তকে কেন্দ্র করে মীলাদ অনুষ্ঠান, অপর দিকে আমাদের সমাজে কোন নতুন বাড়ী, দোকান বা কোন মৃত ব্যক্তির নামে মীলাদ অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এই দুই ধরণের মীলাদ অনুষ্ঠানের মাঝে কোন সামঞ্জস্যতা কী আছে?

৪। মীলাদ প্রসঙ্গে জাল হাদীছ ও ভিত্তিহীন ধারণাসমূহঃ মীলাদ প্রসঙ্গে যুগে যুগে বিদ'আতী আলেমগণ কত যে জাল হাদীছ এবং ভিত্তিহীন গল্পের উদ্ভব ঘটিয়েছেন, তার সংখ্যা নির্ণয় করা বড় কঠিন। এখানে কয়েকটি জাল হাদীস ও ভ্রান্ত ধারণা উল্লেখ করা হলোঃ

(১) হে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম আপনি না হলে আসমান-যমীন কিছুই সৃষ্টি করতাম না।

(২) মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) কে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ্ তা'আলা আরশ-কুরসী বেহেশ্ত-দোযখ, আসমান-যমীন, কিছুই সৃষ্টি করতেন না।

(৩) আল্লাহ্র নূর হতে মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) এর সৃষ্টি, মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ -সাল্লাম) এর নূর হতে সমস্ত দুনিয়া সৃষ্টি।

(৪) মীলাদ মাহ্ফিলে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাহি অ-সাল্লাম) এর রূহ এসে বসবেন, এ ধারণা নিয়ে অনেকেই একটা চেয়ার সুন্দর করে সাজিয়ে রাখেন।

(৫) মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) গায়েবের খবর রাখেন এবং মানুষের ভাল-মন্দ করারও ক্ষমতা রাখেন।

(৬) এছাড়া অনেকেই ধারণা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) এর কবরের চার পার্শ্বের মাটি আল্লাহ্র আরশের চেয়েও মূল্যবান।

উপরের কথাগুলি সবই জাল ও মিথ্যা এবং এসব বিশ্বাস করা নিঃসন্দেহে কুফরী কাজ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ (হে নবী) আপনি বলুনঃ আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ,

আমার প্রতি অহী নাযিল হয় যে, নিশ্চয়ই তোমাদের উপাস্যই একমাত্র উপস্য। (কাহ্ফ - ১১০ আয়াত)

রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার নামে মিথ্যা হাদীছ রচনা করল, সে যেন জাহান্নামে তার ঘর তৈরী করে নিল।" (বুখারী)

রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) আরো বলেছেন; "সাবধান ! তোমরা ধর্মের বিষয়ে অতিরঞ্জিত করোনা। তোমাদের আগে যারা ছিল - তারা ধর্মীয় বিষয়ে অতিরঞ্জিত করার ফলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।" তিনি আরো বলেছেনঃ "তোমরা আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করোনা, যেভাবে নাছারাগণ ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছে। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্র বান্দা, কাজেই তোমরা আমার সম্পর্কে এতটুকু বলতে পার যে, "আমি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল"। (বুখারী ও মুসলিম)

হানাফী "ফিক্হে আকবরে" পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, আল্লাহ্র নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) গায়েব জানতেন, সে ব্যক্তি কাফের। হানাফী মায্হাবের কিতাব "ফাতওয়া বায্যাযিয়াতে" বলা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, মৃত্যু ব্যক্তিদের রূহ হাযির হয়ে থাকে, সে ব্যক্তি কাফের। অনুরূপভাবে "তুহ্ফাতুল কুযাত" কিতাবে বলা হয়েছে, যারা ধারণা করে যে, মীলাদের মজলীসগুলিতে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর রূহ মুবারক হাযির হয়ে থাকেন - তাদের এই ধারণা স্পষ্ট শিরক।

৫। "মীলাদ বিদ'আত" ইহার দলীলসমূহঃ

(১) আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) কে খুশী করার মাধ্যমে সওয়াব হাছিল করার উদ্দেশ্যে ধর্মের নামে এমন কোন নতুন কাজের উদ্ভব ঘটানো - যার কোন প্রমাণ কুরআন ও সহীহ্ হাদীস থেকে পাওয়া যায় না, সেটাই বিদ'আত। আর এই বিদ'আতের পরিণাম গোমরাহী ও জাহান্নাম।

(২) রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমাদের ইসলামী শরীয়তে কোন নতুন কাজের উদ্ভব ঘটাবে - তা পরিত্যাজ্য অগ্রহণযোগ্য।

(৩) কুরআন মাজীদের নাযিলকৃত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম।" (মায়েদা ঃ ৩ আয়াত)

আল্লাহ্ তা'আলার উক্ত ঘোষণার প্রায় ৬০০ বৎসর পরে কিছু সংখ্যক বিদ'আতী আলেমদের প্রচলিত মীলাদ কিভাবে ইসলামী অনুষ্ঠান হতে পারে?

(৪) চার মাযহাবের সেরা আলেমগণ সর্বসম্মতভাবে প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠান বিদ'আত হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করেন।

(৫) এছাড়া উপমহাদেশের প্রখ্যাত উলামায়ে কিরাম যেমনঃ মুজাদ্দিদে আলফেছানী, শায়খ্ আহ্মাদ সারহিন্দী, আল্লামা হায়াত সিন্দী, রশীদ আহ্মাদ গাংগোহী, মাওলানা

আশরাফ আলী থানভী, মাহ্মুদুল হাসান দেউবন্দী, এছাড়াও আহ্লে হাদীছ্ আলেমগণ একবাক্যে প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠানকে বিদ'আত ও গুনাহের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

উপসংহারে বলব, যদি মীলাদ মাহ্ফিল আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত দ্বীনের অংশ হতো, তাহলে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম নিশ্চয়ই উম্মতের কাছে পরিষ্কারভাবে তা বর্ণনা করে যেতেন। এছাড়া রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) তাঁর নিজের বা তাঁর পূর্ববর্তী কোন নবী ও রাসূলগণের জন্মবার্ষিকী পালন করেননি। এরপর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম-এর হাজার হাজার ছাহাবী যারা নিজেদের জীবনের চেয়েও রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামকে বেশী ভাল বাসতেন, তারাও এই মীলাদ উৎসব পালন করেননি। এমনকি তাবেঈনে কিরাম ও পরবর্তী ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বাল সহ হাজার হাজার আলেম-উলামা যাঁরা ইসলামী শরীয়ত আমাদের চেয়ে অনেক বেশী বুঝতেন ও সেই অনুযায়ী আমল করতেন, তাঁরাও কোন দিন মীলাদ মাহ্ফিল কায়েম করেন নাই। এছাড়া বর্তমান ইসলামী বিশ্বের আরব দেশগুলি যেমন সাউদী আরব, কুয়েত, কাতার, বাহ্রাইন, আরব-আমীরাত, ইয়ামান, ইত্যাদির শত-শত জগদ্বিখ্যাত আলেমগণও এ মীলাদ পালন করেন না। তাহলে আমরা কোন দলীলের ভিত্তিতে মীলাদ পালন করব?

পরিশেষে আমরা এটাই জানতে পারলাম যে, কুরআন ও ছহীহ্ হাদীছ থেকে এবং ছাহাবা-কিরাম ও উলামায়ে মুজতাহিদীন থেকে মীলাদের স্বপক্ষে কোন দলীল ও প্রমাণ

নেই। সেহেতু মীলাদ ইসলামী শরীয়াতে একটি নব আবিষ্কৃত কাজ, যার পরিনাম গোমরাহী ও জাহান্নাম। অতএব আমরা আল্লাহ্‌র কাছে এই দু'আ করব যে, হে আল্লাহ্‌ তুমি আমাদেরকে তোমার নবীর পূর্ণ অনুসরণ করার এবং এই সমস্ত বিদ'আত থেকে দূরে থাকার পূর্ণ তাওফীক দান কর। আমীন !

নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা মু'মিন বান্দাদেরকে তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ পাঠ করার আদেশ দিয়েছেন। আর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করবে, এর প্রতিদানে আল্লাহ্‌ তা'আলা তার প্রতি ১০ বার রহ্‌মত নাযিল করবেন।" অনেকে মনে করেন, এই দরূদ মীলাদ মাহ্‌ফিলে সমষ্টিগত ভাবে পড়তে হবে, তাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। শুধুমাত্র প্রস্রাব-পায়খানা করার সময় ব্যতীত চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে, বিপদে-আপদে মোট কথা সর্বাবস্থায় দরূদ পাঠ করা জায়েয আছে। তবে নামাযে তাশাহুদের পরে, আযানের পরে, জুম'আর দিনে ও রাত্রে, রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম-এর নাম উচ্চারণ ও শ্রবণের পরে, দু'আর ভিতরে এবং এধরণের আরো অন্যান্য সময়ে দরূদ শরীফ পড়া বহু হাদীছ থেকে প্রমাণিত। অতএব সম্মিলিতভাবে কণ্ঠ ও তাল মিলিয়ে উচ্চস্বরে কোন নির্ধারিত সময়ে ও সমাবেশে দরূদ শরীফ পড়া বিদ'আত, ইহাতে কোন সন্দেহ্‌ নেই। আল্লাহ্‌ আমাদেরকে বিদ'আত থেকে দূরে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন !

المسائل المهمة التي تتعلق بالعقيدة

إعداد:

الداعية: أبوالكلام أزاد

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسلي

আক্বীদাহ সংক্রান্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা

প্রনয়ণেঃ আবুল কালাম আযাদ

(লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়)

আল-সুলাই ইসলামী দা'ওয়া সেন্টার

আক্বীদা সংক্রান্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলাহ

(المسائل المهمة التي تتعلق بالعقيدة)

১- প্রশ্নঃ মহান আল্লাহ কোথায় অবস্থান করেন ?

উত্তরঃ মহান আল্লাহ আরশে আযীমের উপর অবস্থান করেন। আল্লাহর কথাই এর দলীল।

﴿الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (سورة طـه :٥)

অর্থঃ "(তিনি আল্লাহ)পরম দয়াময় আরশের উপর সমুন্নীত রয়েছেন।" (ত্বোয়া-হা ৫)

মহান আল্লাহ আসমানের উপর বা আরশে আযীমের উপর সমুন্নীত আছেন,এটা কুরআন মাজীদের ৭টি আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। অতএব যারা দাবী করেন যে, মহান আল্লাহ সর্ব জায়গায় বিরাজমান, অথবা তিনি মু'মিন বান্দার ক্বলবের ভিতর অবস্থান করেন, আর মু'মিন বান্দার ক্বলব বা অন্তর হলো আল্লাহর আরশ বা ঘর। তাদের এ সমস্থ দাবী সবই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

২- প্রশ্নঃ মহান আল্লাহর চেহারা অর্থাৎ মূখমন্ডল আছে কি ? থাকলে তার দলীল কি ?

উত্তরঃ হাঁ, মহান আল্লাহর চেহারা অর্থাৎ মূখমন্ডল আছে। আল্লাহর কথাই এর দলীল ।

﴿كُـلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (سورة الرحمن: ٢٦-٢٧)

অর্থঃ (কিয়ামতের দিন) ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংশ হয়ে যাবে। (হে রাসূল (ছাঃ))আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালন কর্তার চেহারা মুবারক অর্থাৎ সত্তাই একমাত্র বাকী থাকবে। (আর-রাহমান ৩৬,৩৬)

৩– প্রশ্নঃ মহান আল্লাহর কি হাত আছে? থাকলে তার দলীল কি?

উত্তরঃ হাঁ, মহান আল্লাহর হাত আছে। আল্লাহর কথাই এর দলীল ।

﴿قَـالَ يَـا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ (سورة ص:٧٥)

অর্থঃ আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস ! আমি নিজ হাতে যাকে সৃষ্টি করেছি, তার সামনে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাঁধা দিল?৺(ছোয়াদ,৭৫)

৪–প্রশ্নঃ মহান আল্লাহর কি চক্ষু আছে ? থাকলে তার দলীল কি?

উত্তরঃ হাঁঃ, মহান আল্লাহর চক্ষু আছে। আল্লাহর কথাই এর দলীল। যেমন তিনি হযরত মূসা (আঃ) কে লক্ষ করে বলেছিলেন,

﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ (سورة طـــه :٣٩)

অর্থঃ আমি আমার নিকট হ'তে তোমার উপর ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম, যাতে তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও। (ত্বাহা,৩৯) এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কে শান্তনা দিতে যেয়ে বলেন,

﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ (الطور:٤٨)

অর্থঃ (হে রাসূল! (ছাঃ)) আপনি আপনার পালন কর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় ধৈর্যধারণ করুন, আপনি আমার চোখের সামনেই রয়েছেন। (আত-তূর,৪৮)

৫– প্রশ্নঃ মহান আল্লাহ শুনেন এবং দেখেন, এর দলীল কি ?
উত্তরঃ মহান আল্লাহ শুনেন এবং দেখেন। আল্লাহর কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন:

﴿ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ (سورة المجادلة:١)

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা শ্রবণ করেন ও দেখেন। (আল মুজাদালাহ:১)

৬– প্রশ্নঃ মানুষের শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তি, অপর দিকে মহান আল্লাহর শ্রবন শক্তি ও দর্শন শক্তি, এ দুয়ের মাঝে কোন পার্থক্য আছে কি?

উত্তরঃ হাঁ, মানুষেরা কানে শুনে ও চোখে দেখে, অপর দিকে মহান আল্লাহ কানে শুনেন ও চোখে দেখেন, এ দুয়ের মাঝে অবশ্যই বিরাট পার্থক্য রয়েছে। মহান আল্লাহর কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (سورة الشورى: ١١)

অর্থঃ আল্লাহর সাদৃশ্য কোন বস্তুই নাই এবং তিনি শুনেন ও দেখেন। (শূরা,১১)

বাস্তবতার আলোকে চিন্তা করলে আমরা বুঝতে পারি যে, নিঃসন্দেহে মানুষের দৃষ্টি শক্তি ও শ্রবণ শক্তির একটা নির্ধারিত আয়তন, সীমা বা দূরত্ব আছে, যার ভিতরের বস্তুগুলি

মানুষেরা সহজে চোখে দেখতে পায় ও আওয়ায বা শব্দ সমূহ সহজে কানে শুনতে পায়। তবে ঐ নির্ধারিত সীমা বা দুরত্বের বাহিরে চলে গেলেতখন মানুষ আর কিছুই চোখে দেখতেও পায় না আর কানে শুনতেও পায়না। অপর দিকে মহান আল্লাহর দর্শণ শক্তি ও শ্রবন শক্তির জন্য নির্ধারিত কোন সীমা বা দুরত্ব বলতে কিছুই নেই। যেমন মানুষেরা ৪/৫ হাত দুর থেকে বইয়ের ছোট অক্ষরগুলি দেখে, পড়তে পারে, কিন্তু ১০/১৫ হাত দুর থেকে ঐ অক্ষরগুলি আর পড়া সম্ভব হয় না। এমনি ভাবে মানুষের চোখের সামনে যদি সামান্য একটা কাপড় বা কাগজের পর্দা ঝুলিয়ে রাখা হয় – তাহলে ঐ কাপড় বা কাগজের ও পাশে সে কিছুই দেখতে পায়না। এমনিভাবে মানুষেরা গভীর অন্ধকার রাতে কিছুই দেখতে পায়না। অপর দিকে মহান আল্লাহ তা'আলা আমাবশ্যার ঘোর অন্ধকার রাতে কাল পাহাড় বা কাল কাপড়ের উপর দিয়ে কাল পিপড়া চলাচল করলেও সেই পিপড়াকে দেখতে পান এবং তার পদধ্বনি শুনতে পান।

৭–প্রশ্নঃ একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ায় আর কেহ গায়েবের খবর রাখেন কি?

উত্তরঃ না, একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ায় আর কেহ গায়েবের খবর রাখেন না।

আল্লাহ তা'আলার কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

﴿ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ (البقرة:٣٣)

অর্থঃ নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ আসমান ও যমীনের যাবতীয় গোপন বিষয় সম্পর্কে খুব ভাল করেই অবগত আছি, এবং সে

সব বিষয়েও জানি যা তোমরা প্রকাশ কর, আর যা তোমরা গোপন রাখ। (বাক্বারাহ,৩৩) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ﴾ (الأنعام: ٥٩)

অর্থঃ সেই মহান আল্লাহর কাছে অদৃশ্য জগতের সমস্ত চাবি রয়েছে। সে গুলো একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেহই জানেন না। (আন'আম,৫৯)

৮– প্রশ্নঃ দুনিয়ার জীবনে মু'মিন বান্দাদের পক্ষে স্বচক্ষে অথবা স্বপ্নযোগে মহান আল্লাহর দর্শন লাভ করা অর্থাৎ আল্লাহকে দেখা কি সম্ভব ?

উত্তরঃ না, দুনিয়ার জীবনে মু'মিন বান্দাদের পক্ষে স্বচক্ষে অথবা স্বপ্ন যোগে মহান আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়। আল্লাহর কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

﴿ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي ..﴾ (الأعراف:١٤٣)

অর্থঃ তিনি (হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,) হে আমার প্রভূ ! তোমার দীদার আমাকে দাও, যেন আমি তোমাকে দেখতে পাই। উত্তরে মহান আল্লাহ (হযরত মূসা (আঃ) কে) বলেছিলেন, হে মূসা! তুমি আমাকে কস্মিনকালেও দেখতে পাবে না। (আ'রাফ,১৪৩)

উক্ত আয়াত দ্বারা এবং আরো অন্য আয়াত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হলো যে, সৃষ্টি জিবের কোন চক্ষু এমনকি নাবী ও রাসূলগণের কেহই দুনিয়ার জীবনে মহান আল্লাহকে দেখতে পায় নাই, কেউ পাবেও না। অতএব যারা বা যে সমস্ত নামধারী পীর সাহেবরা দাবী করে যে, তারা সপ্নে আল্লাহকে দেখতে পায়, তারা ভন্ড, ও মিথ্যুক এতে কোন সন্দেহ নেই।

৯– প্রশ্নঃ আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) তিনি কি মাটির তৈরি? না নূরের তৈরি ?

উত্তরঃ আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) তিনি মাটির তৈরী । আল্লাহর কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ﴾ (الكهف:١١٠)

অর্থঃ আপনি (হে রাসূল (ছাঃ) উম্মাতে মুহাম্মাদীদেরকে) বলে দিন যে, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি অহী নাযেল হয় যে, নিশ্চয় তোমাদের উপাস্যই একমাত্র উপাস্য। (আল-কাহফ,১১০)

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) দৈহিক চাহিদার দিক দিয়ে আমাদের মতই মানুষ ছিলেন। তিনি খাওয়া-দাওয়া, পিশাব-পায়খানা, বাজার-সদাই, বিবাহ-শাদী, ঘর-সংশার সবই আমাদের মতই করতেন। পার্থক্য শুধু এখানেই যে, তিনি আল্লাহর প্রেরীত রাসূল ও নাবী ছিলেন, তাঁর কাছে আল্লাহর তরফ থেকে দুনিয়ার মানুষের হিদায়েতের জন্য অহী নাযেল হতো, আর অমাদের কাছে অহী নাযেল হয়না। অতএব যারা রাসূলের প্রশংসা করতে যেয়ে নূরের নাবী বলে অতিরঞ্জিত করল, তারা রাসূল (ছাঃ) এর প্রতি মিথ্যার অপবাদ দিল।

১০– প্রশ্নঃ অনেক বই পুস্তকে লেখা আছে, এ ছাড়া আমাদের দেশের ছোট খাট বক্তা থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বক্তাদের অধিকাংশই বলে থাকেন যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)

কে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীন, আরশ-কুরসী কিছুই সৃষ্টি করতেন না। এ কথাটি ঠিক না বেঠিক ?
উত্তর: উল্লিখিত কথাগুলি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বানাওয়াটি ও মিথ্যা। কারণ কুর'আন ও ছহীহ হাদীছ থেকে এর স্বপক্ষে কোন দলীল নেই। অপরদিকে কুর'আন মাজীদের সূরা আয-যারিয়াতের ৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, "আমি জ্বিন জাতি এবং মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদাত করার জন্য।"

১১- প্রশ্নঃ আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) কি গায়েবের খবর রাখতেন?

উত্তরঃ না, আমাদের নাবী (ছাঃ) গায়েবের খবর রাখতেন না। আল্লাহর কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

﴿قُلْ لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾ (الأعراف،١٨٨)

অর্থঃ (হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)) আপনি ঘোষনা করে দিন যে, একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া আমার নিজের ভাল-মন্দ, লাভ-লোকসান, কল্যান-অকল্যান ইত্যাদি বিষয়ে আমার কোনই হাত নেই। আর আমি যদি গায়েবের খবর জানতাম,তাহলে বহু কল্যাণ লাভ করতে পারতাম, আর কোন প্রকার অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করতে পারত না। (আল-আ'রাফ,১৮৮) বাস্তবতার আলোকে আমরা একথা বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যদি গায়েবের খবর রাখতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি ওহুদের যুদ্ধে,

বদরের যুদ্ধে, তায়েফে এবং আরো অন্যান্য অবস্থার পরিপেক্ষিতে কঠিন বিপদের সম্মখীন হতেন না।

১২–প্রশ্নঃ অনেক আলেম ও বক্তারা বলে থাকেন যে, আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এর দেহ বা শরির মুবারকের চারি পার্শে যে সমস্ত মাটি রয়েছে - সে সমস্থ মাটির মূল্য বা মর্যাদা আল্লাহর আরশের মূল্য বা মর্যাদার চেয়েও বেশী। এ কথাটি ঠিক না বেঠিক ?

উত্তরঃ উল্লিখিত কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন,বানাওয়াটি ও মিথ্যা , কেননা কুর'আন ও হাদীছ থেকে এর স্বপক্ষে কোন কিছুই পাওয়া যায় না।

১৩– প্রশ্নঃ অনেকেই নামধারি পীর-মুর্শিদ, অলী-আওলীয়াদের এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) এর অসীলা করে আল্লাহর নিকট দু'আ করে থাকে । এটা জায়েয কি জায়েয নয়?

উত্তরঃ উল্লিখিত বিষয়টি জায়েয নয়। কেননা মৃত ব্যক্তির অছিলা করে আল্লাহর কাছে দুয়া করা নিষেধ বা হারাম,চাই সেই মৃত ব্যক্তি কোন নাবী বা রাসূল হোক না কেন।

১৪–প্রশ্নঃ "মীলাদ মাহফিল" কায়েম করা অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর জন্ম বার্ষিকী পালন করা জায়েয কি জায়েয নয়? যদি জায়েয না হয়, তাহলে আমাদের দেশের অধিকাংশ আলেম-উলামারা মীলাদ পড়ান কেন?

উত্তরঃ "মীলাদ মাহফিল" কায়েম করা অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর জন্ম বার্ষিকী পালন করা নিঃসন্দেহে নাজায়েয। কারণ এর স্বপক্ষে কুর'আন মাজীদ ও ছহীহ হাদীছ হতে এবং ছাহাবা

কিরামদের আমল ও পরবর্তী উলামায়ে মুজতাহিদীনদের তরফ থেকে কোনই প্রমাণপঞ্জী নেই।

সেহেতু এটা ইসলামী শারীয়তে নতুন আবিষ্কার তথা বিদ'আত। যার পরিণাম গোমরাহী, পথভ্রষ্ঠতা ও জাহান্নাম।

১৫– প্রশ্নঃ মহান আল্লাহকে পূর্ণভাবে ভাল বাসা বা আনুগত্য করার উত্তম পদ্ধতি কি?

উত্তরঃ মহান আল্লাহকে পূর্ণভাবে ভাল বাসার উত্তম পদ্ধতি হলোঃ খালেছ অন্তরে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা, আর দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁর রাসূল (ছাঃ) এর অনুসরণ করা। মহান আল্লাহর কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন

﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (آل عمران: ٣١)

অর্থঃ (হ রাসূল (ছাঃ) আপনার উম্মাতদেরকে) আপনি বলেদিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভাল বাসতে চাও, তাহলে তোমরা আমারই অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভাল বাসবেন,আর তোমাদের পাপও ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। (আল-ইমরান,৩১)

১৬–প্রশ্নঃ আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) কে পূর্ণভাবে ভাল বাসা বা অনুসরণ করার উত্তম পদ্ধতি কি?

উত্তরঃ আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) কে পূর্ণভাবে ভালবাসার উত্তম পদ্ধতি হলোঃ রাসূলুলাহ (ছাঃ) এর প্রত্যেক টা সুন্নাতকে দ্বিধাহীন চিত্তে যথাযথভাবে অন্তর দিয়ে ভালবাসা, আর

সাধ্যানুযায়ী তা আমল করার চেষ্টা করা। মহান আল্লাহর কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

﴿فَــلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾ (النساء:٦٥)

অর্থঃ অতএব (হে মুহাম্মাদ (ছাঃ))) আপনার প্রতিপালকের কসম, তারা কখনই ঈমানদার হতে পারবে না। যতক্ষণ না তাদের মাঝে সৃষ্ট কোন ঝগড়া বা বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ন্যায় বিচারক হিসাবে মেনে না নিবে। অতঃপর তারা আপনার ফায়ছালার ব্যাপারে নিজেদের মনে কোন রুপ সংকির্ণতা বোধ না করে, এবং তা শান্তিপূর্ণভাবে কবূল করে নিবে। (আন-নিসা,৬৫) এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ أَحَبَّ سُنَّتِيْ فَقَدْ أَحَبَّنِيْ وَ مَنْ أَحَبَّنِيْ فَكَانَ مَعِيَ فِيْ الْجَنَّةِ ( )

অর্থঃ "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভাল বাসল, সে যেন আমাকে ভাল বাসল। আর যে ব্যক্তি আমাকে ভাল বাসল সে আমার সাথে জান্নাতে বসবাস করবে। ( )

১৭– প্রশ্নঃ বিদ'আতের অর্থ কি? বা বিদ'আত কাকে বলা হয়?

উত্তরঃ পারিভাষিক অর্থে সুন্নাতের বিপরিত বিষয়কে 'বিদ'আত "বলা হয়। আর শারঈ অর্থে বিদ'আত হলোঃ "আল্লাহর নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে ধর্মের নামে নতুন কোন প্রথা চালু করা, যা শরীয়তের কোন ছহীহ দলীলের উপরে ভিত্তিশীল নয়।" (আল-ই'তিছাম ১/৩৭পৃঃ)

১৮– প্রশ্নঃ বিদ'আতী কাজের পরিনতি কি কি?

উত্তরঃ বিদ'আতী কাজের পরিণতি হলো ৩ টি। (১) ঐ বিদ'আতী কাজ আল্লাহর দরবারে গৃহিত হবেনা। (২) বিদ'আতী কাজের ফলে মুসলিম সমাজে গোমরাহীর ব্যাপকতা লাভ করে। (৩) আর এই গোমরাহীর ফলে বিদ'আতীকে জাহান্নাম ভোগ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

"مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ " (متفق عليه)

অর্থঃ "যে ব্যক্তি আমাদের শরীয়তে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত"। (বুখারী ও মুসলিম) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেছেন,

" وَإِيَّاكُمْ وَ مُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٍ وَ كُلَّ ضَلاَلَةٍ فِيْ النَّارِ "

অর্থঃ আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি করা হতে সাবধান থাক ! নিশ্চয় প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদ'আত, আর প্রত্যেক বিদ'আতই হলো গোমরাহী, আর প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম হলো জাহান্নাম।"(আহমাদ, আবূদাঊদ,তিরমিযী...)

১৯- প্রশ্নঃ আমাদের দেশে সংঘটিত কয়েকটি বড় ধরণের বিদআতী কাজ উল্লেখ করুন?

উত্তরঃ (১) "মীলাদ মাহফিলের" অনুষ্ঠান করা (২) "শবে-বরাত" পালন করা (৩) "শবে-মেরাজ" পালন করা (৪) "মৃত ব্যক্তির কাযা বা ছুটে যাওয়া নামায সমূহের কাফ্‌ফারা আদায় করা (৫) মৃত্যুর পর ৭ম, ১০ম, অথবা ৪০তম দিনে খাওয়া দু'আর অনুষ্ঠান করা (৬) ইছালে ছাওয়াব বা ছাওয়াব রেসানী বা ছাওয়াব বখশে দেওয়ার অনুষ্ঠান করা (৭) মৃত ব্যক্তির

রুহের মাগফিরাতের জন্য অথবা কোন বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে খতমে কুরআন অথবা খতমে জালালীর অনুষ্ঠান করা ইত্যাদি (৮) জোরে জোরে চিল্লিয়ে যিকর করা (৯) হালকায়ে যিকিরের অনুষ্ঠান করা (১০) পীর সাহেবের কাছে মুরীদ হওয়া (১১) মা-বোন ও স্ত্রীকে পীর সাহেবের কাছে মুরীদ হওয়ার জন্য এবং তাদের খেদমত করার জন্য পাঠানো। (১২) ফরয, সুন্নাত, ও নফল তথা বিভিন্ন ধরনের নামায শুরু করার পূর্বে মুখ উচ্চারণ করে নিয়্যাত পড়া বিদ'আত (১৩) পেশাব করার পরে পানি থাকা সত্ত্বেও অধিকতর পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে কুলুখ নিয়ে ২০,৪০,৭০ কদম হাটাহাটি করা, জোরে জোরে কাশী দেয়া, হেলা দুলা করা, পায়ে পায়ে কাচি দেয়া এসবই বেহায়াপনা কাজ ও পরিষ্কার বিদ'আত। (১৪) অনেকে ধারণা করেন যে, তাবলীগ জামা'তের সাথে যেয়ে ৩টা অথবা ৭টা চিল্লা দিলে ১ হজের সওয়াব হয়। এ সমস্ত কথা সবই বানাওয়াটি ও মিথ্যা, তথা বিদ'আত।

২০-প্রশ্নঃ যদি কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর নামে মিথ্যা হাদীছ তৈরে করে অর্থাৎ বানাওয়াটি ও মনগড়া কথা মানুষের সামনে বর্ণনা করে বা বই পুস্তকে লিখে প্রচার করে, তাহলে তার পরিণতি কি হবে?

উত্তরঃ যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর নামে মিথ্যা হাদীছ রচনা করে মানুষের কাছে বর্ণনা করে তার পরিণতি হবে জাহান্নাম। রাসূলের কথাই এর দলীল, যেমন তিনি বলেন:

"مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ"

২১- প্রশ্নঃ আল্লাহ তা'আলা অগণিত অসংখ্য নাবী ও রাসূলগণকে দুনিয়ায় কি জন্য পাঠিয়েছিলেন?

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা অগণিত, অসংখ্য নাবী ও রাসূলগণকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন, তাদের মাধ্যমে মানুষদেরকে আল্লাহর ইবাদতের দিকে তথা আল্লাহর একত্ববাদের দিকে দাওয়াত দেয়ার জন্য। আর আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করা থেকে মানুষদেরকে বিরত রাখার জন্য। আল্লাহ তা'আলার কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন:

﴿وَلَقَـــدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ ﴾ (سورة النحل: ٣٦)

অর্থ: আল্লাহর ইবাদত করবার ও তাগুতকে বর্জন করবার নির্দেশ দেবার জন্যে আমি তো প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল পাঠিয়েছি। (আন্ নাহল: ৩৬)

২২- প্রশ্নঃ ইবাদতের অর্থ কি? এবং "ইবাদত" কালিমা, নামায, রোযা, হাজ্জ ও যাকাত এ কয়টির মধ্যেই কি সীমাবদ্ধ?

উত্তরঃ ইবাদতের অর্থ: প্রকাশ্য এবং গোপনীয় ঐ সকল কাজ ও কথা যা আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন বা যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্ট অর্জন করা যায় তাকে ইবাদত বলা হয়।

* ইবাদত: কালেমা, নামায, রোযা, হাজ্জ ও যাকাত এ কয়টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আল্লাহ তা'আলার কথাই এর দলীল, যেমন তিনি বলেন:

﴿قُـــلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (سورة الأنعام: ١٦٢)

অর্থঃ (হে রাসূল (ছাঃ)) আপনি বলে দিন যে, নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবাণী, এবং আমার জীবন ও মরণ সব কিছুই সেই আল্লাহর জন্য যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক। (সূরা আনআম: ১৬২)

উক্ত আয়াত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হল যে, কালেমা, নামায, রোযা, হাজ্জ ও যাকাত ছাড়াও মানুষের জীবনের প্রতিটি ভাল কথা ও কাজ ইবাদতের ভিতর গণ্য। যেমন দু'আ করা, বিনয় ও নম্রতার সাথে ইবাদত করা, হালাল উপার্জন করা ও হালাল খাওয়া, দান-খয়ারাত করা, পিতা-মাতার সেবা করা, প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ করা, এবং সর্ব কাজে ও কথায় সত্যাশ্রয়ী হওয়া, এবং মিথ্যা বর্জন করা ইত্যাদি।

২৩– প্রশ্নঃ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় পাপের কাজ কোনটি?

উত্তরঃ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় পাপের কাজ হলো, বড় শিরক। আল্লাহ তা'আলার কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেনঃ

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (سورة لقمان:١٣)

অর্থঃ হযরত লোকমান (আঃ) তাঁর ছোট ছেলেকে উপদেশ দিতে যেয়ে বলেছিলেন, হে আমার ছোট ছেলে! তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করবে না। কেননা শিরক হলো সবচেয়ে বড় যুলুম। (অর্থাৎ বড় পাপের কাজ)

২৪– প্রশ্নঃ বড় শির্ক কাকে বলা হয়? এবং বড় শির্ক কয়টি ও কি কি?

উত্তরঃ বড় শিরক হলো: বিভিন্ন প্রকার উবাদতের মধ্য হতে কোন ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সন্তুষ্টির জন্যে নির্ধারণ করা। যেমন আল্লাহ ছাড়া কোন পীর-ফকীর বা অলী-আউলীয়াদের কাছে সন্তান চাওয়া, ব্যবসা বানিজ্যে আয়-উন্নতির জন্যে বা কোন বিপদ থেকে মুক্তির জন্যে কোন পীর ফকীরের নামে মান্নত দেয়া, কোন জানোয়ার জবেহ করা ইত্যাদি। আল্লাহর কথাই এর দলীল, যেমন তিনি বলেন:

﴿وَلاَ تَـــدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ﴾ (سورة يونس:١٠٦)

অর্থ: (হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)) আপনি আল্লাহ ব্যতীত এমন আর কোন বস্তুর ইবাদত করবেন না, যা আপনার কোন প্রকার ভাল ও মন্দ করার ক্ষমতা রাখে না। কাজেই হে নাবী! আপনি যদি এমন কাজ করেন, তাহলে আপনিও জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। (সূরা ইউনূস: ১০৬)

বড় শিরকের কোন সংখ্যা নির্ধারিত নেই তবে বড় শিরকের শাখা প্রশাখা অনেক, তার মধ্য হতে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(১) আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে ডাকা, অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া।

(২) আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে খুশী করার জন্য যবেহ করা।

(৩) আল্লাহ ছাড়া অন্যের সামে মান্নত মানা।

(৪) কবরবাসীর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তার কবরের চারি পার্শে তাওয়াফ করা ও কবরের পাশে বসা।

(৫) বিপদে-আপদে পড়ে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের উপর ভরসা করা।

২৫- প্রশ্নঃ বড় শির্কের দ্বারা মানুষের কি ক্ষতি হয়?

উত্তরঃ বড় শিরকের দ্বারা মানুষের সৎ আমল সব নষ্ট হয়ে যায়, জান্নাত হারাম হয়ে যায়। চিরস্থায়ী ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারিত হয়। আর তার জন্যে পরকালে কোন সাহায্যকারী থাকেনা। আল্লাহর কথাই এর দলীল যেমন তিনি বলেন:

﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (سورة الزمر:٦٥)

অর্থ: (হে নাবী) আপনি যদি শিরক করেন তাহলে নিশ্চয়ই আপনার আমল সমূহ নষ্ট হয়ে যাবে। আর আপনি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। (যুমার: ৬৫)

আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন:

﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾ (سورة المائدة:٧٢)

অর্থ: নিশ্চয়ই যিনি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার বানায়, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন, তার চিরস্থায়ী বাসস্থান হবে জাহান্নাম। এ সমস্ত জালেম তথা মুশরিকদের জন্য কেয়ামতের দিন কোন সাহায্যকারী থাকবে না। (সূরা মায়িদাহ:৭২)

২৬- প্রশ্নঃ শির্ক মিশ্রিত সৎ আমল আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে কি?

উত্তরঃ না, শিরক মিশ্রিত সৎ আমল সবই নষ্ট হয়ে যায়, যার ফলে তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবেনা। উল্লেখিত সূরা যুমারের ৬৫ নং আয়াত এর স্পষ্ট দলীল।

২৭- প্রশ্নঃ মৃত অলী-আওলীয়াদের দ্বারা এবং অনুপস্থিত জীবিত অলী-আওলীয়াদের দ্বারা অছীলা করে দু'আ করা এবং বিপদে-আপদে পড়ে সাহায্য চাওয়া জায়েয কি না?

উত্তরঃ জায়েয নয়। আল্লাহর কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ﴾ (سورة الأعراف: ١٩٤)

অর্থ: আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তো সবাই তোমাদের মতই বান্দা। (আরাফ: ১৯৪)

আল্লাহ আরো বলেন:

﴿أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ (سورة النحل: ٢١)

অর্থ: তারা তো মৃত, প্রাণহীন, এবং তাদেরকে কবে পুণরুত্থান করা হবে তারা তাও জানেনা। (নাহল: ২১)

এমর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার চাচাত ভাই আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বলেন:

"وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْئَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ "

অর্থ: যখন তুমি কোন কিছু চাইবে, তখন একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাইবে। আর যখন তুমি কোন সাহায্য চাইবে, তখন একমাত্র মহান আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে।

২৮- প্রশ্নঃ উপস্থিত জীবিত ব্যক্তিদের কাছে সাহায্য চাওয়া জায়েয কি?

উত্তরঃ হা, জায়েয, উপস্থিত জীবিত ব্যক্তি তিনি যে সমস্ত বস্তু সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন, সে সমস্ত বস্তু তার কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে। এতে কোন অসুবিধা নেই। আল্লাহর কথাই এর দলীল, যেমন তিনি বলেন:

﴿ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ﴾ (سورة القصص:١٥)

অর্থ: হযরত মূসা (আঃ) এর দলের লোকটি তার শত্রুর বিরুদ্ধে মূসা (আঃ) এর সাহায্য প্রার্থনা করল, তখন মূসা (আঃ) তাকে ঘুষি মারলেন, এভাবে তিনি তাকে হত্যা করে ফেললেন। (সূরা ক্বাসাস: ১৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ (سورة المائدة:٢)

অর্থ: তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর! নেক কাজ করতে এবং পরহেজগারীর ব্যাপারে। তবে পাপ কাজে ও শত্রুতার ব্যাপারে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করো না। (সূরা মায়িদাহ: ২)

এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন:

والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه (رواه مسلم)

অর্থ: কোন বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকবে ততক্ষন আল্লাহ সেই বান্দার সাহায্যে নিয়োজিত থাকবেন। (মুসলিম)

২৯- প্রশ্নঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা কি জায়েয ?

উত্তরঃ না, যে সমস্ত বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেহই সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেনা, সে সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া না জায়েয তথা শিরক। আল্লাহর কথাই এর দলীল, যেমন তিনি বলেন:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (سورة الفاتحة:٥)

অর্থ: (হে আল্লাহ!) আমরা একমাত্র তোমরাই ইবাদত করি আর একমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। (সূরা ফাতিহা: ৫)

৩০- প্রশ্নঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে মান্নত করা জায়েয কি ?

উত্তরঃ না, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মান্নত করা জায়েয নয়। আল্লাহ তা'আলার কথাই এর দলীল, যেমন তিনি বলেন:

﴿ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ (سورة آل عمران:٣٥)

অর্থ: (এমরানের স্ত্রী বিনি হান্নাহ) আল্লাহকে লক্ষ্য করে বলেন: হে আমার রব্ব বা প্রতিপালক! আমার পেটে যে সন্তান আছে তা আমি মুক্ত করে আপনার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে দিয়েছি। (আল এমরান: ৩৫)

৩১- প্রশ্নঃ যাদুর বিধান কি? এবং যাদুকরের শাস্তি কি?

উত্তরঃ যাদুর বিধান হলো: কাবীরাহ গোনাহ, আর কখানো কুফরী। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যাদুকর কখনো মুশরিক, কখনো কাফির আবার কখনো ফিৎনা সৃষ্টিকারী হিসেবে গণ্য হয়ে

থাকে। যাদুকরের কার্যক্রম অনুযায়ী কখনো তার শাস্তি হিসেবে, তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

﴿وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ (سورة البقرة:١٠٢)

অর্থ: কিন্তু শয়তানরাই কুফরী করেছিল, আর তারা মানুষদেরকে যাদু বিদ্যা শিক্ষা দিত। (বাক্বারাহ:১০২)

৩২- প্রশ্নঃ গণক ও জ্যোতিষীরা কি গায়েবের খবর রাখে? এবং গণক ও জ্যোতিষীদের কথা বিশ্বাস করার বিধান কি?

উত্তরঃ না, গণক ও জ্যোতিষীরা গায়েবের খবর রাখে না। আল্লাহ্ তা'আলার কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন:

﴿قُــل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ (سورة النمل:٦٥)

অর্থ: (হে রাসূল (ছাঃ) আপনি বলেদিন, একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া আসমান ও যমীনে আর যারা থাকে তাদের কেহই গায়েবের খবর রাখেনা। (নামল: ৬৫)

*** গণক ও জ্যোতিষীদের কথা বিশ্বাস করার বিধান হলো:** গণক ও জ্যোতিষীদের কথায় বিশ্বাস করা হলো আল্লাহর সাথে কুফুরী করা। যেমন এ প্রসঙ্গে নাবী কারীম (ছাঃ) বলেছেন:

"مَنْ أَتَى عَرَّافاً، أَوْ كَاهِناً، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ" . (صحيح رواه أحمد)

অর্থ: যে ব্যক্তি গণক ও জ্যোতিষীদের নিকট গেল, অথবা তারা যা বলল, তা বিশ্বাস করল, তাহলে সে মুহাম্মাদ (ছাঃ) এর উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে অর্থাৎ কুরআন মাজীদ তার সাথে

কুফুরী করল। (অর্থাৎ সে আল্লাহর সাথেই কুফুরী করল।) (আহমাদ)

৩৩- প্রশ্নঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা কি জায়েয?

উত্তরঃ না, আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে কসম করা বা শপথ করা জায়েয নয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন:

"مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ" (صحيح رواه أحمد)

অর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করল, সে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করল (আহমাদ)

৩৪- প্রশ্নঃ বিভিন্ন ধরনের রোগ থেকে মুক্তির জন্য এবং মানুষের বদ নযর হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরণের ধাতু দ্বারা নির্মিত যেমন স্বর্ন, রৌপ্য, পাথর, তামা ও লোহার আংটি, মাদুলি, বালা ব্যবহার করা এমনিভাবে কাপড়ের টুকরা, ফিতা ও সূতার কায়তান এবং এ জাতীয় আরো অন্য কিছু ব্যবহার করা। এ ছাড়া কুরআন শরীফের আয়াত, বা আয়াতের নাম্বার জাফরানের কালি দিয়ে লিখে এবং বিভিন্ন ধরনের নকশা একে দোয়া, তাবিজ ও কবয বানিয়ে তা হাতে, কোমরে, গলা ও মাথায় ঝুলানোর বিধান কি?

উত্তরঃ বিভিন্ন ধরণের রোগ-ব্যাধি হতে মুক্তি পাওয়ার জন্যে এবং মানুষের বদ নযর হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যে উল্লেখিত বিভিন্ন ধরণের আংটি, মাদুলী, বালা, কাপড়ের টুকরা, সুতার কায়তান এবং কুরআন শরীফের আয়াত বা নাম্বার লিখে অথবা কোন নকসা এঁকে তার দ্বারা তাবিয ও কবচ বানিয়ে হাতে কোমরে গলা ও মাথায় ব্যবহার করা বা ঝুলানো পরিস্কার শিরক। আল্লাহর কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন:

﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ ﴾ (سورة الأنعام :١٧)

অর্থ: আল্লাহ যদি আপনার উপর কোন কষ্ট ও বিপদ-আপদ আরোপ করেন, তাহলে একমাত্র সেই আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তা দূর করতে পারে না। (সূরা আন'আম: ১৭)

৩৫– প্রশ্নঃ কোন কোন জিনিষের দ্বারা আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারি ?

উত্তরঃ আমরা ৩টি জিনিষের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারি। যেমন (১) বিভিন্ন ধরণের সৎ আমলের দ্বারা (২) মহান আল্লাহর সুন্দরতম ও গুনবাচক নাম সমূহের দ্বারা (৩) আর নেক্কার জীবিত ব্যক্তিদের দোয়ার মাধ্যমে। আল্লাহর কথাই এর দলী, যেমন তিনি বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ (سورة المائدة:٣٥)

অর্থ: হে ঈমানগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, এবং তার সান্নিধ্য অন্বেষণ কর। (সূরা মায়িদাহ: ৩৫)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَلِلّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾(سورة الأعراف: ١٨٠)

অর্থ: আর আল্লাহ জন্যে সুন্দর সুন্দর ও ভাল নাম রয়েছে সুতরাং তোমরা তাকে সে সব নাম ধরেই ডাকবে। (সূরা আরাফ: ১৮০)

৩৬– প্রশ্নঃ কোন কোন জিনিষের অসীলা করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার জন্য চেষ্টা করা নিষেধ?

উত্তরঃ যে সমস্ত জিনিষের অসীলা করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্ট করা নিষেধ তার মধ্য হতে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(১) মৃত ব্যক্তিদের অসীলা করা। (২) অনুপস্থিত জীবিত ব্যক্তিদের অসীলা করা। (৩) পীর-মুর্শিদ ওলী-আউলিয়া এমন কি নাবী-রাসূলগণের ব্যক্তি সত্তার দ্বারা অসীলা করা।

৩৭- প্রশ্নঃ জীবিত মানুষের নিকটে দু'আ চাওয়া কি জায়েয?

উত্তরঃ হাঁ, জীবিত মানুষের নিকটে দু'আ চাওয়া জায়েয। তবে মৃত মানুষের নিকট জায়েয নয়। আল্লাহ তা'আলার কথাই এর দলীল, যেমন তিনি বলেন:

﴿ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ (سورة محمد١٩:)

অর্থ: (হে রাসূল (ছাঃ)) আপনি প্রথমে আপনার গোনাহ খাতার জন্য এরপর মু'মিন নারী ও পুরুষদের জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

৩৮- প্রশ্নঃ জীবিত মানুষের দ্বারা সুপারিশ চাওয়া কি জায়েয?

উত্তরঃ হাঁ জায়েয, দুনিয়াবী বিষয়ে জীবিত মানুষের দ্বারা সুপারিশ চাওয়া জায়েয। আল্লাহর কথাই এর দলীল, যেমন তিনে বলেন:

﴿مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ﴾ (سورة النساء:٨٥)

অর্থ: যে ব্যক্তি কারো জন্যে ভাল কাজের সুপারিশ করবে সে তার জন্য অংশ পাবে, আর যে ব্যক্তি কোন খারাপ কাজের জন্য সুপারিশ করবে সে ওর দরূন অংশ পাবে। (আন্ নিসা: ৮৫)

৩৯- প্রশ্নঃ ধর্মীয় ব্যাপারে কোন মতানৈক্য দেখা দিলে তার ফায়ছালা কি ভাবে করতে হবে ?

উত্তরঃ ধর্মীয় ব্যাপারে কোন মতানৈক্য দেখা দিলে, তার ফায়সালার জন্য আল্লাহর পবিত্র কুরআন এবং তাঁর রাসূলের

সহীহ হাদীসের ফায়সালার দিকে ফিরে যেতে হবে। মহান আল্লাহর কথাই এর দলীল, যেমন তিনি বলেন:

﴿ فَــإِن تَنَازَعْــتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾(سورة النساء:٥٩)

অর্থ: অত:পর যদি তোমাদের মাঝে কোন বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়, তাহলে ফায়সালার জন্য উক্ত বিষয়টিকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (ফায়সালার) দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। (আন্ নিসা: ৫৯)

মৃত ব্যক্তি এবং কবর সংক্রান্ত কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলাহ

(المسائل المهمة التي تتعلق بالميت و القبور)

১- কবর উঁচু করা, কবর পাকা ও চুনকাম করা, কবরের উপর সমাধি নির্মাণ করা, কবরের গায়ে নাম লেখা, কবরের উপরে বসা,কবরের দিকে ফিরে নামায পড়া এসবই নিষেধ তথা হারাম।

(মুসলিম,তিরমিযী ও মিশকাত হা/১৭০৯)

২- কবর যিয়ারত কারিনী মহিলাদের এবং কবরে মসজিদ নির্মাণ ও কবরে বাতি দানকারীদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লা'নত করেছেন। (আহমাদ, নাসায়ী, আবূদাউদ ও তিরমিযী, তিরমিযী হাদিছটিকে হাসান বলেছেন)

৩- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবরের নিকটে গরু-ছাগল, হাঁস-মুর্গী, ইত্যাদি যবেহ করতে নিষেধ করেছেন। জাহেলী যুগে দানশীল ও নেককার ব্যক্তিদের কবরের পাশে এগুলি করা হ'ত। (আবূদাউদ)

৪- অমনিভাবে রাসূল্লাহ (ছাঃ) কবরে গিলাফ চড়ানো বা কবর ঢেকে রাখতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, মুসলিম,ফিকহুস সুন্নাহ ১/২৯৫-৯৬)

কবরে প্রচলিত শিরক সমূহঃ

(১) কবরে সিজদা করা। (২) কবরের দিকে ফিরে নামায পড়া। (৩) কবরকে কেন্দ্র করে মসজিদ নির্মাণ করা। (৪) কবরবাসীর নিকটে কিছু কামনা করা এবং তার অসীলায় মুক্তি প্রার্থনা করা।

(৫) কবরবাসীকে খুশী করার জন্য কবরে নযর -নেয়ায ও টাকা-পয়সা দেয়া।

(৬) কবরবাসীর জন্য মান্নত করা, ছাগল-গরু ,হাঁস-মুর্গী হাজত দেওয়া এবং সেখানে ওরস ইত্যাদি করা।

(৭) মাযারে নযর-নেয়ায না দিলে মৃত পীরের বদ দু'আয় সব ধ্বংস হয়ে যাবে, এই ধারনা পোষণ করা।

(৮) সেখানে নযর ও মান্নত করলে পরীক্ষায় বা মামলায় বা কোন বিপদে মুক্তি পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করা।

(৯) খুশীর কোন কাজে মৃত পীরের মাযারে শুকরিয়া স্বরূপ পয়সা না দিলে পীরের বদ দু'আ লাগবে, এমন ধারণা পোষন করা।

(১০) নদী ও সাগরের মালিকানা খিযর (আঃ) এর মনে করে সাগরে বা নদীতে হাদীয়া স্বরূপ টাকা-পয়সা নিক্ষেপ করা।

(১১) মৃত পীরের পোষা কুমীর, কচ্ছপ, গজার মাছ, কবুতর ইত্যাদিকে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ ও ক্ষমতাশালী মনে করা ইত্যাদি।

শির্কের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّـــهُ مَـــن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾ (سورة المائدة: ٧٢)

অর্থঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে, আল্লাহ তার উপর জান্নাতকে হারাম করে দিবেন, আর তার চিরস্থায়ী ঠিকানা হবে জাহান্নাম। এ ছাড়া পরকালীন জীবনে এ সমস্ত যালেম তথা মুশরিকদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবেনা। (মায়েদাহ: ৭২)

মৃত্যুর পরে প্রচলিত বিদ'আত সমূহঃ

১–মাইয়েতের শিয়রে বসে কুর'আন তেলাওয়াত করা। (তালখীছুল হাবীর, ৯৭)

২–মাইয়েতের নখ কাটা ও গুপ্তাঙ্গের লোম ছাফ করা। (৯৭)

৩–নাক, কান, গুপ্তাঙ্গ প্রভৃতি স্থানে তুলা ভরা। (৯৭)

৪– দাফন না করা পর্যন্ত পরিবারের লোকদের না খেয়ে থাকা। (৯৭-৯৯)

৫–চীৎকার দিয়ে কান্নাকাটি করা, বুক চাপড়ানো, কাপড় ছেঁড়া, মাথা ন্যাড়া করা, দাড়ি-গোঁফ না মুন্ডানো ইত্যাদি ।(১৮, ৯৭)

৬–তিন দিনের অধিক (সপ্তাহ, মাস, ছয় মাস ব্যাপী) শোক পালন করা। (৭৩) (কেবল স্ত্রী ব্যতীত। কেননা তিনি ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করবেন।)

৭–কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের জন্য দূ'আ করা। (৪৮)

৮– শোক দিবস পালন করা ,শোক সভা করা এবং এজন্য খানা পিনার আয়োজন করা ইত্যাদি। (৭৩,৭৪)

৯– জানাযার পিছে পিছে উচ্চ:স্বরে যিকর বা তিলাওয়াত করতে করতে চলা। (১০০)

১০– জানাযার নামায শুরু করার আগে মাইয়েত কেমন ছিলেন বলে লোকদের জিজ্ঞেস করা।

১১– জানাযার নামাযের আগে বা দাফনের পরে তার শোকগাঁথা বর্ণনা করা।

১২– জুতা পাক থাকা সত্তেও জানাযার নামাযে জুতা খুলে দাঁড়ানো। (১০১)

১৩– কবরে মাইয়েতের উপরে গোলাপ পানি ছিটানো। (১০২)

১৪– কবরের উপরে মাথার দিক থেকে পায়ের দিকে এবং পায়ের দিক থেকে মাথার দিকে পানি ছিটানো। অত:পর অবশিষ্ঠ পানিটুকু কবরের মাঝখানে ঢেলে দেওয়া। (১০৩)

১৫- সূরায়ে ফাতিহা, ক্বদর, কাফেরূণ,নছর, ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস এই সাতটি সূরা পাঠ করে দাফনের সময় বিশেষ দু'আ পড়া। (১০২)

১৬– কবরের কাছে বসে কুরআন তেলাওয়াত ও কুরআন খতম করা। (১০৪)

১৭– কবরের উপরে শামিয়ানা টাঙ্গানো (১০৪) এমনিভাবে কবরের উপরে কারেন্টের বাতি জ্বালানো ,ফ্যান চালানো এবং ফুল ছিটানো ইত্যাদি ।

১৮–প্রতি জুমু'আর দিনে , আশূরা, শবে-বরাত, রামাযান ও দুই ঈদে বিশেষভাবে কবর যিয়ারাত করা।

১৯– কবরের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়ানো এবং সূরায়ে ফাতিহা ১ বার ,সূরা ইখলাছ ১১ বার অথবা সূরা ইয়াসীন ১ বার পড়া। (১০৫)

২০- কুরআন পাঠকারীকে উত্তম খানা ও টাকা-পয়সা দেওয়া অথবা এ বিষয়ে অছিয়াত করে যাওয়া (১০৪,১০৬)

২১- কবরকে সুন্দর করা, কবরে চুম্বন করা। (১০৭,১০৮)

২২- কবরের গায়ে মৃত ব্যক্তির নাম লেখা এবং মৃত্যুর তারিখ লেখা । (১০৯)

২৩- কবরের গায়ে বরকত মনে করে পেট ও পিঠ ঠেকানো ইত্যাদি । (১০৮)

২৪- ত্রিশ পারা কুরআন (বা সূরা ইয়াসীন বা লাখ কালিমা) পড়ে বখশে দেওয়া। যা আমাদের দেশে "কুলখানি" বলে।

২৫- মৃত্যুর পর ১ম,৩য়,৭ম বা ১০ম দিনে বা ৪০ দিনে চেহলাম বা চল্লিশার অনুষ্ঠান করা এবং সেখানে খানাপিনার ব্যবস্থা করা। (১০৩)

২৬- মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা। (১০৪,১০৬)

২৭- নামায, ক্বিরা'আত এবং অন্যান্য ইবাদাত সমূহের নেকী মৃত্যু ব্যক্তিদের জন্য হাদিয়া দেওয়া। (১০৬) যাকে এদেশে ইছালে ছাওয়াব বা ছাওয়াব রেসানী বা বখশে দেওয়া বলা হয়।

২৮- আমল সমূহের ছাওয়াব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর নামে বা অন্যান্য নেককার মৃত ব্যক্তিদের নামে বখশে দেওয়া । (১০৬)

২৯- মৃত্যুর সাথে সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে বলে ধারণা করা ।

৩০- জানাযার সময় স্ত্রীর নিকট থেকে মোহরানা মাফ করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা ।

৩১- জানাযার সময় মৃত ব্যক্তির ক্বাযা নামায সমূহের বা উমরী ক্বাযার কাফফারা সরূপ টাকা আদায় করা।

৩২- মৃত্যুর পরপরই ফকীর মিসকীনদের মধ্যে চাউল ও টাকা পয়সা বিতরণ করা।

৩৩- কবরে মোমবাতি, আগরবাতি জ্বালানো, গোলাপ জল ও ফুল ছিটানো ইত্যাদি ।

৩৪- মৃতের রূহের মাগফিরাতের জন্য বাড়ীতে মীলাদ দেওয়া বা ওয়ায মাহফীল করা।

৩৫-নববর্ষ, শবে-বরাত,ইত্যাদিতে কোন বুযুর্গ ব্যক্তিকে ডেকে কবর যিয়ারাত করিয়ে নেওয়া ও তাকে বিশেষ সম্মানী প্রদান করা।

৩৬- শবে-বরাতে ঘর-বাড়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে মৃত স্বামীর রূহের আগমনের অপেক্ষায় তার পরিত্যক্ত কক্ষে বা অন্যত্রে সারা রাত জেগে বসে থাকা ও ইবাদাত বন্দেগী করা।

৩৭- কবর যিয়ারত করে ফিরে আসার সময় কবরের দিকে মুখ করে বেরিয়ে আসা ।

৩৮- কবরের উপরে একটি বা চার কোনে চারটি কাঁচা খেজুরের ডাল পোতা বা কোন ফল বা ফুলের গাছ লাগানো এই ধারণা করে যে, এর প্রভাবে কবরের আযাব হালকা হবে ।

বিঃদ্রঃ মৃত ব্যক্তি এবং কবর সংক্রান্ত বিষয়ে প্রচলিত শিরক ও বিদ'আত সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণিত "ছালাতুর রাসূল ﷺ" পড়ুন।